অহল্যাভূমি

অশোককুমার সেনগুপ্ত

করুণাময়ী

প্রকাশক : অমিতাভ সেনগুপ্ত
"করুণামযী" ১০৩, কালীকুন্ডু লেন, হাওড়া-১

প্রকাশ কাল : ১৯৪৮

বর্ণ সংস্থাপন : কম্পিউটার এজ্, ইছাপুর ক্যানেল সাইড,
হাওড়া-৪

মুদ্রাকর : অনুলিপি প্রেস, পি ১৪ চার্চ রোড, হাওড়া-১

প্রচ্ছদ : যুধাজিৎ সেনগুপ্ত

শ্রদ্ধাসহ সাংবাদিক শান্তিকুমার মিত্রকে

এক

বটুকের ঘূর্ণন কেন্দ্রটিতে বটুকই নেই। ফলে সে এক অন্য মানুষ। সংসারী নয় — উদোমাদা ক্ষ্যাপাটে। জীবধর্মে আপন বেষ্টিত পাক আঁতুড়ঘর থেকে শ্মশান বরাবর সংসারী মানুষের। সংসারের সমৃদ্ধি, নিজের সমৃদ্ধি, মাংস মেদের বিস্তারে মানুষ সদা ব্যস্ত। নারী অর্থ রক্তমাংসের শরীরী আত্ম আস্বাদন কর্মই চরম পরিধি। বটুকের পরিধির মস্ত বিস্তার। তার পরিক্রমা ব্যতিক্রমী তাজ্জব এবং অদ্ভুতও বটে।

বটুকের বয়স আটাশ ঊনত্রিশ। চোখ জোড়ার কালো তারা সদাচঞ্চল এবং ব্যস্ত। গোল কালো মুখ। কিশোর লাবণিতেজঙ্গুলে দাড়িগোঁফের কাঁটা বিঁধে রাখে। চিন্তার ঘা মুখমণ্ডলকে কখনও কুঞ্চিত করে বটে, তো সে মানুষের বোকামির জন্যে। বটুক প্রায়শঃ দু'হাত ছুঁড়ে, ডানার মত নাচিয়ে ঘন ঘন ঘোষণা করে, 'এ মা কিছু বোঝে না, কী বোকা! কী বোকা'— বুকের গভীর থেকে কথাটা উৎসারিত হয়। অসঙ্কোচ, সরল এবং চরমতম সত্য উচ্চারণের মত। যেন সে আদ্যন্ত বুঝে ফেলেছে পৃথিবীকে, পৃথিবীর সকল রহস্যকে, সৃষ্টির মূল এবং জীবনের প্রকৃত প্রকৃতিকে। সে বললে, ওই কথা মনে হতেই পারে, মেঘ কেটে প্রথম রৌদ্র ফলকটি এসে পড়ল, কুঁড়ি প্রথম পাপড়িটি মেলল, স্নেহ মায়া ভালোবাসার নির্বিচারী পরীদল শুভ্র ডানায় নেমে এল, প্রথম পবিত্র শঙ্খধ্বনি নিনাদিত হল।

বটুকের বাচনের সেই মুখ দেখে এমনটি মনে হওয়ার মত মন চাই চোখ চাই। ত বটুক কথাটা বলে ঝিম্ মেরে বসে যায়। যেন খসে পড়ল ডানা। তবে বেশি সময় তার অঢেল স্ফূর্তি। হর্ষ জোয়ারে সে আছালিপাছালি খায়, চোখ দীপ্ত হয়। কালচে ঠোঁটে চমৎকার পরিতৃপ্তির মুদ্রা ফোটে। তার চিবুকে, কপালে, গালে, ঠোঁটে, কানের লতিতে, নাসাগ্রে, ভ্রূ রেখায় থিরথির কাঁপুনি শুরু হয়। বটুক তখন অন্য মানুষ। অতি দ্রুত এরকম যখন তখন, সে অন্য মানুষ হয়ে উঠতে পারে। তখন আকাশ, বৃক্ষ, দিঘি, ডাঙা, ক্ষেত, রৌদ্র, বৃষ্টি, আলো অন্ধকার এবং জীবজগতের এত যে ছিন্ন এবং মিশ্রিত বৈচিত্র্য এবং মানুষ—সবকিছুই তার হাতে পরম আদরের উপহার করে কেউ তুলে দেয়। তখন সে সবার — তখন তার সবাই। নিজের ব্যাপারে দৃষ্টি মন যখন থাকে না, তখন মাথার চুল উড়ু উড়ু, চিরুনি পড়ে না, মুখের সাফ সুরতের ব্যাপার থাকে না, স্নান আহার না, সময়েরও চলার শক্তি থাকে না তার কাছে। সে শোয়া বসার মত পোশাক পরিচ্ছদের ব্যাপারেও বেহুঁশ। একটা কিছু চরালেই হল আর কী! প্রায় সময়ই কোমরে তার লুঙ্গি, পাজামা কী খাটো ধুতি, গা প্রায় উদোম। শীত গ্রীষ্ম কোন বোধ তাকে ছোঁয় না। ঘরে, দাদা কী ছোটভাইয়ের জামাকাপড়েও টান দেয়। ওরা বকাঝকা করলে, 'নে তাহলে', বলে উঠোনে উদোম, ভাইবউ মুখে আঁচল চাপা, ভাই বেগুনি, 'পরে ফেল্, পরে ফেল্' করতে, 'তবে যে' বলে দিব্যি পরে নেয় শিশু হাসিতে। রাগও দেখায়।

স্থিতি অল্প সময়। দ্রুত বিস্মরণে যায়।

জীবনযাপনে আত্মঘূর্ণন কেন্দ্র থেকে নিজেকে লোপাট ভয় বাষ্প করে। তখন কথার আগঢাক থাকে না। সত্যের সহবাস করা যায়। নিজের মেয়েমানুষের মত কোলে তুলে আদর এবং চুম্বনাদি ক্রিয়াও চলে। বটুকেরও তাই। চেঁচামেচি, হল্লা, লাফানি, ঝাঁপানিতে সে ওস্তাদ। যেন সবই খেলা। প্রয়োজন অপ্রয়োজন বলে কিছু নেই। মনে হওয়াটাই মস্ত। মনে হওয়াটার নিয়ন্তা, চালিকাশক্তি যে কোথায়! বিস্তর অনধিকার চর্চার জন্ম এই মনে হওয়া থেকে। এবং চেঁচামেচি হল্লা, লোকে কথা শোনাতেও তা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সে বলবেই। সে চেঁচাবেই।

নন্দ চাটুজ্জে, অবসর জীবনে সংসার উদাসীন, ধর্ম আঁকড়ে গীতাপাঠ এবং কীর্তনাদিতে তন্ময়, স্বল্পবাক, স্মিত হাসি, বলেন, 'বটকে স্বচ্ছ হে। কাঁচের মত। ভেতর বার বলে কিছু নেই।' চরণ মুদি, সুদবন্ধকী কারবার করে, বাগদিপাড়ায় বাঁধা মেয়ে যমুনা, বলে, 'শালা শয়তান।' তারিণীস্যার ধুতিপাঞ্জাবি, নাকে নস্যি গুঁড়ো ইউক্যালিপটাশের মত ডালহীন ঢ্যাঙা বলেন, 'বটুক ক্ষ্যাপা, বলে কি না পৃথিবী গোল হলে এমন হয়। চ্যাপটা। গোল রসগোল্লা। কী মিষ্টি। ঠিক ঠিক।'

ত পাগল ঠাওরে মানুষ গায়ে মাখে না। ক্ষ্যাপার কথা ছেড়ে দাও, গায়ের পোকা ঝাড়া কর্ম। ছেলেরা সময় সময় খ্যাপানোর জন্য 'কী বোকা, কী বোকা, কিছু বোঝে না' হাততালি দিয়ে ঠাট্টা ঝাপট মারে। বটুকের তাতে বয়ে যায়। সে দেখবে শুনবে এবং বলবে। এব. শেষ কথা, ' এ মা কিছু বোঝে না। কী বোকা। কী বোকা।'

বটুক দশরথ পালের মেজ ছেলে। দশরথ বছর তিনেক আগে হঠাৎই মারা পড়ল। হার্ট অ্যাটাক। মানুষটির চাষের সঙ্গে মাটির সামগ্রী বানানের ব্যবসা। জাত ব্যবসা। পরিশ্রম সাংসারিক জ্ঞানসম্পন্ন, বিদ্যালয় বিদ্যা অলভ্য হলেও কিন্তু বুদ্ধিকোষের প্রদীপ্তি সংসারকে বরাবরঃ সচ্ছল রেখেছে। দু-মেয়ের বিয়ে দিয়েছে। পাড়াতেও কর্তার ভূমিকা ছিল। পুত্রত্রয়কে লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা করে। কিন্তু ক্লাশ ফাইভের পর কোনো পুত্রই অগ্রসর হতে পারে নি। দশরথের এ কারণে দুঃখ ছিল। সান্ত্বনা পুত্ররা জাত ব্যবসায়ে মনোযোগী। চাষকর্মে কুশলী। অন্নহীন হবে না। মৃত্যুকালে বাপুতি এবং নিজের ক্রয় কুড়ি বিঘে জমি, ন-বিঘে সরস জোল, বাকিটা বাইদ রেখে গিয়েছে।

দশরথের ভাবনা পীড়া ছিল আধপাগলা বটুককে ঘিরে। ত জন্ম থেকেই ত বটুক এমন নয়। স্কুলে যেত। স্কুল ছাড়ল। মাটির হাঁড়ি, কলসি, পাতনা, হুলা, গ্লাশ, কপটে, ভাঁড় এসব প্রস্তুতিতেও মাতল। তারপর অসুখে পড়ল। অসুখ ভাল হতেই রূপান্তরিত অন্য মানুষে। কাজে মন নেই। কী যেন ভাবে। ফিকফিক হাসে। উলটোপালটা কথা বলে। দশরথ এটাকে রোগ বলে ভাবতে পারে নি। দিন দুনিয়ায় অনেক ব্যাপারই ঘটে। দৃশ্য জগতের বাইরে অদৃশ্য জগতে ক্ষুদ্র বৃহৎ শক্তিপুঞ্জ দিয়ে গড়া তেনারা রয়েছেন, কত অপদেবতা, তাঁদের রোষ কারও, কোনো অপকর্মে, থুথু ফেলায় কী পেচ্ছাপে, কী বায়ুভরে যাত্রাপথে বাধা দানে, বটুককে এমনটি করেছে। ফলে সে হরুওঝাকে এনে খড়ি পাতায়। হরু, 'দিষ্টি পড়েছে, দিষ্টি' বলে কাটানছাড়ান ক্রিয়া কালো মুরগী, লাল কাপড়, তেমাথার মোড়ে অমাবস্যা নিশীথে কুলো ধানচাল কড়ি ইত্যাদি ব্যবহারে পাঁচিশ টাকা ট্যাঁকে গুঁজে নিশ্চিন্তি করে।

কিন্তু বটুক সেই এক। তবে কিনা ঘোর উন্মাদ নয়। দিব্যি ভালোমানুষ। শুধু নিজের

ব্যাপারে দৃষ্টিহীন। দশরথ বিয়ে দিলে ভাল হবে চেষ্টামাত্র বটুক হাউমাউ কাঁদে। পাণ্ডুতপুরে মামার ঘরে গিয়ে ওঠে। সাতদিন পরে দশরথ বটুককে নিয়ে আসে। ত দশরথ নিশ্চিন্ত ছিল, দু-ভাই বটুককে ভালোবাসে, দেখবে। কেজো ছেলে। বটুক প্রচন্ড শ্রম করতে পারে। শ্রমের উপর লক্ষ্মীর প্রবল আকর্ষণ।

দশরথ নেই। স্ত্রী লক্ষ্মী আছে। বড়ছেলে, বউ, নাতি। ছোটছেলের গতবছর বিয়ে হয়েছে। ছোটবউ মালতী ভাসুরঠাকুরকে লজ্জা করত গোড়ায়। মাথায় ঘোমটা, মুখ নিচু, স্বরক্ষেপ মৃদু। ত একদিন বটুক ঘোমটা সরিয়ে বলে দিল, 'কী বোকা, এমন সুন্দর মুখের ঢাকন দেয় বুনটি।' মালতী দাদা বলে। খেতে দেরি করলে বকে।

বটুকের কাজের ঝোঁক রাক্ষুসে। যা ধরবে ছাড়বে না। তা চাষ হোক, কী হাঁড়ি গড়া। ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই, সকাল দুপুর বিকেল নেই, ক্লান্ত না হওয়া তক্ সে লেগেই থাকবে। বড়বউ সুধা টেনে-হেঁচড়ে কাজ থেকে সরায়। কাজ থাকলেই বটুক ঘরে এবং ভাল। না হলে সে বাইরে। অন্যের কাজে। ঠিক কোথাও না কোথাও লম্বা নাকটা বাড়িয়ে দেবে।

বাইরের ব্যাপার কী কম! এন্তার উৎপাদিত হচ্ছে। মানুষের মনের জমি এবং সংসার-জমিতে বিস্তর আগাছা জন্মায়। ধানগাছের ফাঁকফোঁকরে বেদোঘাসের মত। কে তোলে, ত বটুক তোলে। এতগুলো ঘর, এত মানুষ, ঠোকাঠুকি লেগেই থাকে। টানুনি খিঁচুনি। বটুক তার মধ্যে দাঁড়াবে, 'কী বোকা, কী বোকা, আহা কর কী, কর কী।'

বংশীর মা, রুখু চুল, তেল পায় না, চোপসানো গাল, বংশী ভিজে ভাতের বাটি পর্যন্ত কেড়ে নেয়। বলে, 'মাগীর বড় নুলো। বিটির ঘর যা, বেটার সঙ্গে বিটিও বিইয়েছিস্।' একদিন কিছু তো করতে হয়, বটুকের মাথায় ঝাঁ করে বেজে গেল। হাটের মাঝে চেঁচানি, 'এই বংশী, মাগ-ছেলেকে দেখতে পারিস মাকে দেখতে পারিস না, বুড়ি পেট চাপড়াছে খিদের জ্বালায়, ভেবেছিস কী।' বংশী শুনে ভ্যাবাচাকা। হেটো মানুষের দৃশ্য হতে বংশীর দ্রুত ওষ্ঠে হাসি, 'খিপা বটে।' এবং কেটে পড়ার মতলব। বটুক হাত চেপে ধরে 'চল মাকে খেতে দিবি — আমি দেখব' বলে, হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যায়।

পঞ্চায়েত অফিসে হুটহাট দাপানি, 'ইয়ার্কি। পঞ্চায়েত রাজ। মানে কী। মানে রাজা। কে রাজা। দুলাল রাজা। আমাদের দুলাল রাজা হয়েছে গো। রাজাগিরি করছ, কর, কিন্তু একচোখো কেনে? সবাইকে সমান দেখ। নন্দকে আজ দেব, কাল দেব করে বলদ দিচ্ছ না। ভেবেছ, আমি জানি না। ঘাটে বউদি বলছিল। দিয়ে দাও। আমি বসছি।' বারান্দায় উবু হয়ে বসে। বর্গাদার দীনু ধান দেয় নি প্রহ্লাদ চক্রবর্তীকে। গিয়ে দীনুকে কী বকুনি। অনন্ত ঘোষের কলেজে পড়া ছেলে বিণ্টু ভাল নাম সমীর, গোপালের মেয়ে ঝুলনের পিছনে ঘুরঘুর করে। ফ্রকপরা ঝুলন, বর্ধনশীল লাউডগির মত ছিপছিপে ঢলঢলে মুখ, টানা মায়াবী চোখ, নাইনের ছাত্রী, সে-ও বাতাসে ভাসে। বটুকের চোখ এড়ায় না। বিণ্টুকে ডেকে চাপা গলায় বলে, 'ঝুলনে ঝুলে থেকো না। ফেল করবে। ঝুলতে ঝুলতে টের পাবে না হাত ফসকানো। ভাল ছেলে। ছেড়ে দাও ওসব ঝোলাঝুলি। আমি কাউকে বলব না।'

এন্তার এ ধরণের কথা বলা স্বভাব, প্রতিক্রিয়া কখনও ভাল, কখনও চাপড় খাওয়া, দাদার কাছে অভিযোগে বকুনি, বটুক তাতে কখনই নিরস্ত নয়। সে তর্ক করে। শেষ কথা, 'কী বোকা। কিছু বোঝে না। কী বোকা।' কাজ হোক না হোক বটুক বলে যাবেই। রাম এবং

ভরতের লক্ষ্মণ ভাইটিকে নিয়ে নিত্য যন্ত্রণা। লক্ষ্মণ বটুকের নাম বটে। বটুকের নামে সব অভিযোগ সংসার বরাবর পৌঁছায় না। আধ পাগলাকে তাচ্ছিল্য করার মধ্যে সত্যের উন্মোচিত হওয়াটা অস্বচ্ছ করা যায়।

বটুককে নতুন গেঞ্জি দিলে, কুষ্ঠরোগগ্রস্ত নাদু বাউরিকে দান করে, কিংবা দাদার কাছে পয়সা নিয়ে ডোমবুড়িকে চাদর কিনে দেয়, টাকা না দিলে কাঁদে, তবে হিসাবে সে কখনও এপাশ ওপাশ করে না। বাজার দোকান করতে, ঠিকঠাক হিসাব, হাটে দর কষাকষি করে। গাঁয়ের লোকও এটা সেটা কিনতে দেয়। কেউ মাটি কেটে দিতে বললে — রাজি। মাল বয়ে নিয়ে যেতে এক পায়ে খাড়া। নিজেদের জমিতে কাজ করতে যাচ্ছে নিড়ানি কী জলধরা, বটুককে অনায়াসে মাঝপথে অন্য কেউ তার জমিতে লাগিয়ে নিতে পারে, 'বটুকরে তোকেই খুঁজছিলাম। একটু লেগে দে ত।' সে লেগে যাবে, অপেক্ষমাণ ভাই এবং নিজের জমি বিস্মৃত হয়ে।

বটুক যেভাবে চলছে — চলুক। এ সম্পর্কিত ভাবনা কারও নেই। বিস্ময়ও নেই বটুক চরিত্রে। পরিবর্তিত হল কী না তাতে বয়ে গেল মানুষের। মা সর্বদাই ব্যতিক্রমী, জৈবধর্মে দুর্বল সন্তানে ভাবনাকাতর, স্নেহশীল। দু-পুত্র সংসারী, উপার্জনক্ষম, মেয়েরা ভাল বর ঘরে সুখী, মাঝে বটুকের ভবিষ্যৎ চিত্র গলায় মাছের কাঁটার মত অস্বস্তিকর, নামে না ওঠে না। জোর করে বিয়ে দিলে কী ভাল হয়ে যেত! খেতে না এলে, কী অনির্দিষ্ট শ্রমপাতে, উসকোখুসকো চুলে, ছেঁড়া গেঞ্জি লুঙিতে ওই কাঁটা ঢোক গিলতে খিচখিচ বাধে। বলে, 'অ বাবা, একডুং বস। দেখ সবাই সংসার করছে। কে তোর মত। নিজের কথা ভাব বাবা। একটুকুন নিজের কথা ভাব।' উদগত অশ্রুরেখায় গাল ভেজে। বটুক বলে, 'নিজের কথা ভাবি ত! তোমার কথাও ভাবি। কী বোকা। কিছু বোঝনা।' মা বলে 'বোকা তুই। তুই।' বটুক রাগ করে না, মায়ের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসে। বলে, 'কেনে বোকা?' মা বলে, 'লোকে তোকে খাটায়। সবাই বিয়ে করেছে তুই করিস নাই।' বটুক ব্যস্ত গলাতে বলে, 'লোকে খাটায়! খুব ভাবে, বটুককে খাটাচ্ছি। কী বোকা। আমার যি উতে আনন্দ হয়। মনে হয় তিড়িংতিড়িং নাচি। কেউ দেখতে পায় না। কেউ বুঝতে পারে না।'

ঘরে বাইরে বটুকের লোকচক্ষে লোকমানসে অদৃশ্য চমৎকার দৃশ্য। গাঁয়ের বাইরে মড়কচণ্ডী ঠাকুরকে সে দেখতে পায়। দুর্গামন্দিরে সিংহারূঢ়া দেবীকে সে পরিভ্রমণ করতে দেখে। কালসাক্ষী বটবৃক্ষ তার সঙ্গে কথা বলে। হাড় জিরজিরে ভূপতি সেনের গা টা তার কাছে রোগযন্ত্রণার কথা বলে। এমনকী ঘরবাড়ি, রায়দের দিঘি পর্যন্ত জ্যান্ত হয়ে বটুকের সঙ্গে গালগল্পে মেতে ওঠে। ত সবসময় নয়। ওদের যখন ইচ্ছে হয়। কখন যে ইচ্ছে হয় বটুক তার পূর্ব মুহূর্তেও টের পায় না। আচমকা বিদ্যুৎ ঝলকের মত এসে যায়। তবে এসব কথা সে কখনও বোকা মানুষদের কাছে ভুলক্রমেও বলে বসে না।

কিন্তু জ্যোৎস্নারাতে তিলডাঙায় যা ঘটল, বটুককে তা বলতেই হয়। তিলডাঙা জ্যোৎস্নাভরা সন্ধ্যা, না তখন গভীর নিশা, বটুক জানে না, দেখা দিল। মাটি ফুঁড়ে উঠল এক রূপবতী কন্যা।

মৌজার নাম তিলজলা। গায়ের পূর্ব। নামের মধ্যে তিলচাষের গন্ধ আছে। সে ইতিহাস। বিরাশি বছরের ভূষণ মালি বলে, 'তিলের চাষ ইপাশে কখনও দেখি নাই। সরষে

চাষ আছে বটে। তিলডাঙায় আখ হত, আলু বেগুন মূলো হত, ফুলকপি বাঁধাকপি হত। একবছর আমি বিলিতি বেগুন ফলিন ছিলম।' তারিণীস্যার বলেন, 'নাম যখন তিলডাঙা অবশ্যই তিলচাষ হত।' নবীন ক্ষোভের সঙ্গে বলে, 'চাষ হত। কে বলবে। কাঁটকিরি হয় ঢেক। কেটে সিজিন বিয়োন গাইকে খাওয়ালে দুধ দেয় ঢেক।' 'কাঁটকিরি হল কন্টিকারি' তারিণীস্যার যোগ করেন, 'ভেষজ উদ্ভিদ বলতে পার। ওর শিকড়—।'

তিলডাঙার পাশেই বিশাল দিঘি। নাম গোঁসাইদহ। তিনদিকে পাড়। পশ্চিমে পাড় নেই, আলের বাঁধুনি নিয়ে ধানখেতের টুকরোগুলো মিশেছে। তিনপাড় ন্যাড়া। একটি মাত্র শ্যাওড়া গাছ পুবে, যেখানে আবার ষষ্ঠী ঠাকরুনের অধিষ্ঠান। মস্ত কালো এক পাথর। তিনিই সিঁদুরচর্চিতা হয়ে মা ষষ্ঠী। গাঁ বাইরে মা জননীরা এসে তিথিতে পুজো করে যান। পুরোহিত লাগে না। পুরোহিতগিন্নিই এটা সারেন। ষষ্ঠী ঠাকরুন সম্পূর্ণ জননী আরাধ্যা। বর্ষায় ধানখেত ভাসা জল এসে গোঁসাইদহকে টইটম্বুর করে রাখে। ঘোলা জল। সবুজ সরু বর্শার মত দল ভিন্ন আরও অন্য কিছু জলজ উদ্ভিদ। জলবর্ণে লালচে ভাব। লালমাটি ধোয়া এই জলই তিলডাঙাকে প্রাণময় শস্যশ্যামলা করে রাখত।

রাখত। এখন রাখে না। ধূ-ধূ ডাঙা। খেতগুলোর আলের বিচ্ছিন্ন রেখাও মুছে গিয়েছে। সব জমি একাকার। একক মালিকানা ত নয়। গাঁয়ের বহু পরিবারই এ জমির মালিক। কম বেশি শত একর জমি গোঁসাইদহকে কেন্দ্র করে। ঘেসো জমি, কাঁটকিরির ঝোপ। তবে দোআঁশ মাটি। বুক চিতিয়ে পড়ে থাকে। কখনও যে চাষযোগ্য ছিল অনুমান কঠিন। বিহার সংলগ্ন বীরভূমের এ অঞ্চলে এমন ডাঙা বিস্তর। সেচ সৌভাগ্য নেই ভূমির। বুনো, পাথুরে খন্ডটির বর্ষা নির্ভর ভাগ্য। উঁচু ভূইয়ের জল দ্রুত নেমে যায়। ফলে ছড়ানো ডাঙার অজস্র উপুড়পিঠ এখানে ওখানে। যেন মেঠো সমুদ্রে কচ্ছপ পড়ে আছে।

তিলডাঙায় অহল্যাভূমি হওয়ার ইতিহাসে স্বর্গরাজ ইন্দ্রের কীর্তি কী ঋষি গৌতমের অভিশাপের যুগ্ম ক্রিয়া নেই। সমবেত তাচ্ছিল্য। অনেক চরিত্রই এ ইতিহাসে। নকুল সিংহ, ভুবন রায় শুধু নয় পাঁচু দাস, গোবর্ধন, নন্দুর মত অনেকেই এর সঙ্গে জড়িত।

তারিণীস্যার বলেন, 'রেষারেষি, প্রতিহিংসাপরায়ণতার অসংখ্য অভিশপ্ত স্বাক্ষর পৃথিবীতে রয়েছে। কোনোটি বৃহৎ কোনোটি ক্ষুদ্র। সর্বনাশের বীজ মানুষই বপন করে, লালন করে। অপরের সর্বনাশের গরল পান করতে হয় তারপর নিজেকেই। ইতিহাসে বলে, ঘটনা বলে, স্মৃতিতে থাকে, তবু বিষাক্ত ধারাটি সমানে বহমান। জীবজগতে মানুষই বুদ্ধিশ্রেষ্ঠ এবং নির্বোধশ্রেষ্ঠ।'

নকুল সিংহের সঙ্গে ভুবন রায়ের বিবাদ দীর্ঘকালের। পুকুরের অংশ নিয়ে মামলা হয়। ষাট বছর আগের কথা। নকুল হেরে যায়। প্রচণ্ড জেদি মানুষ নকুল। পত্তনিদার। জমিদার বলে নিজেকে জাহির করত। কার্যক্ষেত্রে ভূমিকাটিও সে রকমই নিত। ভুবন রায় সমগোত্রীয় না হলেও ব্যবসায়িক অর্থ বলে সে কম যায় না। সদরে তার কারবার। নকুল আইনের পরাজয়কে অন্যভাবে জয়ের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। পুকুরের অংশ ভোগ দখল করুক, অন্যদিকে সে ব্যবস্থা নেবে। একের বদলে দশদিক থেকে আক্রমণ শানাবে। তারপর থেকেই নানা ব্যাপারে দু পরিবারের দ্বন্দ্ব চলে। কথা বন্ধ, সামাজিক অনুষ্ঠানে যাতায়াত নেই।

উভয়েরই ধানীজমি, পুকুর, বাপঠাকুরদার অর্জিত সোনাদানা এবং টাকা মজুত। উভয়েরই গাঁয়ে প্রভাব-প্রতিপত্তি রয়েছে। সাহায্য দান ইত্যাদিতে দু-পক্ষেই মদত দেবার জন্যে কয়েকটি করে পরিবার। যাই হোক পারস্পরিক শত্রুতার কাহিনীতে নানান ঘটনার সমন্বয়। অত খুঁটিনাটিতে যাবার প্রয়োজন নেই। তিলডাঙা দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে সরাসরি ওই কেন্দ্রে বৌদ্ধিক অস্ত্রাঘাত এবং তার ক্রিয়া উপস্থাপনা করা যাক।

তিলডাঙায় ভুবনের সরষেখেতে ভোররাতে সাতটা মোষ নামিয়ে দেয় নকুলের বাগাল। সকাল হবার আগেই খেত সাফ। খবরটা ভুবন পেতেও অভিযোগহীন। দুটো দিন নীরবতা। গরুর পাল নামে নকুলের ভুঁইয়ে। সরষেখেত ওটা। ঘটনায় শোধবোধ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু প্রতিহিংসার পিচ্ছিলতা ক্লেদ প্রত্যাবর্তনের পথ রাখে না। বর্ষালাগা পুরনো ঘায়ের মত তার রসক্ষরণ ঘটে। পরবর্তী ঘটনাগুলো তিলডাঙায় ফসল চুরিকেন্দ্রিক। নকুল, ভুবনের নয় চোরের শিকার হয়। ছোটবড় সব জমির মালিকেরাও। গাঁয়ে দুটি দল হয়ে যায়। এ নিয়ে গালাগালি, মাথাফাটা, গুটিকয় মামলা, থানার দারোগার কিছু উপার্জন। দ্বন্দ্বের ক্রীড়াভূমি তিলডাঙা, সুতরাং চাষ বৈরাগ্য জেগে ওঠে চাষীদের মনে। নকুলের বেশি জমি, সে চাষ করে না। ভুবনকেও একবছর করে বন্ধ করে দিতে হয়। বছর তিনেকের মধ্যে চাষ ব্যবস্থার অবলুপ্তি, তিলডাঙা বন্ধ্যা।

নকুল, ভুবন উভয়েই মৃত। ঘটনা বিজড়িত চরিত্রগুলিও মৃত। সেদিনের বালকেরা, যারা জীবিত আজ পক্ককেশ। অবনী সিংহ কেবল গ্রামে রয়েছে। রায়বাড়ি শূন্য। রাঁচিতে থাকেন ওরা। বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। পুকুর জমি ভেস্ট, শরিকে বিক্রয়ে খতম। আশু বাউরি ওই বাড়িতে বাস করে। অবনী সিংহেরও বয়স হয়েছে। অতিরিক্ত মদ্যপান, বাগদিবাউরি পাড়ায় নারীসঙ্গ, সদরে বেশ্যাপল্লিতে নিশিযাপনে শরীর ন্যুব্জ, হাড়ের কাঠামো, ঘরে বসে হাঁপায় এবং খিস্তি-খেউড় করে। ভেতো গিলে চটা সিমেন্ট দাওয়ায় বসে হাঁক পাড়ে, 'কে যায়'! মেজমেয়ে প্রাথমিক শিক্ষিকা। তার উপার্জনে সংসার চলে।

গোঁসাইদহ পাঁকভারে জর্জরিত। বুকে ঠাঁই বড় কম। তিলডাঙার জমির তৃষ্ণা মেটানোর ক্ষমতারহিত। ইউনিয়ন বোর্ডের আমল হয়ে পঞ্চায়েত। পঞ্চায়েতে আবার রাজনীতির সদম্ভ প্রবেশ। এবং তার ভূমিকায় গ্রামজীবনে প্রচণ্ড তোলপাড়, বর্গাদার শূল, তিন বিঘের মালিক খোকাঠাকুরকে পলকা বাউরি বলে, 'এতেক দিন শুষণ করে এসেছেন, অত্যেচার করেছেন, আজ আমাদের দিন বটে, বন্নাদার বটি, দুব ধান, তেবে —', ফলে কর্মস্থলে অনেকেই, জমি যন্ত্রণা সরিয়ে দশটা পাঁচটা, গাঁ-মুখো হয় না। বসবাসকারীরা গা বাঁচিয়ে। জমির মালিক চাষী এবং জমিহীন অপরভোক্তা চাষী দুটি শ্রেণী। খেতমজুর আর একশ্রেণী। চাষ ব্যবস্থায় উন্নয়ন এক-পা ত তিন-পা ঝুটঝামেলা, ভাগদ্বন্দ্ব। মাইলদুয়েক দূরে পিচরাস্তা কালো জিভ পেতে দিয়েছে। তার উপর মিনিবাস ছুটছে। ·

বছর পনের আগে তিলডাঙায় ব্লক থেকে বিশাল এক ইঁদারা সৃজনের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। তার জলে চাষ হবে। অবশ্যই একাংশের জমি, ইঁদারার আর কী মুরোদ। মাটির কয়েক স্তরের পরই পাথর বাধা দেয়। ফলে খনন কাজ আরও গভীর করা হয় না। তবে জল তাতেই হয়। কিন্তু চাষে আগ্রহ দেখা দেয় না। তারপরই ভূদেব খয়রার শ্যালিকা ঝিনুক গাঁয়ে আসে।

কালো, স্বাস্থ্যবতী, ভরাযুবতী স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে জামাইদাদার ঘরে থাকে। কয়েক দিনের মধ্যেই ঝিনুক প্রজাপতি, রঙবাহারে ডানায় ওড়ে. যুবক ছেলেদের মাতৃকুলের আতঙ্ক, যুবক স্বামীকে ঘিরে স্ত্রীর ত্রাস এবং বয়ঃবৃদ্ধ যৌনকাঙ্ক্ষীদের চক্ষুস্বাদ নিবৃত্তিকারক, গ্রামের চক্ষুশূল। ত ওই উড়ন্ত প্রজাপতি. কারণ কী, জামাইদাদা ভূদেব না পাগু না নন্দ না অন্য কেউ, কী ঘটাল কে জানে প্রজাপতি পড়ল গিয়ে একেবারে সরকারি ইঁদারায়। তাও আবিষ্কৃত হল তিনদিন পরে। ফুলে ভেসে উঠতে। কেন মৃত্যু, কে দায়ী, খুন না আত্মহত্যা ইত্যাদি ইত্যাদি পুলিশি প্রশ্ন এবং লোকমুখে গল্পের জন্মে ক'দিন গাঁয়ের বাতাস প্রচণ্ড ভারী। অন্য কোনো শব্দই শোনা যায় না। তারপর পরিত্যক্ত ইঁদারা। ওই জল কেউ ব্যবহার করে না। চওড়া বাঁধানো চকচকে সিমেন্টের পাড়, কেউ বসে না। ঝিনুক টানতে পারে। ইঁদারার নাম হয়ে গেল ঝিনুক ডোবা। শশধরের বউ একদিন ভরদুপুরে দেখল, ঝিনুক পাড় ধরে উঠবার চেষ্টা করছে। চণ্ডী দেখল, ঝিনুক বসে আছে পাড়ে সন্ধেবেলায়, হাত বাড়িয়ে তাকে ইশারাও নাকি করেছে। এ সবই ক্রমশ ক্ষীণ। এখন কেউ আর প্রত্যক্ষ করে না। তবে হ্যাঁ, ঝিনুক আছে ইঁদারার গর্ভে।

তিলডাঙা বৃত্তান্তে আরও কিছু যোগ হতে পারে। যেমন ওই ডাঙায় মদনের বউ-এর সঙ্গে তুলসী পরামানিক প্রেম করতে গিয়ে ধরা পড়ে। ডাঙায় একবার পুতুল নাচ আসে। পনের দিন চলেছিল। একবার ম্যাজিক। বাগাল ছোঁড়ারা ইদানিং ওখানে খানিকটা জায়গায় আর কী, ক্রিকেট খেলে। তালপাতার ডাঁটি ব্যাট, সেলুফনের প্যাকেট একরাশ গুটিয়ে দড়ি বেঁধে বল এবং কাঠির উইকেট। তবে চেঁচায়, আউট। আউট। মায়ের নামে চিন্তামণি স্মৃতি শীল্ড খুলেছিল সাধু। ক'দিন খুব জোর চলেছে।

পরিত্যক্ত তিলডাঙা সম্পর্কে কারও কোনো চিন্তাভাবনা নেই। শস্যময়তার স্বপ্ন কেউ দেখে না। না পঞ্চায়েত না অধিক উৎপাদনকাঙ্ক্ষী সরকারি প্রকল্প, না চাষী, না মালিক।

মধ্যনিশায় বটুক গাঁ ঘুরতে বের হয়। ঘুম তার খুবই কম। প্রায়ই নিশি পরিক্রমা তার এক কর্ম। এ সময় তার এক ভিন্ন তন্ময়তা থাকে, সে অন্য মানুষ, দৃশ্য অদৃশ্য একাকার, স্থূল চক্ষু কর্ণ এবং স্পর্শ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার সীমা ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। ফলে ছিঁচকে চোর দাশু, 'শালা' বলে সুট করে সরে যায়, একবার সে ধরা পড়ে। পেঁপে পেড়ে পাঁচিল থেকে নেমেছে, বটুক জাপটে ধরেছে তারপর চেঁচামেচি। পারতপক্ষে সে সামনে পড়তে চায় না বটুকের। রাতে ঘোরাটা জানে বটুকের মা। বলে, 'বাইরে ঘুরিস কেনে। রেতের বিলা, সাপখুপ, তারপর বার-দুয়োর খুলে যাস।'

বটুক শুধু হাসে। ত সে রাত ভারি অদ্ভুত, শব্দহীন, ঘুমে কাদা জীবকুল, আকাশগলা জ্যোৎস্নাবন্যা মাটির পৃথিবীতে। গাঁয়ের বৃক্ষশ্রেণী, পুকুরডোবা, খড়োচাল, টিনের চাল, ঝোপঝাড় বানভাসি। মায়াময়, অন্যরূপময়, চেনা-অচেনা বিভ্রমকারী, ছায়া-আলো মাখা কারা যেন সব শব্দহীন হেঁটে বেড়ায় আলোর লক্ষ চুমকির ছ'টা মারা বোরখা পরে। ত এমনই রূপ, মুহূর্তে পরিবর্তিত , একদিনের সঙ্গে অন্যদিনের আকাশপাতাল অমিল — এ সবই বটুক জানে। তার প্রত্যক্ষ করা। অমাবস্যা কী পূর্ণিমা, আকাশভরা নক্ষত্র কিংবা মেঘ ঢাকা আঁধারে পরিমণ্ডল,

বাতাসের প্রাণময় হয়ে উঠে গাছপাতাকে ডানা করে ঝাপটানি, নানান ধরনের শব্দ তোলা সুরেলা, চেরা, শিসের মত ভারী কিংবা হাল্কা শব্দ — বটুকের প্রখর শ্রুতিগ্রাহ্য শক্তিতে পরিচিত।

আশ্চর্য ব্যাপার ঘটে গেল এই বোধের পৃথিবীতে। তিলডাঙা এক রূপবতী কন্যা হয়ে দাঁড়াল। চোখ কচলাতেও সেই কন্যাই। মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে স্থির হতেও আবার সেই কন্যাই। রুপোলি কন্যা। মাথার দীঘল কালো চুল কোমর বরাবর। টানা চোখ। কপালে শিশুচাঁদ বসানো। গায়ের শাদাশাড়িতে ধবধবে শাদা আলোর পাড়, রুপোলি জরির ফুল বসানো তাতে। মুখখানা ঢলঢলে, এত লাবণি! গলায় হার, কানে কুন্তল। পলকহীন বটুক, নাক, ভ্রূ, ঠোঁট, চিবুকের অপরূপ কারুকাজ দেখে। বিভু পাল এমনই সরস্বতী গড়ে না। উপমা দ্রুত তাকে হাঁস এবং বীণার সন্ধান করায়। থাকলে দিব্যি মানিয়ে যেত। গা থেকে বেরুচ্ছে অত্যুজ্জ্বল রুপোলি ধোঁয়া। কিন্তু চাউনিতে এত বিষণ্ণতা, কান্নার ছায়াঘনত্ব, ব্যথাতুর, যন্ত্রণাবিদ্ধ। বটুকের বুক হু হু করে উঠল। এমন সুন্দরে মসিরেখার টান মেরেছে কে হে! তুমি কোন শয়তান! এমন দেবীকে কলঙ্কিত কর। দেবী বৈকী, দেবী নির্ঘাত। স্বর্গ থেকে নেমে এসেছেন। মাটির পৃথিবীতে তাঁরা ত নামেন। তাঁদেরই সৃজনা কী না! এই পৃথিবী, মানুষ। বটুক হাঁটু গেড়ে প্রণাম করে।

'মা, জননী, কে বটেন আপনি?'

'আমি তিলডাঙা বটুক!'

'তিলডাঙা ত ডাঙা বটে — মাটি।'

'মাটিই ত মা বটুক।'

'ঠিক। ঠিক। মা-টি। ওটি কী? না মাটি। ক্ষমা করে দেন মা। ভুল হনছিল। তা কী নিবেদন, দিখা দিলেন কেনে?'

'আমার বড় কষ্ট বটুক।'

'কষ্ট। কষ্ট কিসের লেগে?'

'মা যদি ছেলেদের খেতে দিতে না পারে, কষ্ট হয় না? খাইয়েই ত মায়ের সুখ। ছেলেপুলে যাতে খেয়ে-পরে বেঁচে-বর্তে থাকে, তাতেই ত মায়ের আহ্লাদ!'

'ঠিক। ঠিক বটে। আমার মাও আমাকে খাইয়ে সুখ পায়। আমি বুঝতে পারি।'

'খাওয়ানোর জন্য আমি ব্যাকুল। কত খাবার আমার। কেউ হাত বাড়িয়ে নিচ্ছে না। মায়ের বুকের দুধ না টানলে কী হয়। বুক টনটন করে মায়ের। বটুক, বুক আমার—। চষলে আমার বুকে তরিতরকারির অভাব হবে না। ফসলে সবুজ হয়ে থাকবে। আনন্দে আমি ঝলমল করব।'

'বটেই ত। অত জমি। খাঁ খাঁ করছে। ঠিক আছে আমি ব্যবস্থা করছি।'

'তার জন্যেই ত তোর সঙ্গে দেখা করলাম।'

'আহা। চোখমুখ ছলছল করছে মা জননীর। বুক টনটন। হারামজাদা ছেলে সব, দুধ টানে না গো। কেঁদ না মা জননী।'

'তুই কি করবি বটুক?'

'তা বটে। কী করব বল দেখি মা জননী।'

'এখানে যত লোকের জমি আছে, সবাইকে বলবি লাঙল দাও, ফসল লাগাও, এমন করে ফেলে রাখ কেনে, নিজেদের লোকসান বোঝ না? তিলডাঙা দিনরাত কাঁদছে। তোমরা দেখতে পাও না?'

'বলব মা জননী। তুমি নিশ্চিন্তি থাক।'

'তাহলে আমি যাই বটুক।'

তিলডাঙা কন্যা, উহুঁ জননী জ্যোৎস্নায় মিশে গেল। ফটফটে জ্যোৎস্নায় শুধু মাটি। অনেকটা দূরে গণেশপুরের গাছ অন্ধকার কামড়ে আছে। বটুকের মাথায় চিন্তার ভার। কতক্ষণে সকাল হয়, মানুষ জাগে। সারারাত সে ঘুরে বেড়ায়।

বটুকের তিলডাঙা কন্যা কী জননী দর্শন গাঁয়ে চাউর হয়ে যায়। বটুক ছোটাছুটি করে এঘর-ওঘর, রাস্তায় একে-ওকে, একবার নয় বার বার বলে, 'শুনছ সকলে, হেই ছেলেরা, মায়ের দুধ টান। মা ডেকেছে।' শোনা এবং প্রতিক্রিয়া নানা ধরণের। আধপাগলা মানুষ কত কী দেখে কত কী বলে, সব কিছু ধরতে গেলে চলে না, পাগলের দস্তুরই অসংগতি, কথায় এবং কাজে। কিন্তু এ বিষয়টা উড়িয়ে দিলে চলে না। গভীরতা আছে। তিলডাঙার নারীরূপে আবির্ভাব সম্ভব কী অসম্ভব, প্রশ্ন হতে পারে, কিন্তু চাষ যে হয় না, আগে হত, ফসল উৎপাদিত হতে পারে যা মঙ্গলজনক লাভজনক এতে কোনো প্রশ্ন নেই, সন্দেহ নেই। কথাটা মুখে কেউ তোলে না। তিলডাঙার নারীরূপ সম্পর্কিত কথা, যেন মুখোশ ঢাকা স্বরূপ অন্তরালে, মুখোশই চরিত্র, এমন করে ব্যাপারটা আলোচনাপাত করে।

গাঁয়ের পুরোহিত আবু চক্রবর্তী তামাটে মুখের কপালে সিঁদুরের টিপ, লালপেড়ে ধুতি, নিত্য নারায়ণসেবী, গাঁ, আশপাশের গাঁ যজমান, বলল, 'মানুষ ভাবে সব জেনে ফেলেছি। ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস নাই। অত সোজা। মুখ্য — মুখ্যু সব। ভাগ্য চাই। দর্শনে ত মুক্তি। বটুক ভাগ্যবান। ধরিত্রীমাতাকে দেখেছে। মাটিই ত সব রে। ধরিত্রী পূজা হয় না? অম্বুবাচীতে কেন লাঙল দিতে নেই? মাও রজঃস্বলা হয় বাপ সাধারণ মেয়ের মত।'

গোপাল কেমিষ্ট্রিতে অনার্স নিয়ে পড়ছে। বটুককে ধরে সব জিজ্ঞাসার পর বলল, 'ঠিক কথা, একদিন দুপুরে বাস ধরতে যাচ্ছি, মনে হল তিলডাঙা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে।'

সদুজেঠী, বিধবা, উপোস, সব দেবদেবীর পূজায় একনিষ্ঠা, ছোঁয়াছোঁয়িতে জাতিপ্রথায় ঘোরতর বিশ্বাসী। বলল, 'তিলডাঙা নয়, ও হল লক্ষ্মীঠাকরুন। খিপা চিনবে কী করে! বলে কি, না না জেঠী প্যাঁচা ছিল না। আর লক্ষ্মী আমি চিনব না। ঘরে বাঁধানো ছবি রইছে। পূজো করি, চিনব নাই।' সদুজেঠী মুখ বেঁকায় বলে, 'লক্ষ্মীঠাকরুন যে নানারূপ ধরে রে হাঁদারাম। চোখ খুলে দেখলে হাতে ঝাঁপি, নিচে পেঁচা দেখতে পেতিস।'

পাঁড় মাতাল সুধো বলল, 'অমন আমিও দেখি। বটুক আর লতুন কী দেখল?'

ঝিনুক প্রসঙ্গও চলে এল। অপঘাত মৃত্যু, আত্মা শান্তি পাবে না, দিনে রাতে পাক খাবে, নানা মূর্তি ধরবে, অন্যকে টানবে, এই বিশ্বাসে মহাদেব, চল্লিশের ওপরে যার বয়স, টেকো মাথা, ভূত বিশ্বাসী, যার বড়মেয়ে শঙ্করীকে ভূতে ধরেছিল, ভূষণের ঝাড়ফুঁকে ভাল হয়,

তারপর বিয়ের পর দিব্যি ছেলের মা. বলল. 'ঝিনুক লয় ত। এমনটি হতে পারে।' পটলার বউ গালে হাতে দিয়ে বলল. 'ঠিক। ঠিক।'

সহদেবের ওই দর্শন থেকে মূল সূত্রটির জোর টানুনি মস্তিষ্ক কোষ টের পেল। দু'বিঘে বাপুতি, ভাগে চারবিঘে ধানী জমি, গাঁট্টাগোট্টা চেহারা, ত ওই জমি নির্ভরতায়, অন্ন বস্ত্রের সংসার খিঁচুনি অবিরত। বলল, 'আসল কথা হল চাষ করা, জমি নিয়ে গাঁয়ে টানা-হেঁচড়া। এতখানি জমি কেনে পড়ে থাকে। চাষ কেনে হবে না। তিলডাঙাতে আমার জমি নাই, থাকলে চষতাম।'

হরু ওঝা বলল, 'তেনারা আছেন গো। তা ক্ষণ না হলে বেরুন না। তেমন তেমন তিথিতে গাঁয়ে এখানে ওখানে তেনাদের দেখতে পাবে। বাতাসে ভেসে বেড়ান। আমি ত আকছারই দেখি। এই ত পরশু — থাক গুপন কথা গুহ্য কথা পেকাশ করব না।'

সায়েন্স টিচার পবিত্র দাস বললেন, 'জ্যোৎস্নায় মানুষ ওরকম দেখে। চোখের ভ্রম। ইল্যুসান। জ্যোৎস্নায় মানুষ পরী দেখে। বটুক চাষ হচ্ছে না, পড়ে আছে এ সব ভেবেছিল। তারপর তন্দ্রায় সে হেঁটে গিয়েছে।'

সহদেবের কথাটার টক্কর ধনার মাথাতে। বিঘে দশেকের মত জমির মালিক। গোঁয়ার জেদী মানুষ। ভাই নেই, কাকা জ্যাঠা নেই। বেঁটেখাট শক্তপোক্ত চেহারা, মাথায় ঝাঁকড়া চুল, বছর ত্রিশ বয়স। দুটি ছেলে। বউ লক্ষ্মী। ছিপছিপে, রোগা মেয়ে, স্বামী ভয়ে সর্বদাই জড়সড়, দু'বার বাপের ঘরে বসিয়ে দিয়ে এসেছিল ধনা, আবার এনেছে। তিলডাঙা চাষযোগ্য হতে পারে তীব্র টানের তীরটা মাথায় গেঁথে ধনা বউকে বলতেই মেয়েমানুষ হাতের ঝাঁটা বন্ধ করে বলে, 'আমাদের ত বার কাঠা জমি আছে উখানে।'

ধনা বলে, 'হু, আমি চষব। কিন্তু ইকা ত হবে না। আশেপাশের সবাই নামবে তবে ত।'

লক্ষ্মীর ঢলঢলে শ্যামলা মুখ, পুরু ঠোঁট, বড় বড় চোখে উৎসাহ ঝিকিরমিকির করে, 'সবাইকে বল, ইতে ত লাভ হবে সবারই।'

অনর্থক সময়পাত ধনার কুষ্ঠিতে নেই। সে বেরিয়ে পড়ে। আধপাগলার কথা কেউ শুনবে না, তার কথা শুনবে। সবাইকে সে বলবে, চাষ কর। দেখা যাক, কে কে আসে। ফুলের সন্ধান পেলে মৌমাছির ডানা আপনা থেকেই বাতাসে ভাসে। মধুর গন্ধ সে পায়।

তখন বটুক ভূষণ মালির ঘরে বর্ণনা দিচ্ছে তিলডাঙা কন্যার। এবং ভূষণের বিরাশি বছরের মস্তিষ্কে তিলডাঙা কন্যার আবির্ভাব সম্ভবের অগাধ বিশ্বাস। বিরাশিতেও সে হাঁটতে পারে লাঠি হাতে, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ, গাল চোপসানো, মাথা শণ। বড় বিভ্রম ঘটে যায় দিন এবং রাত্রির আসা যাওয়ায়, অসংখ্য মানুষের জন্মমৃত্যুর ঘটনাতেও তালগোল পাকানো সুতোর জট। কিন্তু তিলডাঙার অতীত চিত্র কেমন ঝপ করে আসে। স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা করে না। সে প্রত্যক্ষ করে যুবা ভূষণকে। বলদ নিয়ে ঘেমো বুকে হেট্ হেট্ শব্দে লাঙল মারছে, দু'হাতে দুটো ফুলকপি তুলে আনছে, কোদাল পাড়ছে মাটিতে, সেউত দিচ্ছে জল। সবুজ শরীর হলুদ চাদর মাথায় দিয়ে সরষেখেত দুলছে, বেগুনখেতে ঢাউস ঢাউস শাদা, কালচে বেগুন, ওদিকে গমের শীষে পুরন্ত যুবতীর মত বাতাসে বিভঙ্গ। তিলডাঙায় আরও মানুষ চাষমগ্ন। জাগালির কুঁড়ে একখানা। সামনে মাটির কলসি কাত হয়ে আছে. ঝিনুক. গুগলি. শামুকের খোলের

ভঁইহ, গোবর নিকানো ঝকঝকে উঠোন, আর লালডোরা শাড়ি, বাদলা হাড়ীর বিটি কলি।
পেয়াঁজ কলি। বাদলা জাগালি। 'ও কলি তুই মন কাড়লি, কাছে এলি না, রূপের ঝাঁজের শিকলি পায়ে, লড়তে পারি না' আলকাপের ঢঙে কোমর নাচাতেই কলি চ্যালা কাঠ নিয়ে ছুটে আসে। তারপর এক সন্ধেয় কলির হাত চেপে ধরতেই একেবারে বুক বরাবর নরম সৌগন্ধময়, বাজনাদার রক্তে কাঠির দমাদম আছাড়। কলিকে সাপে কাটল। বুক হু হু করে ওঠে। তিলডাঙা আছে, কলি আছে, বাদল জাগালি আছে, কে আছে আর কে আছে, কে নেই? কবে সে চাষ ছেড়েছে? ভূষণের বুক ওঠানামা করে। দাওয়ায় হেলানো পিঠ, কোমরে খাটো টেনা, বুক উদোম, চোখে ঝাপসা ঝাপসা।

'ও জ্যাঠা, ঘুমিয়ে গেলে! তিলডাঙাতে তোমার কতট জমি?'

'আমার জমি। নাই। সে চষে তার। খগা, জগা, লাতিন —।'

'উদিকে চাষ করতে বল। খগাদা গেল কুথা?'

মস্ত উঠোন। পায়রা চরছে। তিনদিকে ঘর গোয়াল। দু-ছেলে, নাতি-নাতনি। পাঁচ মেয়ে। চারটি শ্বশুরঘর করছে। একজন নেই। তবে সংসার আছে। সব খড়ো চাল ঘর, সংলগ্ন দাওয়া। পুবে খামারবাড়ি। ভাগাভাগি সব। বুড়ো ভাগ হয় নি। যে যখন খেতে দেয়, দেখে। ত খগার বউই দেখভাল করে। ওদিকে রাঁধছে। বেলা নটা। তকতকে রোদ। মরা শীতের খসখসানি চৈত্রের বাতাসে। উদাসী ধুলোপাত ওড়াওড়িতে, সকলেই তুচ্ছতার পাকঘূর্ণি। দু'ঘরের এক কুকুর উঠোনে লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। জগার তিন মাসের ছেলেটা চেঁচাচ্ছে। পুঁটিমাছ ভাজার গন্ধের সঙ্গে কান্নার শব্দ। জগার চার ছেলের বড়টি, বাপের চাষসঙ্গী, বাটিকপ্রিন্ট লুঙির উপর স্যান্ডো গেঞ্জি, শক্তমুখ, 'কী বটুককা, তাহলে তিলডাঙা কন্যে কী বললেক' ঠাট্টার ঢঙে বলে সামনে দাঁড়ায়।

'হ্যাঁরে, তোদের কতটা জমি আছে তিলডাঙাতে?'

'বাবা বলছিল চোদ্দ কাঠা। দু'ভাগ। কাকার সাতকাঠা। আজি বাবা বলছিল।'

'খগাদা কুথা গেল?'

'তা কী করে জানব। গাঁয়েই আছে কুথাম।'

'জগাদাকে খগাদাকে চাষ করতে বলতে হবে।'

'তিলডাঙাতে। সকাল থেকে ওই করে বিড়াছ। যত ঝামেলা!'

'ঝামেলা কিসের? দাদুকে শুধো। চাষ হত কী না। এখনও হবে।' বটুক হাত ধরতে চায় বিগলিত হয়ে নন্টুর, 'এই নন্টু, বাপ আমার, চষ — চষবি গা।'

'তুমার পারা ত খিপা হই নাই। তিলডাঙা কন্যে স্বপ্ন দেখে চিঁচাতে লেগেছ।'

'স্বপ্ন লয়। সত্যি। মাইরি দেখেছি, কাঁদছিল। মাইরি। মা কালীর দিব্বি। পুষ্পু লিয়ে আয় আমি ছুঁয়ে বলব, জোছনাতে ঝলমলিন দাঁড়ালেক। মাটি মা বটে কী না, — বল।'

ভূষণ মুখের ঝোল টেনে বলল, 'তোর ভাগ্য ভাল রে বটুক। মা দেখেছিস। আহা তোর কথা যদি সবাই শোনে।'

'বেটাদিকে বল চাষ করতে —।'

দীর্ঘশ্বাস পাকা লোমশ বুকের ঝোলা চামড়ায়। ভূষণ বলে, 'কে বাপ কে বেটা!'

'তুমি ঘর যাও দেখি নি। দাদু ইবার, হুঁ, বকতে লাগবেক।'

'বসুক। বসুক। বকব নাই। একটুস্ কল্কেটে দিবি। ও বড়বউ।'

নন্টু দাঁড়ায় না। জোর পায়ে বেরিয়ে আসে। মুখে বিরক্তির ছাপ। পাগল আর বুড়োয় তফাত নেই। কী যে ভাবে কী যে বলে।

বড়বউ হাঁক দেয় ওদিকে, 'কী হল!'

'একডুং আগুন। অ নন্টু লিয়ে আয়।'

নন্টু আগুন আনতে যায় না। বাইরে আসে। টিয়া কোচিং ক্লাশ থেকে এখনই এ রাস্তা ধরে আসবে। শচীন স্যারের কোচিঙে পড়ে। ফটিক সাধুর মেয়ে। ফরশা ছিপছিপে দেহলতা। পনের বছরে এত আকর্ষণ মুখে চোখে, চুড়িদার পরা অঙ্গে, খাড়া বুকে। নন্টু মুগ্ধ, প্রেমাহত। তবে প্রাথমিক পর্যায়। চোখে চোখে কথা মাত্র।

'তোর বাবা রইছে ঘরে?' ধনু জিজ্ঞাসা করে।

'না।'

'কথা বলছে কে?'

'আবার কে। খিপা বটুক আর দাদু। তিলডাঙা কন্যে! ভূতে ধরেছে উদের।'

'ভূত লয়। ঠিক বলছে। চেতনার কথা', ধনা ঢুকে পড়ে ভেতরে।

নন্টু ভাবে, একেও ভূত ধরল নাকি? ধুস্। এমন সময় দেখা যায় টিয়া আসছে। বুকের কাছে বই। ভূতে ধরার মত নন্টু হাঁ করে তাকিয়ে থাকল।

দুলাল নন্দীর কোঁচকানো ভুতে স্পষ্ট বিরক্তি। উপর ঠোঁটের বাঁ কোণ উঠে সামান্য দাঁতের উদ্ভাস। শিবু এমন গদগদ কণ্ঠে তিলডাঙা কন্যা দর্শন বলে ওঠে, 'জানো দুলাল দা, বটুকের সামনে তিলডাঙা মেয়েমানুষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল, একেবারে মানবী, কেঁদেকেটে নাকি একসা', শুনে থুথু মেশানো তাচ্ছিল্য দুলালের, 'ছাড় ত পাগলার কথা, তুই হয়েছিস যা হোক। ওমনি বিশ্বাস করেছিস। মানুষ হ বুঝলি। বুঝতে শেখ। বাজে ব্যাপারে মস্তিষ্ক ব্যয় করিস না। বোকা কোথাকার।'

শিবু নির্বোধ নয়। হায়ার সেকেন্ডারি পাশ। পড়াশুনা হল না। বাবা মারা গেল বাস অ্যাক্সিডেন্টে। বাবার পাশুবেশ্বরে চাকরিটা পেয়ে গেল দাদা। মাকে নিয়ে গেল। তার পড়াশুনা না, চাকরি না। গাঁয়ের বাস তুলে দেবার মতলব মা দাদার। কদিন পাশুবেশ্বরে তার ঘুরঘুরানি। তারপর গাঁ। মাটির দোতালা ঘর, চার বিঘে এগার কাঠা ধানী জমি, একটা ডোবার সিকি ভাগ, দুটো আম আর অর্জুন গাছ—সে থেকে গেল। গাঁ দেখতে হবে না! ছেলে পড়ায় প্রাথমিকের। নিজে রান্না করে খায়। তারপর দুলালদার চামচা। চামচা শব্দটি এখন আর ব্যবহার হয় না। ল্যাংবোটও না। দুলালদার অ্যাসিট্যান্ট। কেউ কেউ বলে, লেজ, যে দিকে ইচ্ছে দুলাল ঘুরিয়ে কাজ করে। তবে টিকটিকির লেজ। খসে গেলেই-বা কী। পুকুরের মাটি কাটানো, ইদারা তৈরি পঞ্চায়েত সূত্রে কাজকর্ম এবং এটা ওটা করা, কারও জন্য সুপারিশ, দুলালের বডি গার্ড হয়ে ঘোরা শিবুর কাজ। বাইশ বছরের পাটালো বুক, পেশীবহুল বাহু, কঠিন জঙ্ঘা, থ্যাবড়ানো ভারী মুখ শক্ত সমর্থ শরীরের যে জীবনচক্র তা ওই কর্মেই আবর্তিত। দুলাল কেন্দ্রিক যে

যুবাবৃন্দ তার মধ্যে শিবু সেরা, ঘনিষ্ঠ। দুলাল সমর্পিত জীবন। বুঝে ফেলেছে এই লোকটাকে ঘিরেই তাকে দাঁড়াতে হবে, শিকড় মেলে মাটি কামড়াতে হবে, শাখাপ্রশাখার বর্ধন কর্মও করতে হবে। শিবু দুলাল স্নেহধন্যে পরেশ দীপক আরও গ্রাম্য তরুণদের হাফলিডার। এবং গাঁয়ের স্বাক্ষর নিরক্ষরদের কাছে দুলাল নন্দী ভায়া শিবু এভরিথিং।

শিবু, 'কে বিশ্বাস করেছে — আমি — তিলডাঙা কন্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে পাগল ছাড়া কে বিশ্বাস করবে', বলে মুখ ভারী করে।

'তাহলে আমাকে ওরকমভাবে শোনালি।' দুলাল বাঁকা চোখে তাকায়। ভাবে শিবু কী তার চেয়ে বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছে। হাঁটুর নিচে না রাখতে পারলে নেতৃত্ব থাকে না। সবাই নিচে আমি ডায়াসে। সবাই বলবে, শেষ কথা বলব আমি। সমকক্ষ হলে প্রতিপক্ষ যে কোনো সময় হয়ে ওঠা সম্ভব। মানুষের জীবনে কখন কী ঘটে। বড়ই বেহিশেবী জীবনের ধারাবাহিকতা।

'এর মধ্যে যে অন্যরকম ব্যাপার ঘটতে চলছে।'

'পরিষ্কার করে বল শিবু, পাঁচ কষছিস কেন?'

'তিলডাঙা মেয়েমানুষ হয়ে কেঁদে বলেছে, চাষ হয় না। দুঃখে তাই ছাতি ফাটছে কন্যার। ফসল দিতে না পেরে মরে যাচ্ছে। পাগলা সেটাই বলছে, চাষ কর। চাষ কর।'

'পাগলার মাথাতে বুদ্ধি গজিয়েছে বল।'

'হালকা করো না দুলালদা। বুদ্ধিতে কাত হয়েছে অনেকে। হবারই কথা জমি বাড়েনি মানুষ বেড়েছে। কাত হবেই।'

'ওই পর্যন্ত। কাত হয়েই থাকবে। কাজ হবে না। রুখু ডাঙা, জলাভাব। সবাই এক হয়ে এর ব্যবস্থা কোনদিন করবে না। এক হওয়া সহজ নয়। মানুষের হাতের পাতায় পাঁচটা আঙুল পাঁচরকমের। হাত কাজ করে। কিন্তু মানুষ নামের আঙুল সবাই স্বতন্ত্র। তাহলে ইতিহাস অন্যরকম হত। তাহলে —।'

'ধনা সবাইকে একজোট করার চেষ্টা করছে।'

'ধনা একটা গোঁয়ার। ব্যাঙ্ক লোন ত পেয়েছে। বলদ কিনতে না! ওকে ভয় নেই। কেবল নিজেকে চেনে। সবাইকে নিয়ে চলার মত হিম্মত নেই। তুই ভাবিস না।'

'আমি অন্যরকম গন্ধ পাচ্ছি দুলালদা।'

'গন্ধ। আবার কী!'

'গাঁয়ের যা কিছু সবেই তুমি। নরেনদা, আশুবাবু, তরুণ এরা ত — যাক্ গে। সব তোমারই উদ্যোগ। রাস্তা বল, জলের কল বল, সাক্ষরতা অভিযান বল, মিনিকিট, ব্যাঙ্ক লোন সুপারিশ, বর্গাদার ফসল ভাগাভাগি, তোমাকে বাদ দিয়ে কিছু হতে পারে না। ব্যাপারটা যদি ক্যাচ করে নেয় অপজিশন!'

' কে? অবনী?'

'অসম্ভব কী।'

'অসম্ভব। অবনীর প্রশাসনে ক্ষমতা নেই। লোকে ক্ষমতা চেনে। যার হাতে অস্ত্র, কেটেকুটে জঙ্গল, সাপ বাঘ সরিয়ে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, তার পোঁ ধরবে সবাই। ভবিষ্যতের বুকে লোকে ঝাড়ু মারে। অবনী ভবিষ্যৎ। নাও হতে পারে। অন্য কেউ হবে। অবনীর কথা

শুনবে কেন? আমার কাছে ওরা আসবে।'

'তিলডাঙাতে যদি চাষ করানো যায় দুলালদা, তাতে তোমার পজিশন বাড়বে। কাজের মত কাজও হবে। সবাইকে ডেকে তুমি যদি বল। আমাদেরও জমি আছে।'

'থাক। তিলডাঙাতে চাষ হবে না, তুই জেনে রাখ। ওটা ওভাবেই পড়ে থাকুক। তিলডাঙা এখন মূল্যহীন। লাভের সম্ভাবনা দেখা দিলেই সমস্যা আসবে। অধিকার, ভাগ, হেনতেন। কী লাভ সমস্যা বাড়িয়ে। জমির অধিকার নিয়ে ত কম হুজ্জোত নেই। সাপ ব্যাঙ চুমু খেতে হচ্ছে। ছোটবড় অনেক মালিক, অনেক বর্গাদার। গাঁয়ে ত এটাই সমস্যা।'

শিবু কথা বলে না। সমস্যা বাড়বে! নিষ্ফলা জমি ফলবতী হলে ত উৎপাদন। মানুষের লাভ। সে কেন বুঝতে পারছে না? ভাবে, বুঝতে পারলে ত দুলাল নন্দী হয়ে যেত সে।

দুই

দুলাল নন্দীর পাজামার উপর আদ্দির পাঞ্জাবি বকের শাদা পালকের মত। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে দুলালের দুর্বলতা বরাবরই। ফুলবাবুটি ভাব। অঙ্কের স্যার সুধীনবাবু বলতেন, 'দুলাল টেরি, সিঁথি ত বাবা ঠিক করিস, একটা সরলরেখা ঠিক হয় না কেন ?' ধুতি-পাঞ্জাবি, পাজামা-পাঞ্জাবি তার পরিচ্ছদ। সব সময়ই ঝকঝকে। ঘাড় গলায় পাউডার। মুখ মসৃণ। রুমালে জুঁইগন্ধী সেন্ট। কখনও ভাঁজ খাওয়া কী ময়লাদুষ্ট থাকে না তার পোষাক। পায়ের চটিটায় পর্যন্ত পালিশের চেকনাই। পঞ্চায়েত প্রধান হওয়ার আগে থেকেই তার এই বাবুয়ানি। দাদা বোম্বাইয়ে। বউদি ভাইপো ওখানে। একটা কাপড় মিলের একাউন্টস্ অফিসার। মস্ত উপার্জন। পুজোয় বাড়ি আসেন প্রবাল। সদর থেকে সাত দিনের ভাড়ার একটা ট্যাক্সি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে থাকে। দুলাল লক্ষ্মীপুর হাইস্কুলের বাংলার শিক্ষক। পঞ্চায়েত দায়িত্ব মাথায় চাপতে জনসেবার চাপে ছাত্রসেবা হয়ে ওঠে না। বছর বত্রিশ বয়স। গোলমুখ, ভরাট গাল, চোখ ছোট। সবকিছু জেনে ফেলার মত সদম্ভ ভাবভঙ্গি। ধীর স্থির প্রাজ্ঞের মত বাক্য ব্যবহার করে। শত্রুর সামনেও হাসিমুখ। পঞ্চায়েত এই কবছরে দুলাল নন্দীকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দলের সে সংগঠক। জেলাস্তরেও তার প্রভাব প্রতিপত্তি আছে। জেলার নেতা অরবিন্দ জেলায় ভাগে প্রাপ্ত মন্ত্রীটির ঘনিষ্ঠজন। দুলাল অরবিন্দর বন্ধু। কলেজে একসঙ্গে রাজনীতি করত। বুদ্ধি এবং চাতুর্যে পঞ্চায়েত তারই নিয়ন্ত্রণে। বাকি সদস্যদের বিরুদ্ধাচরণ করার ক্ষমতা নেই। মূল শক্তি জনগণ নয়, নিম্নস্তরের কর্মীবৃন্দ। তারাই জনগণকে চালিত করে। ওই স্তরটির এ অঞ্চলের সব মুখ দুলাল নন্দীর আয়নায় বন্দী। তবে যে কোন মুহূর্তে তার জমি কর্ষণের অধিকার হাল সংগৃহীত এবং চালনা সুরু হয়ে যেতে পারে। ফলে নজর তীক্ষ্ণ রাখতে হয়। খবর সংগ্রহ করতে হয়। অবনীর অনুরোধ রক্ষা করতেই হয়। কর্তৃত্ব করার জন্য কলাকৌশল জানা প্রয়োজন। দেবতা এবং শয়তানের ভজনা করতে হয় একইসঙ্গে। পারলে ব্যালেন্স থাকে তাতে। কিন্তু সব সফলতা জোটে না তবু।

মানবজীবন বহনকারী অস্তিত্বে দুর্বলতম অংশ অবধারিত। অসহায়তার চটচটে রসক্ষরণ ঘটে তাতে। যেখানে সে অসহায়। স্পর্শও যন্ত্রণাময়। চাতুর্যকলা মোটা চাদরের বুনুনিতে তাকে আচ্ছাদিত করে রাখে। দুলাল গ্রামীণ রাজনীতিতে সফল। কিন্তু সংসার! এখানে ঈশ্বরের চরম মার। বিধাতার ঝাপটানো জোরালো পক্ষীরূপী ডানায় কিংবা তীক্ষ্ণ ধারলো ইস্পাত চঞ্চুতে। বন্দনা, তার স্ত্রী, একদা যুবতী, উঁচু বুক, সরু কোমর, ভারী নিতম্ব, চোখের রেখায় কাজলে বিদ্যুৎ এবং নিশিশয্যায় অতলান্ত সমুদ্র তলদেশে মাছের মত বিচরণের ক্রীড়াসুখ, এখন দুঃখবৃক্ষের জন্মদাত্রী। যার শাখা-প্রশাখায় বিবিধ যন্ত্রণার পত্র, পুষ্প এবং ফল। অবিরত

উৎপাদন দেয়। অবিরত বৃদ্ধি পায় বৃক্ষপরিধি

আটভরি সোনা, নগদ পঁচিশ হাজারের সঙ্গে নরম স্বাস্থ্যবতী কামিনী, বছরখানেক চরম যৌনসুখ, সুগন্ধ বাতাসে কিংবা ওই মাছের মত সমুদ্র গভীরে বিচরণশীলতা, তারপর সাত মাসের মাথায় সন্তান বিনষ্টি, যেন হাত থেকে কেড়ে নিয়ে দুলালের, দলে পিষে চটকে ফেলে দিল। জটিল স্ত্রী রোগের ক্ষেত্র বন্দনা। নানা পরীক্ষা, ডাক্তার, ওষুধ, জড়িবুটি, হাতচালা, কবচ। ক্ষেত্র সেই বিধ্বংসী। স্বভাবে খিটখিটে। প্রায় সময়ই শয্যালীন। মাথার চুল উঠে টাক। হাসতে জানে না, অমন আয়ত উজ্জ্বল চোখ বন্ধ হয়ে থাকে অবসাদে। নারীত্ব মৃত। ত তাড়না ধ্বস্ত দুলাল, ব্লাউজ সরিয়ে বুকে খামচানো নয়, আদর রাখতেও মুখ বিকৃতি। মেয়েমানুষ ত। অঙ্গ আছে। ব্যবহার চেষ্টামাত্র হিংস্র। মায়ার জন্ম পর্যন্ত নিতে দেয় না দুলালের মনে। অসহনীয় বন্দনার ন্যাকামো। বলে 'আমার কী হল বল ত। তোমার কত কষ্ট হচ্ছে।' বলে, 'এই তুমি বিয়ে কর, আমার জন্য তোমার জীবন নষ্ট হবে কেন?' বলে, 'বিষ এনে দাও, মরে বাঁচি।' বলে, 'আমার ভাগ্য দেখ, দেবতার মত স্বামী পেয়েও ভোগ করতে পারলাম না।'

দুলাল গোড়ায় কিছু সান্ত্বনা বাক্য ব্যবহার করত। এখন মনে হয় ন্যাকামো, কান্নাভেজা ফ্যাসফ্যাসে মেয়েমানুষের স্বরে সে জ্বলুনি টের পায়। সহ্য করতে হয়। শরীর নেই, প্রেম নেই, মায়া নেই — যা আছে তা বিতৃষ্ণা, ঘেন্না। সংসারে স্থান দিতে হয়। অপ্রয়োজনীয় কত সামগ্রীই ত থাকে। অসুস্থা স্ত্রীর প্রতি দুর্ব্যবহার প্রভাব ফেলবে। নেতা হওয়া ইস্তক কত বিচারের বিচারক। তুমি আসামী হও কী করে সোনার চাঁদ! মুখে, আহা মেয়েমানুষের কত কষ্ট। শুনে লোকের কাছে দয়াময় পুরুষ, সহনশীল পুরুষ, মহৎ দৃষ্টান্ত। বন্দনা মারা গেলে দুলাল বেঁচে যেত। গোপন এই আর সত্য, বন্দনার মৃত্যু কামনা সে করে। যথেষ্ট তীব্র ভাবেই করে। সঙ্কোচ নেই, পাপ ভয় নেই, অন্য কামনার জন্যে নীতির কামড়ানি নেই। কিন্তু মৃত্যু এক অদ্ভুত রসিকপুরুষ। তার কর্ম হিশাবের মধ্যে দিয়ে হাঁটে না। চামড়ার খোলে হাড়ের কাঠামো, বসা গলা, ফ্যাকাশে ঠোঁট, হলুদ চাউনি, শ্বাস কষ্টে শুকো স্তনে দিব্যি বছরের পর বছর টিকে থাকে।

দুলাল নিজেকে একজন কৃতী পুরুষ ভাবে। গুণ থাকলে অহঙ্কারকে লালন করতে হয়, অবশ্য তার পরিমাণ সঠিক হওয়া প্রয়োজন, নইলে ঝলসায় না। সোনাও চকচকে না রাখতে পারলে মানুষের পিতল ভ্রম ঘটাতে পারে। বর্তমানের সৃজনকর্ম তার বুদ্ধিপ্রাচুর্যে। বাল্যে বাবাকে হারিয়েছে। কষ্ট করে মানুষ করেছেন মা। জমি সম্বল। মামার সহায়তা ছিল। পাশের গাঁয়েই মামার বাড়ি। দাদা প্রবাল মেধাবী। সে সাধারণ। বছর বছর পাশ করেছে। দাদা ফার্স্ট ডিভিশন, অ্যাকউন্টেন্সিতে অনার্স, চাকরি পেয়ে গেল। তারপরই টাকা পাঠাতে শুরু করে। এখন বন্ধ অবশ্য। প্রয়োজন কী! দুলাল ত সমর্থ। একতলা বাড়ি হল। খাট, আলমারি, টেবিল, ইঁদারা, স্কুটার। দাদার মস্ত উপার্জন, দাদার দান আছে এসবে, একথা সে বলে বটে। আসল সত্য ভিন্ন। দাদাব নাম তার অর্থনৈতিক উত্তরণকে পঞ্চায়েত উপার্জন বলে চিহ্নিত করতে পারে না।

পঞ্চায়েতের বিস্তর কাণ্ড। সকলই তো পঞ্চায়েত মাধ্যম ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণে এক কেন্দ্র। লোন অনুদানের নানা শ্রেণীর বিন্যাস, গাঁয়ের মানুষের একের পর এক সমস্যা, সংগঠন

িকক্যক রাখা, মিটিং, ছোটাছুটিতে ব্যস্ত মস্তিক দুলালের। বন্দনার জন্য চিন্তার ঠাঁই বড় কম। কিন্তু ক্লান্ত দেহ রাতের বিছানায় যখন সুখ হাতড়ায়, নরম হাতের উষ্ণ পরিক্রমার জন্য ত্বক, শিরা, অনুভূতি উন্মুখ, শরীর আস্বাদের জন্যে সব ইন্দ্রিয় হাঁ মুখ মেরে জিভ বের করে — তখন শূন্যতা কী বিশাল। এক ধূ ধূ নির্জন প্রান্তরে সে যেন একাকী। এদিকে দিগন্তরেখা বরাবর কোথাও কিছু নেই। শরীরের কান্না তখন বুকের মধ্যে ঝড়ের ঝাপটা দেয়। উন্মাদের মত চিৎকার করতে ইচ্ছে করে। কী দহন। নিশিকালে দত্তপুকুরের কালো জলে মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ে সে সাঁতার কেটে আসুক। কিংবা ডুবে থাকুক পাঁকে, শ্যাওলা, জলজ উদ্ভিদের মধ্যে গভীরে, গভীরতর শৈত্যে।

সিউড়ী বাসস্ট্যান্ডে বকুলের সঙ্গে দেখা। কতকাল পরে। বকুল, তার নবাসায় কাতর, রোগাটে গড়ন, বড় চোখ, ফরশা রঙ, অনুচ্চ বুক, পাতলা ঠোঁটে হাসি, কেমন করে যেন এক বছরে হলুদ ব্লাউজের, হলুদ সিল্কের আঁচলেও উন্নত স্তন, ভারী মুখ, যৌবন থরথর, ঢের উগ্র। চিকণ চুড়িপরা বাহুতে, চিবুক গাল বেয়ে ঝকঝকে দাঁতে বিজ্ঞাপনী হাসি। বলে উঠে, 'ওমা তুমি! কতকাল পরে দেখা!' তখন কলেজের দিনগুলি, রাজনীতি, প্রেমে তাচ্ছিল্য, অবশ্য ধানকলের মালিকের ঘরের মেয়ে অলভ্য, দূরতর নক্ষত্র এমন বোধের ক্রিয়া এবং দ্রুত ওর বিয়ে হয়ে যাওয়াতেও 'ত কী' গোছের মূল্য না দেওয়া, কিছুই মনে আসে না। দুলাল শরীর দেখে। এও ত মেয়েমানুষ। সর্বাঙ্গে জিভ বুলুনি। বিব্রত হয় না বকুল। টের পায় কী। উপভোগ করে। উন্মুক্ত কোমরের মাংসর ঢেউ, বুকের নগ্নতা আবিষ্কারের জন্য চিরুনি সন্ধান, বাহু, মুখ, দুলালের প্রবল কামবোধ ঘর্মাক্ত করে। অনায়াস লভ্য ছিল এই নারী। এখন কার ঘরনী। তার সঙ্গে বিয়ে হতে পারত। কী উত্তেজক শরীর। কথা হয়! বকুলের স্বামী ব্যবসায়ী। নলহাটিতে কাপড়ের ব্যবসা। 'একটা ছেলে — এই তো!' নজরে পর্যন্ত পড়ে নি। গোলগাল ফরশা। বাপের বাড়ি এসেছিল। 'যেও না নলহাটি।' দুলাল, নলহাটি গেলে কী শরীর পাওয়া যাবে, ভাবনার ছুঁচলো ফোঁড়ে কাহিল, জ্বরতপ্ত। ঘরে এসেও সেই অবস্থা। আর তখনই কী না পিতিমা। না, প্রতিমা! অবিকল এক। যমজ! এমন হয়! শুধু পোশাকে ভিন্ন। কিন্তু ওই শরীর, ওই চাউনি, ওই বুক, কোমর ঘিরে একই রেখার বাঁকা চোরা। স্তম্ভিত দুলালের মনে হয় বকুল শুধু নীলপাড় শাদা শাড়িতে, বৈধব্যের রঙ বিহীনতায়। প্রবল বেগ তার নিম্নাঙ্গে। বাসনার পাখি বুকের মধ্যে পাখা সাপটায়। ব্যাপারটাকে সে মন থেকে দূর করার চেষ্টা করে। নিজের আসনটি এর ফলে নড়বড়ে হয়ে যেতে পারে। সিউড়ীতে বাজারে মেয়েমানুষ জোটে, গাঁয়ে বাগদি মেয়ে, টগর রক্ত ঠান্ডা করতে পারে, কিন্তু না বকুল চাই — না প্রতিমা। মানসিক দৃঢ়তা, ভবিষ্যৎ ভাবনা তছনছ। টানাপোড়েনের যে রক্তাক্ত যুদ্ধ তাতে প্রতিমার মুখ। এক সময় দুলাল উপলব্ধি করে শুধু শরীর ক্ষুধা নয়, সে প্রতিমার প্রেমে পড়েছে।

প্রতিমা, পিতিমা, কেউ ডাকে বউ, কেউ বউদি, কেউ কাকীমা — সমুর বউ। সমর। সমুর চাষের সঙ্গে পাঁচটা গাইয়ের দুধের ব্যবসা করে দিব্যি চলছিল। মোটাসোটা কালো চেহারা, ঈষৎ মেদ ভাব, ফোলা গাল, বাপ না হতে পারার জন্য দুঃখ ছিল বটে, কিন্তু পত্নীপ্রেম কিছু কম ছিল না। বউ দোষী, ভূষণ হাড়ী খড়ি পেতে আঁক কষে বুঝিয়ে দিতে, কী রাগ। তারপর থেকেই বিষদৃষ্টি। ছ'বছরের দাম্পত্য জীবন। পাক্কা দু-বছর পিতিমার লাঞ্ছনা, মারধোর

পর্যন্ত। রাতের বিছানায় পর্যন্ত 'নিচে থাক মাগী।' বংশধর রাখার সাধ্য হল না। সাপে কাটল। ঝাড়ফুঁক, তবু ফৌত। সমুর ভাই নিমু। সে দাদার পর হাল ধরেছে। মদো মাতাল, তবে চাষে মনোযোগী। দুধের ব্যবসা লাটে। দুটো গাই মরে বসেছে। নতুন করে ব্যবসা জাঁকানোর মতলব তার নেই। পিতিমা বাপের ঘর গেল না। শাশুড়ি দেওরের সঙ্গে ভিটেমাটি আগলে রয়েছে। স্বামী যায়, যৌবন ত যায় না। দেহরেখা কুমারীত্ব পায়।

দুলাল দেখেছে। গাঁয়ের বউ। বকুল সাক্ষাতের পর সে মুখোমুখি হতে পিতিমা ধরে ফেলে মেয়েলী উগ্র সংবেদনশীল ইন্দ্রিয়ে, ফুলে বসতে আসা মৌমাছির পক্ষ সঞ্চালনে যেমন পাপড়ির অদৃশ্য কাঁপুনি! দুলালের মুখে চোখে কী কামাবেগের ছাপ উঠেছিল? শ্বাসে উত্তেজনা! কথায় শব্দে নারীদেহকামী অক্ষরমালায়! পিতিমা বলে, 'আমার জন্যে যে তোমারও ভাবনা ঠাকুরপো।' দুলাল ওমনি হালকা, 'তোমার জন্য ভাবার লোক বুঝি অনেক! সবাই ভাবছে? কারা তারা?' পিতিমা চোখ টেনে বলেছে, 'নাম নিয়ে কী করবে। স্বামী নাই, শাশুড়িকে মানি না, দেওরকে গ্রাহ্য করি না। জমি রয়েছে খানিকটা। তারপর বলতে কী, দেখতে শুনতে ত খারাপ নই। বয়সও ডগমগে।' দুলালের এরকম স্পষ্ট উক্তি, ধারণাতীত। পলক পড়ে নি। সুন্দরী যুবতী, সন্দেহ কী, সে নইলে হামলাচ্ছে কেন? ভঙ্গি, চাউনিতে এত তির হানা, কলজে ফেটে যায়। বলেছিল, 'আমি কর্তব্য করতে এসেছি। ডি আর ডি এ-তে সকলেই টাকা পাচ্ছে, তুমিই বা পাবে না কেন।' পিতিমার ঠোঁটে হাসি, 'কী করব টাকা নিয়ে।' দুলালের বিস্ময়, 'আশ্চর্য! মানুষ টাকা চায় না।' তারপরই নত, সম্পর্ক যেন গড়েই আছে, অভিমান তাতে নম্র ফুল ফুটিয়েছে, 'মনে হচ্ছে কোনো কারণে তুমি আমার উপর চটে আছ।' ছলকে হাসি ঠোঁট থেকে গাল, ভ্রূ রেখায় উজ্জ্বল চোখে পিতিমা, 'ওমা, চটব কেন? কারও উপর রাগ নাই। ভগবানের উপরও না।' দুলাল শোকশ্বাস আপ্লুত, 'সমুদা মরে গেল। দুঃখের ব্যাপার বই কী। কিন্তু মৃত্যুর উপর কার হাত আছে বল। মজার ব্যাপার যাদের মরণ দরকার, তারই মরে না। থাক্‌গে।' ব্যস্ততার গলা করে বলেছিল, 'তোমার কথা ভাবছিলাম, দেখা হয়ে গেল, তাই বলে রাখছি, প্রয়োজনে সঙ্কোচ করো না। আমার কাছে যখন তখন যেতে পার, যা দরকার বলতে পার।' পিতিমা বলেছে, 'নিশ্চয়ই যাব। তুমি গাঁয়ের মাথা।' দুলাল জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তোমার ভাইরা শুনছিলাম নিয়ে যাবে।' পিতিমা বলেছিল, 'ভাই ত একটা। গিয়ে কেন গলগ্রহ হই। এখনই ত মরব না। এখানেই থাকি।' দুলাল বলেছিল, 'ঠিক কথা। এখানেই থাক। সরকার নানাভাবে সাহায্য করছে। তোমার অভাব হবে না। ভাল কথা, নারীমঙ্গলে, শোন কিছু মেয়েকে ট্রেনিং দেবে সেলাইয়ের। সেলাইকলও দেবে। তুমি নিতে চাও তো ব্যবস্থা করি। ডি আর ডি এ-তে গাই গরুও নিতে পার। সমুর দুধের ব্যবসা ছিল। তোমার অভিজ্ঞতা আছে। সব আমি ব্যবস্থা করব।' পিতিমা বলেছিল, 'ভেবে দেখি।'

পিতিমার চেয়ে দুলালের ভাবনা বেশি। ফলে সে ক'দিন পরই আবার ঘরে এসে হাজির হয়। সমুর মা দাওয়ায় বাঁশের মোড়া এনে দেয়, 'বস, বাবা বস। ও বউ, একটু দুধ চা কর দুলালের লেগে। কাকে খুঁজছিলে? নিমু ত ঘরে নেই? অ বউ।' পিতিমা ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। ঠোঁটে হাসি। আলো কি পতঙ্গকে চেনে? হাসিতে কিসের উচ্চারণ! সম্মতি! স্বামীহারা মেয়েমানুষের যৌনক্ষুধা ত স্বামী দেহভস্মের মত বাতাসে উড়ে যায় নি। ইন্দ্রিয়কুল আকুল

হয় না নিশিকালে? দুলালের নারীচরিত্র সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। শোনা এবং পাঠ্যে যেটুকু জ্ঞাত তাতে নারী রহস্যময়ী। চরিত্রের হালহদ্দ নিরূপণ অসম্ভব। কোনো ব্যাখ্যাই ঠিকঠাক থাকে না। শুধু নারীই বা কেন। মানবচরিত্রের এটাই আশ্চর্য। দুলাল নিজেকে কতটা চেনে? পিতিমার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও সরব ছিল না। হঠাৎ ভোরের আলো লাগা কিংবা সন্ধের আঁধার ছোঁয়া পাখপাখালির মত কলরবমুখর হয়ে উঠল।

'তোমার বড় বউয়ের কাছে এসেছি জেঠী। তারপর কী ঠিক করলে?' দুলালের জিজ্ঞাসায় পিতিমার ভ্রূ কোঁচকানো, 'কিসের ঠিক।' দুলাল সমুর মায়ের দিকে তাকায়। কালো রঙ, বয়সের রেখায় জাল বুনুনি মুখে, দাঁত নেই, গালে গর্ত, চোখ কোটরে। দুলাল বলে, 'তোমার বড়বউয়ের ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা করছিলাম। ও একা নয়। গাঁয়ে আরও তিনজন ওর সঙ্গে ট্রেনিং নেবে। পরে সরকার থেকে সেলাই মেসিন পাওয়া যাবে।' সমুর মায়ের চোখে লোভ জ্বলজ্বল করে, 'ওমা এ ত খুব ভাল। ও বড়বউ দুলালকে একটু চা করে দাও।' দুলাল বলে, 'না না। চা করতে হবে না।' সমুর মা, 'তাহলে একটু দুধ খাও।' বলে নিজেই ব্যস্ত হয়। কুঁজো হয়ে রান্নাঘরের দিকে হেঁটে যায়। দুলাল পিতিমাকে দেখে, 'কী, অরাজি হলে পরিষ্কার বল।' সমুর মা হামলে পড়ে, 'অরাজি হবে কেন? পোড়া কপাল, স্বামী খেল, কিছু ত করতে হবে, আমার মত বুড়ি হয় নাই। তুমি বাবা দেখ।' দুলাল বলেছে, 'ট্রেনিং এখানে হবে না। ব্লক অফিসে যেতে হবে। চারজনে একসঙ্গে যাবে। কোনো অসুবিধা নাই। আমি চাঁপা, দুলুর বউ, রাঙাকাকী আর তোমার বউয়ের নাম দিয়েছি। সামনের মাসে ট্রেনিং।' সমুর মা দুধ এনে দেয়। শাদা শাড়ি, রোগাটে চেহারা, এখনও খাটতে পারে। বলে, 'নিমুর জন্যে দেখো। পঞ্চায়েত সবাইকে টাকা দিচ্ছে।' দুলাল দুধের কাপ নেয়। বলে, 'দেখব। হ্যাঁ, দরখাস্তে সই দিতে হবে। ঘর একবার যেও বউদি। সন্ধের দিকে যাবে।' পরিপূর্ণ চোখে তাকিয়েছিল দুলাল। দু'দিন হয়ে যায়। পিতিমা যায় না। দুলাল ওর দেওর নিমেকে বলে। তবু না।

পিতিমার কাছে যাবে দুলাল। ঘরে পায়চারি করছে। অভিসার শব্দটা ঝাঁ করে মাথায় বেজে যায়। কিন্তু ওটা তো নায়িকাদের শব্দ। সে নায়ক। না, নাগর। মেয়েমানুষের কাছে পুরুষকেই যেতে হয়। প্রকৃতির ধর্ম। প্রবৃত্তির তাড়না কী পুরুষের বেশি! তবে যে যৌনসুখে নারীই ভোক্তা বেশি, কোকশাস্ত্র বলে। মহাভারতের কে যেন স্ত্রীযোনি প্রাপ্তিতেই অতিবাহিত করতে চেয়েছিল জীবন! ঘরে ধূপ জ্বলছে, চন্দনের গন্ধ, মুখ হাত ধুয়ে পাজামার উপর পাঞ্জাবি গায়ে শরীরটা ফ্রেশ। দিনের মধ্যে কত ধকল গেল। স্কুল, তারপর স্কুটার ছুটিয়ে ব্লকে, বিকেলে মিটিং ছিল, একটু অবসর, মধুর অবসর। এ সময় বুকের মধ্যে আকুলতা, নরম হাত, নরম বুক ভাবতেই যেন একটা রঙিন গন্ধপূর্ণগুচ্ছকে স্পর্শ করছে, কী মোলায়েম! রক্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে কামনার জিভ যেন জ্বালা মাখিয়ে ফেরে। মনে মনে পিতিমার কাঁধে মুখ রাখায় ঘাম তেলচুলের গন্ধ সে পায়। এমন সময় বামুনজেঠী।

তারাপদ জ্যাঠা পাঁচ বছর মারা গিয়েছে। দেওরদের সঙ্গে ভিন্ন জেঠী। বাপের বাড়িতেই বেশিরভাগ বাস। মাঝে মধ্যে আসে। দু'দেওর। দেওর জা'দের সঙ্গে এলেই কলহ। জমি, পুকুরের অংশ, ভিটে, বাগান চুলচেরা ভাগ নিয়েছে। তবু ধারণা একা বিধবা বলে তাকে

বাঞ্চত করা হচ্ছে। শক্তপোক্ত চেহারা ষাট অতিক্রান্ত সত্ত্বেও. পাটালো মুখ, এক কথা শোনালে সাতকথা শোনাতে পারে, ঘরের ত বটেই, বাইরের কুৎসাতেও খুব আগ্রহী। বাপের ঘরে এখানকার ধন পাচার করছে। তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে। দুলালকে সামাল দিতে হয়।

বিরক্ত দুলাল একেবারে দরজামুখে জেঠীকে বলে, 'কী হল, আজও আবার! না, তোমাদের উঠোনের মাঝে পাঁচিল তুলে না দিলে শান্তি নেই, সেই ইঁদারতলার ব্যাপার ত।'

ইঁদারা নিয়ে প্রায় বিবাদ। তিনজনের এক ইঁদারা। শুচিবায়ুগ্রস্ত বিধবা। জল ছিটিয়ে আঁশ এঁটো, তার পবিত্র বৈধব্যধর্মকে বিনষ্ট করতে চাইছে, জেঠীর বদ্ধমূল ধারণা, দুলাল ত জানেই।

'তুই কী রে! কথা না শুনেই বকবক করিস। এই তুই নেতা! সব সমান। আর ইঁদারার কথা যখন তুললি, তখন বলি, আমার ভাগ নাই। জল নিতে যাব, মাছ ধুচ্ছে, পেঁয়াজের খোসা উড়ে পড়ল জলে। মাগো মা জাতজন্ম থাকবে না।'

দুলালের অসহিষ্ণু ভ্রূতে জিজ্ঞাসা, মাথা নাচার সঙ্গে, 'তুমি কী বলতে এসেছ!'

জেঠী হেসে ফেলে, 'ওই দেখ, কোন কথা থেকে কিসে! তিলডাঙাতে চাষ হবে শুনছি। আমাদের জমি আছে ওখানে। ভাগটা ঠিক করে দিবি আর মহাদেবকে আমি ও জমি চষতে দেব না, ভুচুং মাঝিকে দেব ঠিক করেছি।'

সেই তিলডাঙা। বাগদিপাড়ার পঞ্চায়েত সদস্য বাগু বলেছে, পঞ্চায়েত অফিসেও কথা হয়েছে, রাস্তায় ধরেছিল তারিণীস্যার। তিলডাঙা। তিলডাঙা।

'তিলডাঙাতে চাষ হবে কে বলল?'

'ও মা, কোথা যাব।' জেঠী চোখ কপালে তোলে, 'তুই কী রে! সারা গাঁয়েই ত ওই কথা। তুই শুনিস নাই এখনও পর্যন্ত?'

'কথা। চাষ ত আর হয় না। চাষ হওয়া সহজ নয়।'

'হবে। আজ না হয় কাল। আমি বেধবা মেয়েমানুষ। দেখিস বাবা যেন বঞ্চিত না হই. তোরা থাকতে। আমার দু-দেওরই ত নিজেদের কোলে ঝোল টানছে। জমির ভাগেও নিজের সরেস নিয়েছে। ঘরের ভাগও। তিলডাঙার জমিতে আমাকে ঠকাবে না তা কী ঠিক আছে— আমি অবশ্য সকালে শুনিয়ে দিয়েছি ওদের — উঁহু, ছাড়ব না।'

'তিলডাঙা নিয়ে ঝগড়া করেছ?'

'করব না। হক্কের ধন ছাড়ব কেনে?'

'ঠিক আছে। ঠিক আছে। তুমি এখন যাও। আমি দেখব।'

'নাড়ু পঞ্চাশ টাকা ধার নিয়েছিল, দিছে না।'

'জেঠী আমি তার কী করব?'

'তোকে বলে রাখলাম। যাই, তুর বউকে একবার দেখে যাই।'

দুলাল কপালে হাত রাখে। যন্ত্রণা। মিটিংএ কথা তুলেছিল নারায়ণদা। সেই তিলডাঙা। হল কী সবার একটা আধপাগলার কথা শুনে। জাহান্নামে যাক।

দুলাল ঘরের মধ্যে পায়চারি করে। পিতিমা এল না। চাঁপা, রাঙাকাকীমা সই করেছে। পিতিমার সই চাই। সে যাবে। অবশ্যই। ভাবনামাত্র শরীরের অভ্যন্তরে আবার রক্তধারার বেগ আসে। নিজেকে কেমন যেন দুর্বল মনে হয়। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঘোর নেমে আসে। মদ্যপান সে

করে না। মধ্যে মধ্যে সিগারেট। মাদকতাজনিত ক্রিয়া কী এরকমই। কেমন যেন ভাসমানতা। বন্দনার ঘরে সারাদিন ঢোকা হয় নি, থাক। ওর শরীরের জন্য সেই কবে যেন কাতরতা জাগত। রাত্রিতে খাওয়া দাওয়ার পরই বেগ। প্রবল — প্রবলতম। বন্দনা 'তুমি কী। একটুও ধৈর্য্য নেই' বলে শরীর মেলে ধরত। আঃ শরীর। দুলাল যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে।

বাইরে অন্ধকার। সন্ধে সামান্য গড়িয়েছে মাত্র। তাপময়তার পর পৃথিবীর বাতাসে এখন মৃদু পাখা ঝাপটানো। পিতিমা দাওয়ায়। সামনে হ্যারিকেনের আলো।

'তুমি ঠাকুরপো!'

'কী ব্যাপার সই করতে গেলে না। জেঠী কোথা?'

'চাটুজ্জেদের ঘরে। টিভি দেখতে। সিনেমা আছে না?'

চাটুজ্জেরা টিভি এনেছে। ব্যাটারি চালিত। বড়ই শখদার তরুণ। দুলালও আনবে। টিভির জন্যেই লোক নেই রাস্তায়। দুলাল ভেবে নেয়।

'নিমু?'

'পঞ্চরস দেখতে চন্দপুরে। মাতাল মানুষ। রাতে ফেরে কী ফেরে না।'

'তুমি তাহলে একা। বসতে বলবে না।' দুলাল হ্যারিকেনের আলো আবছায়ায় যুবতী অঙ্গ পাঠ করে। এমন চমৎকার বুননি, চোখে, মুখে, উঁচু বুকে। বাঁশের মোড়া দাওয়ায়। দেখামাত্র বসে পড়ে দুলাল, 'রাঙাকাকীমা, চাঁপার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। পুকুরে চান করছিলাম। ওরা সই করে এসেছে।'

'শুনেও তুমি গেলে না। তুমি আমার সম্পর্কে কী ভাব বল ত।' রোষ থাকে না। বাক্যপাতে স্পষ্ট যেন অভিমান।

দাওয়ায় খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে পিতিমা সামান্য কাঁপে, 'কী আর ভাবব। কিছু না। সই করতে কাল যাব ভেবেছিলাম। মাও তাগাদা দিচ্ছে।'

'আমি কিন্তু তোমার সম্পর্কে ভাবি। তোমার এরকম অবস্থা। তোমাকে আমি ভিন্ন চোখে দেখি। তুমি বুঝতে পার না?'

'পারি। বেশ বুঝতে পারি।'

'তুমি আমার অবস্থা জানো ত। বন্দনা —'

'জানি বিয়ে করেও সুখী নও।' শ্বাস বন্ধ করে পিতিমা বলে, 'আমাকে নজরে ধরেছে।'

'সেটা ঠিক। তুমি যখন বললে, স্পষ্ট করেই বলি। সঙ্কোচের কোনো ব্যাপার নেই। আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।' দুলাল মুখের দিকে তাকায় নি। তার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে তখন রুদ্ধ আবেগমথিত আদিম স্রোত, আলোড়িত রক্তকোষ, অরণ্যে প্রবল ঝড়। বাঁশের মোড়া ছেড়ে উঠে ওই নারীকে লতার মত জড়িয়ে বৃক্ষ হবার তীব্র আকাঙ্খা। রক্ত যাতে শীতল হয়, কামাবেগ মূল কেন্দ্র থেকে উচ্ছ্রিত হয়ে অবসন্ন করে।

'ভালবাসা।' পিতিমার স্বরে বিস্ময়হীনতা, উপরন্তু বিদ্রূপগন্ধী, 'কিন্তু তা যে হবার নয় দুলালবাবু,' যেন সে উঁচু ডালে রঙিন ফুল কিংবা আকাশের চাঁদ।

'কেন? কিসের ভয় তোমার?'

'আমার যে ভালবাসা নাই। কী দেব তোমাকে?'

ভালবাসা নাই? কার নাম ভালবাসা? নারী পুরুষ চক্রে আবর্তন যার সে কী। কেবলই শরীর সুখ? অসম্ভব। ভালবাসা তার মধ্যে কোনো এক উপাদান বৈকী! এবং ওই উপাদান ব্যতিক্রমে মানুষ ত শব। সে বলে, 'পাগলের মত কী বলছ! নাই কী! সমুর সঙ্গে দাহ হয়ে গিয়েছে? তাই হয়! বলতে পার, আমার জন্যে নাই। আমি জোর করব না —।'

'জোর করলেও পাবে না।'

'আমি দিব্যি হাঁটছিলাম। তুমি আমার পথ ভুল করে দিয়েছ। প্রতিমা, আমি তোমাকে কী করে বোঝাই?'

'পথ ভুল করেছ তুমি নিজেই।'

'না। তুমি পথ ভুল করিয়েছ। তবে যা করিয়েছ সঙ্গত। তোমাকে দেখে আমি জীবনের অন্য একটা অর্থ খুঁজে পেয়েছি। কিন্তু তুমি যা করছ তা স্বাভাবিক নয়। জীবন নয়। তুমি ভুল পথে চলেছ।'

'আমি ঠিক ভেবেছি। আমার পথ ভুল নয়। ভুল করিয়েও দিতে পারবে না।'

'ভোগ করাটাই জীবন। ভাসিয়ে দেওয়াটা নয়।'

'জানি। তা ভোগ ত করছি।'

'হ্যাঁ ভোগ করছ যন্ত্রণা। সুখ নয়।'

দুলাল কাঁটা ফোটার জ্বালা হাতের নরম তালুতে নেওয়ার অসহিষ্ণুতায় মাথা নাড়া দেয়, তুলে ফেলতে চায়। বলে, 'কথার মারপ্যাঁচ ভাল লাগে না। এসো আমরা দুজনে বাঁচি।' দু'চোখে ঝরে পড়ে তার প্রেমিকের কাতরতা।

পিতিমা যেন উপভোগ করে। শব্দহীন ওষ্ঠ কাঁপে, চোখের তারা নাচে।

'আমি ঢের ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়েছি।'

'আমার জন্যে তুমি মরে যাচ্ছ। হায় গো, তা আমার জন্যে কী করতে পার? সব কিছু তুমি ছেড়ে দিতে পার? ঘর, বউ, প্রোধানগিরি, নেতা —।'

'না পারি না, তা পারি না। তবে অনেক কিছুই করতে পারি।

'তাহলে ত আমার চলবে না। তুমি আর একটা বিয়ে কর।'

'কী করে বলছ! ঘরে রোগধরা বউ, তারপর —।'

'তারই সেবা কর। যাও, ঘরে যাও।' পিতিমা ঘরে ঢুকে যায়।

দুলালের ধৈর্যের বাঁধ হুড়মুড় করে ভাঙছিল। প্রবল রক্তোচ্ছ্বাস তার শিরা-উপশিরায়। কামনার কেন্দ্রে দাউ দাউ আগুন। টান টান হয়ে উঠছিল অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। সামান্য দূরে শিকার। ক্ষুধার্ত জন্তুর মত সব শক্তি সংযুক্ত হয়ে যাচ্ছিল তার অবয়বে। শ্বাস বন্ধ। বিস্মরণে যাচ্ছিল ঘর, সামাজিক প্রতিষ্ঠা, অতীত এবং ভবিষ্যৎ। কামনাতাড়িত সে ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ততায় ঘরের মধ্যে ঢুকে পিতিমাকে জড়িয়ে ধরে। পিতিমা দুর্বল নয়, সবেগে সে ঝাপটা মারে, 'বেরিয়ে যাও। আমি চেঁচাব।' দ্রুত পায়ে ওদিক থেকে বঁটিটা তুলে বলে, 'এগুলেই কেটে ফেলব।'

বটুক দু-পা ফাঁক, দু-হাত প্রসারিত, লুঙির উপর স্যান্ডো গেঞ্জি বটতলার পাশ ঘেঁষা কুমোরপাড়ার রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ে। সকাল বেলা দুলালের স্কুটার আসছে। দুলাল রাজাকেই

বলা হয় নি। বলতে হবে। দুলালের কথাতেই গাঁয়ে সবাই বসে ওঠে বসে। হুঁ, হুঁ, তুমি বাবা পধান। তুমি বাবা রাজা বট। ক্ষমা করে দাও। তুমাকে বলি নাই।' কী ভুল! কী ভুল! বটুকের বুকের মধ্যে পেটের মধ্যে কথার গজগজানি। সবাই প্রস্তুত। চাষ করবে। কবে যে করবে। ত আকাশের দেবতা নির্দয় যে। বৃষ্টি না হলে মাটি স্নান করে না। স্নান না করলে গা গলে না। বড় শক্ত বুক। ত দুলাল জেনে রাখুক। উঁহু, মানুষ মোটেই ভাল নয়। বটুক জানে। এক চোখো, চোর, সবাইকে দেয় না, গেরস্তর বিরুদ্ধে কিষেন ক্ষ্যাপায়, নীপুকে মারল, স্কুলে পড়ায় না। তা রাজা ত বটে। বটুককে বলতেই হবে।

দুলাল ব্রেক কষে চোয়াল শক্ত করে বলল, 'মাথার পোকা নড়েছে ত!

'পোকা লয় — সাপ। একেবারে খরিশ। চাটুজ্জেদের ঘরে যেটা বেরিন্‌ছিল। ইয়া মোটা। ফণা তুলে ফোঁস।' প্রসারিত বাহুর একটিকে সে ফণা বানিয়ে নাচায়।

'সরে দাঁড়া। কাজ আছে।'

বটুক এবার এগিয়ে যায়। আবদারে গলায় বলে, 'তোমাকে হ্যাঁ বলতে হবে।'

'কী আশ্চর্য! না শুনেই হ্যাঁ বলতে হবে। কী হয়েছে।'

'শুনে লাও, তিলডাঙাতে চাষ হবে।'

'হবে। হল ত — সর। যেতে দে।'

'তুমি সবাইকে বলবে চাষ করার জন্যে। তুমি বললে কেউ না করবে না।'

'ঠিক আছে। সরে যা সামনে থেকে।' বটুককে ইশারা করে দুলাল। অযথা তেল পুড়ছে।

'দুলালরাজা তুমি খুব ভাল। মিটিং ডেকে সবাইকে বল।'

'বলব। বলব।'

দুলাল নন্দী স্কুটার ছুটিয়ে যায়। পাগল আর কাকে বলে। তবে পাগল হলেও বুঝেছে, তাকে ছাড়া কোনো কাজ করা যাবে না গাঁয়ে। কিন্তু আর সবাই। কেউ ত এল না। অবনী কী এই ইস্যুটা ক্যাচ করল? সর্বকর্মে তার একাধিপত্যতায় খিঁচুনি লাগে।

দুলালের স্কুটার ছোটা দেখতে দেখতে বটুক ভাবল, রাজি ত হল, কিন্তু মুখে না কাজে। হ্যাঁ বলেও তার অনেক কাজ করে দেয় নি। হারামজাদা। একচোখা রাজা। মাথা চুলকাল। ওদিক থেকে পদা বাউরি আসছে। মুনিষ খাটে। আহা, ভারি ভাল লোক। অত বড় ছেলেটা ফট্ করে মরে যেতে একেবারে —। ও পদা, দুঃখ করিস না। ভগবান ভারি বদ্। গোবর সার ফেলতে চলেছে। কে? চাটুজ্জেদের বাগাল কেনো। বটুক হাঁটা দিল। সকালে মুড়ি চা। দাদা বলল, মাটি মাখতে। মাখবে বৈকী। একডুং গাঁ ঘুরতে সে বের হয়েছে। এ কম্মটি না করলে হয় না। কত কী ঘটছে। খবরটা নেওয়া দরকার। এই ত তারুর বিটি শ্বশুরঘর যাবে। আহা কী সুন্দর মেয়েটি। কিন্তু তিলডাঙা! তিলডাঙা কন্যে কাল রাতেও এল না। মা জননীকে সে শোনাবে, কতটা কাজ সে এগিয়ে দিয়েছে। তবে কিনা জোছনা ছিল না। তিনি আবার জোছনা ছাড়া ভেসে আসতে পারেন না, এমনটিও হতে পারে। আবু চক্রবর্তী, পুরোহিত মানুষ, ওকে জিজ্ঞাসা করলে হত, কবে খদখদে জোছনা নামবে।

ঘুরতে ঘুরতে তিলডাঙা। ঝিনুক ডোবা ইঁদারার এধারে একটা খেজুর। রোগা ছায়ার মাথার দিকটা সামান্য মোটা। বটুক রোগাটে পরিসরে দিব্যি নিজেকে গুঁজে নেয়। তাতা —

দিনের রোদ যা হোক। সকালে এত তেজ যে কোথায় পায়। তা শীতকালে ত ইনিই নরম সরম। তখন যে কোথায় আগুন থাকে। রাগে গা জ্বলে যায়। সূর্যর দিকে তাকিয়ে যে দুটো কথা শোনাবে, তার জো নেই, চোখ ঝলসে দিচ্ছে। এই রে মাটি মাখতে হবে না। পাতনা হবে। ইস। না, উঠে পড়তেই হয়। কিন্তু কে ওটা! বউ। সমুর বউ পিতিমা।

ঝাঁ করে বটুকের মস্তিষ্কে এসে যায় সমুর বিধবার যৌবনের একমাত্র তুলনা দুলাল নন্দীর দাপট। কেন যে সে ভাবে। দ্রুত পাশাপাশি ফেলে যে মিলজুল প্রত্যক্ষ করে। সমান চেকনাই এবং তেজ। ঝিকির-মিকির এবং দাহিকাশক্তি। দুজনেই গাঁয়ে দাপাচ্ছে। হুঁ, হুঁ বাবা, চোখ এড়িয়ে যাবে বটুকের — এমনটি হবার জো নেই। পুরো গাঁ তার মুখস্ত। সর্বদা চোখ-কান খোলামেলা। বেধবা বউ মানুষটার উপর সকলের লোভ। সকলের মানে পুরুষজনের। কী আশ্চর্য। চণ্ডীটা না হয় বিয়ে করে নি, তরুণকেও বাদ দেওয়া যায়, কিন্তু তুমি আবু চক্রবর্তী, তোমার চোখ চিনি না, চান করে আসছে, গায়ে ভিজে কাপড় গামছা, গিলছিলে। ভূপেন শিয়ালের মত ঘুরঘুর করছ — জানি। দুলালের কাছেও অমন ঘুরঘুরানি অমন জিভ চাটা। পঞ্চায়েত থেকে দাও মিনিকট, ব্যাঙ্ক লোন, হেন-তেন।

পিতিমা হাঁটতে হাঁটতে সামনে এসে পড়েছে। শাদা জমি, কালো চওড়া-পাড়, কাঁধে লাল গামছা। কোমর বরাবর কালো চুলের ঘনত্ব। শ্যামোজ্জ্বল সাতাশ-আটাশের শরীরের চলনে ছন্দ আছে। নারী সৃজনে ঈশ্বরের বড় মহিমা। যৌবন ঐশ্বর্যে তার ধারাল কারিগরি। বৈশাখী ঝড় বাদলা। স্তন শিখরের তীক্ষ্ণতা, কোমরের কলসিগলা শীর্ণতা, নিতম্বের বিস্তৃতিতে নিখুঁত শৈল্পিক টান। মুখের ডৌলে, চোখের তারায়, ঠোঁটে, চিবুকে রূপচ্ছটা জোনাকজ্বলা। পুরুষকে অনায়াস পতঙ্গ করে। পিতিমার শরীর অহংকেরে রাজহংসী। সমুর শোক নজরে পড়বে কী, শরীর আগ বাড়িয়ে নিজেকে প্রদর্শন করাতেই ব্যস্ত। আর এ সম্পর্কে যেন মেয়েমানুষের আপাত ঔদাসীন্য। হাসি, কথাতে বোঝার জো নেই।

'বটুকবাবু যে। কী করছ এখানে বসে!'

বটুকের মাথা নত। মেয়েমানুষ কামনার শিকড়ে টান মারে। মাটি ফেঁড়ে উঠে যেতে চায়। কিন্তু কথার উত্তর দিতে ঘাড় ত সোজা হবেই। চোখও গেঁথে যাবে বুকে। মেয়েমানুষের বুকের আঁচলের সামান্য উন্মোচনে, ব্লাউজ নেই, গলার নিচে ত্বকে কী মসৃণতা, তারপরই ঢেউ, চোখ জ্বালা ধরায়। মেয়েমানুষ বড় সাংঘাতিক জীব। বটুক বাবা ও ধান্দায় যাচ্ছে না। যতই ছলবল কর কাদাতে মাগুর কী সিঙির মত—জানি কাঁটা আছে। তারপর সাপ হতে পারে। ওরে বাবা এক ছোবলেই অক্কা। সমু ত ফট্ ছোবলে। বটুকের মুখে দ্রুত এসব ভাবনার নানান ছায়াপাত। তার সঙ্গে গ্রীষ্মে বটবৃক্ষের ছায়ার মত বাতাস আমোদিত এক আশ্রয়ের সুখও। ভারি সুন্দর কথা বলে পিতিমা। এই ত তাকে বটুকবাবু বলল। উহুঁ, ঠাট্টা নয়। বাবুটা ঠাট্টা নয়। চাউনিতে মায়া থাকে। এই ত সেদিন বলল, 'দাড়ি কামাও নি কেন, কী বিচ্ছিরি লাগছে মুখটা।' তার কথা শোনে। তিলডাঙা কন্যার কথা বড় বড় চোখ করে শুনল। বটুক বলেছে, 'থাক গাঁয়ে। সমু মরেছে। আমি রইছি। দেখব তুমাকে।' তা দেখে বৈকী। একদিনের জন্যে সে বাপের ঘর ত নিয়ে গিয়েছিল গদাধরপুরে। হাট থেকে জিনিশ এনে দেয়। সন্ধেবেলায় তাকে দাঁড় করাল, 'দাঁড়াও বটুকবাবু আমি পুকুরে যাব।' গাঁ বাইরে

িধরীপুকুর, কত কী আছে। বটুক দাঁড়িয়ে থাকল। ঘরে গেলে দুধ দেয় খেতে।

'কী হল। কথার উত্তর নাই।'

'বসে আছি। খই ভাজছি। কী বলব।'

'খই ভাজছ? ওমা যাব কোথা! দাও না দুমুঠো, খাই।' হাত পাতে। শরীর ভেঙে হাসে। তারপর মাথা নাচিয়ে বলে, 'আমি জানি তুমি কেন বসে আছো?'

পলক পড়ে না বটুকের, 'জানো?'

'হুঁ।' ঘাড় বেঁকিয়েই রাখে। টিয়াপাখি যেন। বলে, 'তুমি ভাবছিলে তিলডাঙা কন্যা তোমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে। বোকা, দিনের বেলাতে কী আসে। ও ত যখন-তখন আসে না। সেই রাতে, ধবধবে জ্যোৎস্না ফুটবে, দুধ দুধ — সবাই ঘুমুবে — তখন।'

বটুক অবাক। ঠাট্টা নয়, রোদডোবা পিতিমার গাঢ় স্বর বেরিয়ে আসছে গভীর থেকে।

'ওমা! কী হল! হাঁ করে আছ। এদিকে গাঁয়ে যে কত কাণ্ড।'

'কাণ্ড। কাণ্ড আবার কী হল?

'তুমি জানো না। ভাব ত তুমি সব জানো। হুঁ, হু বাবা সব খবর জানা সোজা!'

'খবর! জানি। জানি। দুগ্গা শ্বশুরঘর যাবে আজি!'

'হল না।'

'রামুদের একটা শাদা বাছুর হয়েছে। এঁড়ে। পিঠে কালো ছোপ আছে।' পিতিমার তবু মাথা নাড়া দেখে সে বলে, 'তাহলে আশার বিয়ের পাকা কথা বলতে আজি পানাগড় চলল নিবারণকাকা। হল নাই? সন্তোষ বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছে? হল নাই? ভাইয়ে ভাইয়ে ভাগ হবে, বদ্যিদের। হল নাই? তাহলে? তাহলে? অবনীর মা মরে গেল? ক্যান্সার। বেজায় ঘা। আহা হা। যাই দেখি গা।'

'ধুৎ। তুমি কিছু জানো না।' পিতিমা কৃত্রিম রাগে মুখ ভরায়, 'সব জেনে বসে আছ, এদিকে আমার কথাই জানো না। জানো, আমি তোমার দুলালরাজাকে কামড়ে দিয়েছি।'

বটুকের অক্ষিতারকা স্ফীত হয়। মুখ হাঁ। কুকুরে কামড়ায়, সাপে কামড়ায়, শেয়ালেও কামড়ায়। আর বাঘ সিংহতে কামড়ে কচমচিয়ে খেয়ে ফেলে। কিন্তু মানুষ কামড়াবে কেন?

'কামড়ে দিয়েছ। ইস্ মানুষের দাঁতেও বিষ থাকে। বিষে মানুষ মরে যায়। যদি দুলালরাজা মরে যায়। ইস্।'

'আমাকে যে কামড়ে দিতে এসেছিল। আমার গা বিষিয়ে যেত না?'

'তা যেত।'

'আমি দাঁত বসাই নাই। বলেছি, এসেছ, কী ঘ্যাঁক করে কামড়ে দেব।'

'কেন?'

পিতিমা চমক খায়। তারপর রঙ্গ করে যেন বুকের ঢেউ তোলে, 'এ মা বটুকবাবু কিছু বোঝে না। কিছু বোঝে না। কী বোকা। কী বোকা!'

বটুক নারীরহস্য বোঝে না, কথাটা তার গায়ে লাগে, তার কথাতে তাকেই কিনা জব্দ, মুখ ভারী। থমথমে গলাতে বলে, 'দুলাল তিলডাঙাতে চাষ করাবে বলেছে।'

'তাতে তোমার কী।'

'বাঃ, তিলডাঙা যে বললে! কাঁদছিল।'

'তুমি তিলডাঙা কন্যে দেখতে পেলে। তার কান্না শুনলে। মানুষের কন্যে দেখতেও পাও না, তার কান্না শুনতেও পাও না।' দীর্ঘশ্বাস পড়ে, 'যে নিজেকে দেখে না, সে অন্যকে দেখবে কেমন করে।'

কী যে বলে পিতিমা! কেন যে এমন করে তাকায়। বটুক বলে, 'দেখি। বুঝি।'

'আমাকে বুঝ। আমাকে দেখ। আমার কান্না শুনতে পাও। আমিও যে তিলডাঙা।'

জলপ্রপাতের মত অজস্র শব্দ আর জল নিয়ে চোখের সামনে শাদা কুয়াশা যেন নেমে এসে পিতিমাকে তিলডাঙা করে দিয়ে গিয়েছে। ঠিক ঠিক। কিন্তু বটুক কী করবে?

'দুলাল আমাকে জ্বালাচ্ছে।'

'তুমি ত কামড়ে দিয়েছ। আর আসবে না।'

'আসবে। আমার শাশুড়ি, তারপর মাতাল দেওর—।' পিতিমা কথা শেষ করে না। যেন স্রোত সহসা তপ্ত বালুতে মিশে যায়, জলছাপ আঁকা থাকে শুধু, 'দেখ দেখি নি বটুকবাবু তোমার কাছে কী সব বলছি। আর ত বলার লোক নাই। সব শকুনি নজর। মাংস হাতড়ায়। জ্যান্ত মরা বাছবিচার নাই!'

বটুক বুক প্রশস্ত করে, 'আমাকে কী করতে হবে — বল।'

'কিছু না।' পিতিমা মাথা নাড়ায়, 'চলি বটুকবাবু। দুলালের কথাটা কাউকে বলো না।'

'তাই বলে। দাঁড়াও, শালা, আবার এলে — আমাকে ডাকবে।'

পিতিমা দাঁড়ায় না। খেজুরের ছায়া ছেড়ে বটুক উঠে পড়ে। বিড়িটা ধরানো দরকার। দুলালকে কামড়ে দিয়েছে পিতিমা। কী সাংঘাতিক। সাহস বটে মেয়ের। বটুকের ভারি আনন্দ হয়। দুলালরাজার চুরি চাপাটির এন্তার খবর সে পায়। রাগও আছে তার। তবে কিনা পিতিমার দোষও কম নয়। কেন সমু মরে? অমন যুবতী কেন বিধবা হবে? অত সুন্দরই-বা হবার কী আছে! অমন কলাগাছের মত পুষ্ট শরীর, চামড়ার চকচকানি, মুখ-চোখ, হাত-পা, বুক-কোমর গড়নপিটনে প্রকৃতই প্রতিমার মত, হাসি কথাতেও কেমন রঙ ছড়াও, পুরুষ বটে, হাত বাড়াতে ত যাবেই। বটুক বাবা যাবে না। যদি কামড়ে দাও।

খানিকটা হাঁটতেই বাঁদিকে বিশেদের খড়ো চাল। রাস্তাটা শুনশান। উঠোনের পেয়ারাগাছ মাথা তুলে আছে পাঁচিলের ওপর। বাইরের দরজা দুপাট খোলা। বটুক ঢুকতেই বিশের বাবা ধজু হাতপাখার ফটরফটর বন্ধ করে বলল, 'বটুক যে।' বটুক আসছি বলে রান্নাঘরে উঁকি দিতেই বিশের বউ ঘোমটা টেনে নেয়। ভাসুর সম্পর্ক কিনা। বিশে বছর ছয়েকের ছোট। চাকরি করে এগ্রিকালচার অফিসে। চাষও নিজের হাতে। দু-পয়সা হয়েছে। এই ত চাটুজ্জেদের আড়াই বিঘে বাইদ কিনল। বিশুর মা বলল, 'কই বটুক কি বলছিলে?'

'কাকী, একটুস আগুন লুব।' চাপা গলায় বলে।

কাকীর সঙ্গে রান্নাঘরে ঢোকে। ওদিকে বউ মানুষ পিছন ফিরে। লজ্জা যে কেনে! বিশুর মা একটা শুখো কাঠি আগুন মুখ করে বাড়াতেই বিড়িটা ধরিয়ে বটুক উবু হয়ে দরজামুখো হুস হুস টানে। কাকার কাছে টানা যাবে না, বড়, সম্মান আছে না। বিড়ি নেশা বটে। নেশামাত্রই খারাপ। কয়েকটা জোরালো টানে বিড়ির সুতো আগুন ছোঁয়।

'কাকা সবাই নামছে। একেবারে পাকাপাকি।'

ধজু ষাটের আগেই বুড়ো। কালো রোগাটে চেহারা, মাথার চুল, গোঁফদাড়িতে শাদার ভাগ বেশি। ঈষৎ কুঁজো কঙ্কাল কাঠামো, টেকো মাথা। পেটের রোগে নাস্তানাবুদ। চোখে মুখে বিরক্তির অবিরত উৎপাদন।

'তাই নাকি? কোথা নামছে?' ধজু পাখা বন্ধ করে না। খাটো ধুতির বাইরে জঙ্ঘা, হাঁটু, পা, কালো বাবলার ডাল। দাপটকে 'দ' করে রেখেছে।

'তিলডাঙাতে চাষ করতে। না নামলে নিজেদের লোকসান। কাকা, আমি দেখতে পেছি তিলডাঙা একদম সবুজ। ফসলে ফসলে ছয়লাপ। ওই ফুলকপি, ওই বাঁধাকপি, ওই দেখ ঢিংলে, ওই দেখ বেগুন। আহা চোখ জুড়িন যায়।' বটুকের চোখে যেন বিদ্যুতের মহুর্মুহু চমকানি, 'তোমাদের ত কাঠাকতক আছে। বিশে চষবে না? কোথা গেল? আপিস? উহুঁ, সাইকেলে পড়ে রইছে।'

'আজ ছুটি বটে। ধনা এসেছিল, কোমরে বেঁধে লেগেছে। কিন্তুক জল?'

'জল হবেক।'

'যা রোদ। দেখ চাষ কী হয়।'

'চাষ আবার না হয়। দেখ কেনে আকাশ কাঁদল বলে মানুষের লেগে। আমি বুঝতে পারছি আকাশের পেট গুড়গুড় করছে কাকা।'

বিশু এল। লুঙি কষে কোমর বাঁধা। গা উদোম। ফরশা রঙ, চওড়া বুকে লোমের বন, পেশীবহুল হাত পা, গাঁট্টাগোট্টা। বলল, 'বটুকদা যে। কার পেট গুরগুর করছে, বাবার? বাবার ওই বটে। কিছু খেলেই। ওষুধ খেছে — তবি।'

চোখ বড় বড় করে বটুক বলল, 'কাকার লয়। আকাশের।'

'তোমাকে বলেছে। তুমি যে কী।'

'বিশ্বাস হল না। জল বাতাস আকাশ মাটি গাছ সবাই কথা বলে। সব্বদা বলে না। সময় সময় বলে। তিলডাঙাও কথা বলেছে।' বটুকের কেমন যেন আবেগ চলে আসে। ঢালু জমি বেয়ে জলের কলকলানির মত সে বলে যায়, 'আকাশ বলে দেয়, বর্ষা আসছে। গাছ বলে বড় পিপাসা গো। মাটি বলে, সার লাগবে। কাকা বলে না, ও কাকা —!'

বিশু বলল, 'বলে। বলে। এই দেখ, তুমি এলে ভাল হল বটুকদা। পুন্‌কা শাক লাগাব খামারের দিকে। এসো ত। দুজনে মাটি খানিকটা কাটি।'

ঝাঁ করে বটুকের মনে পড়ে যায়, দাদা যে মাটি মাখতে বলেছিল। পাতনা গড়া হবে। ইস্ কত বেলা হয়ে গেল। ইস্। ইস্। প্রায় ছুটেই বেরুতে চায়।

বিশু হাতটা চেপে ধরে, 'চললে কোথা?'

'দাদা মাটি মাখতে বলেছিল। ছাড়। ছাড়। রেগে কাঁই হয়ে যাবে।'

'আহা, ঘরে মাটি মাখা আর পুন্‌কা শাক লাগানোর মাটি কাটা ত এক। দুটোই কাজ। ঠিক কি না! ঘরেরও যা, আমারও তাই।'

বটুক বলে, 'তা বটে। চল্, তোর মাটি কেটে দি। দে কোদাল।'

তিন

অবনী দুলাল মুখোমুখি হয় পিচ রাস্তায়। গাঁয়ের রাস্তায় কতবারই এমন ঘটনা। কিন্তু এখানে নির্জনতায় এ ঘটনার স্বাতন্ত্র্যতা আছে। চকচকে পিচ রাস্তা ঘামছে। দুপুর জ্বলছে। বাতাসে সেই জ্বলুনি। খরা দানবের বহুদুর থেকে আগ্নেয় শ্বাসপাতের স্পষ্ট শব্দ। প্রকৃতিতে যা কিনা ঝিমুনি এনে দিয়েছে। লতার মত নেতানো, সজীবতার উপর পাতাল শুকো আস্তরণ। এ পরিমণ্ডল রক্তমাংসের শরীরকেও ভাজা ভাজা করে। দেখা জঙ্গলের রাস্তায়। হীরেখুনি বাঁক নিয়ে উত্তরমুখী। একদা ঝাঁটিশালের ঘনত্বে, পুরনো পলাশ, মহুয়া, ডুমুর, বট, অশ্বত্থের ভিড়ে অভেদ্য সবুজ স্তুপ ছিল, গো-গাড়ি চলা রাস্তা মাঝে, ত ঝাঁটিশাল সব লোপাট। তারপরই সরকারি বনভূমি। দীঘল ইউক্যালিপটাশ, সোনাঝুরি ইত্যাদি ইত্যাদি। ডাগর হওয়া মাত্র ছেদন। বড় অভাবী অঞ্চলের মানুষ তারপর কাঠে রান্নার স্বভাব বংশ পরম্পরায়। জঙ্গল তো সবার বটে, ত কাট গাছ। বিটবাবুর সাইকেলে ঘোরা, গাঁয়ে বকবকানি ধরা পড়লে কারও বাপের সাধ্য নেই ছাড়ায়, চালান দেব আমি — তোয়াক্কা কে করছে।

অবনীই তার সাইকেলের ব্রেক কষেছে, কিংবা দুলাল, আগে পরে যেই হোক। দুলালের স্কুটার। গাঁয়ে বাক্যালাপ নেই। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ। অবনী দু'বার হেরো সুতরাং ক্ষমতার কাছে নতজানু কথায় এবং ভঙ্গিতে, নইলে টিকে থাকা অসম্ভব। দুলাল জানে, ক্ষমতা চিরকালীন নয়। ভোট ব্যবস্থা নামে জটিল একটা ব্যাপার রয়েছে। তার চরিত্র, হালচাল, জনগণেশ মাথার মুকুট কখন খুলবে, কখন পরাবে ঠিকঠিকানা নেই। সে অবনী হয়ে যেতে পারে। অথচ জনগণ প্রত্যাশী, দু-মেরু হোক, শত্রুর সঙ্গে কন্টক সম্পর্কই বিধেয়। মানুষ ব্যতিক্রম সহ্য করতে পারে না।

'কোথা থেকে ফিরছিস অবনী? এই রোদে বের হয়!' সানগ্লাশ চোখ থেকে নামিয়ে নেয়। ঘেমো মুখে হাসি ধরে রাখে।

অবনী বয়সে সামান্য ছোট। পাজামার উপর ঢোলা পাঞ্জাবি, মাথায় উসকোখুসকো চুল। চাটুজ্জেদের ভাগনে। এখানেই মানুষ হয়েছে। মা হারিয়েছে শৈশবে। বাবা আবার বিয়ে করেছে। হাজারিবাগে থাকে। অবনী একবার মাত্র গিয়েছিল। নতুন মায়ের চারটি সন্তান।

অবনীর রাজনীতি কলেজে পড়ার সময়। ওখানে বিনোদ মিত্রের ট্রাপে পড়ে গেল। লিডার। গাঁয়ে ওদের পাটির কোনো সংগঠন নেই। দুলাল বলেছিল, 'চলে আয়। বিনোদ মিত্রের গন্ধ পর্যন্ত এদিকে নেই।' শুনলে ত! বিপ্লব চাই! ত আমরা বিপ্লব করছি না। সর্বহারার জন্য সংগ্রাম। কিন্তু না, বিনোদ মিত্র সর্বস্ব। বরাবরই অবনীটা জেদী। মাতৃস্নেহ না পেলে মানুষ গড়ে ওঠে না ঠিকঠাক। বাবার দ্বিতীয় বিবাহও পুত্রের জীবনকে স্পর্শ করতে পারে।

'তুমি কোথা থেকে?'

'ব্লকে গিয়েছিলাম। ওই গাছটার নিচে দাঁড়াই চল। এই এক গাছ হয়েছে ইউক্যালিপটাশ ছায়া পর্যন্ত দিতে পারে না।'

বলে দুলালের মনে পড়ে যায়, নৃপতি কবিরাজের কথা। নৃপতিদাদু। এখন কবিরাজির সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিও চালায়। এমন চমৎকার ভাস্কর লবণ করত। ছেলেবেলায় হাত পতিত কতবার। নৃপতিদাদু চামচায় করে দিতেন। ঘরে এখনও ওর চীনে মাটির জার, পাথরের থালা বাটি সব রয়েছে, হামানদিস্তে, খল পর্যন্ত। হরিতকী, বহেড়া, আমলকি, শুঁট আরও কত কী জড়িবুটি, ফল, পাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকত। ঘরের উঠোনেও লাগিয়েছিল অনেক ভেষজ উদ্ভিদ। ত কথা ওই ইউক্যালিপটাশ নিয়ে। বলে কিনা, 'গাছ লাগা। আম জাম কাঁঠাল পেয়ারা এসব ফলমূলের গাছ লাগা। সব ত লোপাট করে দিয়েছিস। কী সব বিচ্ছিরি গাছে গাঁকে ছেয়ে ফেললি। কাগজ হবে, পিচবোর্ড হবে, দেশলাইয়ের বাক্স হবে, লাভ বেশি। মোটেই না, আমি প্রমাণ করে দেব— ফলের গাছ ঢের লাভজনক। মানুষকে বাঁচায়, সুস্থ রাখে।' কে প্রমাণ চায়। বৃক্ষরোপণ উৎসব, পঞ্চায়েতে সেলুফনের প্যাকেটে মাটি পুরে চারা বিতরণ, যে নিয়ে যায় তাকে দেখেই নৃপতিদাদু চেঁচায়, 'এই — এই কী গাছ রে।' নাতিটা কিন্তু উঠোনে একটা ইউক্যালিপটাশ লাগিয়ে দিয়েছে। নৃপতিদাদু এখন চোখেও কম দেখে।

অবনী বলল, 'কিছু বলবে?'

'কী আর বলব। তোকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লাম। যতই হোক অপজিশান তুই।'

'অপজিশান আর হতে পারলাম কোথা?'

দুলাল বলল, 'ত ওই টিউশিনি করেই চালাবি। ক'টা টাকা পাস। মামার অবশ্য ছেলেপিলে নেই। সবই তুই পাবি। কিন্তু কিছু করা দরকার।'

'করছি ত।'

'ওই ত ডোমপাড়ায় ব্যাঙকে নিয়ে। বুঝলি এখানে তোরা কিছু করতে পারবি না। কী দরকার। তাছাড়া তোদের পার্টির এ জেলাতে সামান্য কিছু থাকলেও অন্য জায়গায় কোথায়? সিট ত ওই মাত্র —।'

অবনী বলে, 'ছেড়ে দাও ও সব কথা। চলি।'

'আহা, দাঁড়া না। শুনলাম, কাজের জন্যে মুনিষের মিছিল নিয়ে পঞ্চায়েত আসবি। তার প্রস্তুতি পর্ব খুব জোর চালাচ্ছিস —।'

'তুমি কাজ কেন দিচ্ছ না বল ত।'

'কাজ এখন কোথা! না ফ্লাড না ড্রট। ডি আর ডি এ সম্বল। জহওর রোজগার যোজনা ফুড ফর ওয়ার্কাস ত হয়েছে। কেন ডোমপাড়া পায় নি।'

'অত জানি না। সব ঘরে বসে। কাজ দিতে হবে।'

'তুইও মুনিষের মত চেঁচাবি। রাজনীতি ছাড়। আমি জানি, লোক খেপিয়ে কেমন করে ফায়দা তুলতে হয়। লোকের কাছে যা বলবি, আমার কাছে তা কেন? তুই ত এখন মিছিল নিয়ে আসিস নি। ওই সুরে কথা বলছিস, কেন? এখানে এখন তুই আর আমি। পঞ্চায়েতে এখন লেবার খাটানোর মত কাজ নেই। তুই জানিস না? যাক গে, তুই মিছিল নিয়ে আসিস। হাঙ্গামা, মারামারি যেন না হয়। তোর পজিশন ত রাখতে হবে। মিটিং, মিছিল এসব না হলে উত্তেজনা থাকে না। পার্টি ন্যাতা হয়ে যায়। কিন্তু কজনকে পাবি তুই। ডোমপাড়ার পাঁচ-

ছ'জন বৈ নয়।'

'ক্ষমতায় এসে তোমরা অপব্যবহার করছ।'

'সে তো ভক্তিদারাও বলে।'

'ওদের কথা বলো না। নামেই ওরা বিরোধী। তোমাদের পাটির লেজুড়।'

'অমন কথা বলিস না। ওরা আমাদের সম্পূর্ণ বিপরীত।'

'হ্যাঁ সেটা মতবাদে। কিন্তু কাজ গোছানতে নয়।'

'যাক্ গে, ওই ক্ষমতার অপব্যবহার বললি না, ওটা যে কোন শক্তিরই ধর্ম, তোরা এলেও এমনটিই ঘটবে।' দুলাল বলে, 'তোর জন্যে করি। তোর সুপারিশ আমি রাখি। এক গাঁয়ের ছেলে আমরা। একসঙ্গে পড়েছি, খেলেছি, এই ত শিপ্রার সঙ্গে দেখা হল। তোর কথা বললাম।'

'আমি চলি। রোদ লাগছে।'

'শিপ্রার নাম শুনে রেগে গেলি। মেয়েটা বড় ভাল রে।'

অবনী রাগ করেনি। রোদ লাগছে। সে শিপ্রাকে ভালবাসে। ভালবাসার বয়স সাত আট বছর হয়ে গেল। সে যেমন এখানকার ভাগনে, তেমনি ভাগনি ওই শিপ্রা। তবে বাবা মায়ের কাছে পুরন্দরপুরে থাকে। দাদুদিদার কাছে প্রায়ই আসা-যাওয়া থেকেই ভালবাসার নির্মাণ।

শিপ্রার রোগাটে গড়ন, উজ্জ্বল একজোড়া চোখ, একমাথা চুল, পাতলা ঠোঁট, শরীর ভঙ্গিতে ছন্দের সূক্ষ্ম টান, চমৎকার গানের গলা, আবৃত্তিও সুরেলা পরিমণ্ডল গড়ে, সে কবে যেন সেই মুগ্ধতার জগতে গিয়ে দাঁড়ায়। শিপ্রার মনোরম উদ্যানে তার জন্যে স্বাগতম্ ছিল। রজনীগন্ধা কী জুঁই কী গোলাপের গন্ধে, সবুজের ঘনিষ্ঠ বুনুনিতে সৌন্দর্যের চুমকি বসানো ঘাসে ছাওযা জমিতে, 'এত চমৎকার তোমার গলা রাতে তন্দ্রায় মনে হয়, যেন কানের পাশে তুমি গাইছ, এমন করে আমার ভেতরে ঢুকে গিয়েছে,' শুনে ওষ্ঠে হাসি রঙিন পাখি ফুড়ুৎ করে ওড়ার মত শিপ্রা বলে বসেছিল, 'যাঃ।' তারপর সারা মুখে রামধনু যুবতীর।

প্রেম সকলই তুচ্ছ করে দেয়। তারা লুকিয়ে গাঁ-বাইরে হীড়ের ওধারে আমের বাগানে কতবার কত মুহূর্ত কাটিয়েছে সকাল বিকেল সন্ধেকে মুড়ে দিয়েছে ভালবাসার স্নিগ্ধতায় দিনের পর দিন। পুরন্দরপুর থেকে শিপ্রা সিউড়ী এসেছে। সে এখান থেকে গিয়েছে। তারপর কলেজ কামাই, সিনেমা, রেস্টুরেন্ট। অবধারিত বিয়ে এমন জোরও ছিল। জাতে জাতে মিল। ভাল ছেলে বলে তার নাম আছে। রাজনীতি করে অবশ্য। ত শিপ্রার তাতে আপত্তি বলতে ঢের পরে, 'যা পার্টি করছ, এদের কোনো ভবিষ্যৎ নেই' বলা পর্যন্তই শেষ। শিপ্রা ইতিহাসে এম এ করল। গাঁয়ে সকলেই তার প্রেমের কথা জানে। আপত্তি মামার ঘরে নেই। শিপ্রাদের বাড়িতেও নেই। সে ত যায় মাঝে মধ্যে। শিপ্রারা তিন ভাই বোন। ওর মা বাবা প্রায় জামাই আদরই করে থাকেন। ত সিঁথিতে সিঁদুরে, বিয়ে পর্ব না ঘটলেও প্রেমিকা শিপ্রার দীর্ঘদিনে সম্পর্ক স্ত্রীর মতই। তাকে বকাঝকা করে। সপ্তাহে একবার না গেলে অভিমান। বাবা ছোটবোনের তার জন্যে বিয়ে দিতে পারছে না বলে রাগ। ডেপুটেশন ভেকেন্সিতে একটা গার্লস স্কুলে এখন শিপ্রা। বলে, 'কবে চাকরি পাবে তার জন্যে বুড়ি হব নাকি? না পাও ত কী। সিউড়ীতে ঘরভাড়া করে দিব্যি দুজনে চালাব। টিউশনি করে চলে যাবে। না হয়, গাঁয়েই কিছু কর।' অবনী তার জন্যে শিপ্রার কষ্ট ভেবে ব্যথিত হয়। শিপ্রা ত আর কাউকে বিয়ে করবে না।

তাকে ঘিরেই সংসার।

সময় সে বাসনাকে গাঢ় করেছে। অথচ তার তীব্র টানাপোড়েন। তাদের পার্টির জমি খুব সামান্য, অনুর্বর, বিনোদদা, যাই বলুন, কথনোই ক্ষমতায় আসবে না, সে যে কী করে। শিপ্রার সঙ্গে সম্পর্কের ছোঁয়াছুঁয়ি শরীরী ঘনিষ্ঠতার পরিধি, চুম্বনে কিংবা প্রবল পেষণে সীমাবদ্ধ, রক্তের প্রচণ্ড বেগ উন্মাদই করে শুধু। কষ্ট, অবিরত কষ্ট। অবিরত কষ্ট বুকের পাঁজরায় কাঠঠোকরা হয়ে কেবলই শক্ত চঞ্চুতে ঠুকে যায়, পায়ের নখ বসিয়ে রাখে বুকে। মনে হয়, সে ঝাঁপিয়ে পড়ুক। শিপ্রা ত বুকের আঁচল ফেলে, দু'হাত প্রসারিত, তাকে নরম উষ্ণ আশ্রয়বন্দী করার জন্য প্রতীক্ষিত, কিন্তু হয় না। করা যায় না। পৌরুষত্বে কোথায় বাজে। শিপ্রাকে সুখী স্ত্রী বানানোর শর্ত, সিঁদুরদানের সঙ্গে আঁকা হয়ে যাবে। বড় কঠিন শর্ত হে সচেতন যুবক।

'কী হল! তুই থম্ মেরে গেলি অবনী! ভাল কথা তিলডাঙার ব্যাপারটা বল্ ত। ধনা তোর কাছে গিয়েছিল? জগা খগা? কেউ?'

অবনী বলে, 'না।' ভ্রু কোঁচকায়, 'তবে তিলডাঙাতে চাষ হলে ভাল হত। মামাও বলছিল। রবিশস্য, নানা আনাজপত্র হত। গাঁয়ে ত আনাজপত্র আসছে বাইরের।'

'ঠিক কথা। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। জলাভাব প্রথম। দেখছিস ত কম ডাঙা পড়ে নেই। এ কী হাওড়া, হুগলী, বর্ধমানের কী মেদনিপুরের জমি পেয়েছিস? এটা হল বীরভূমের পশ্চিম। পাথর। পাথর। মাটি ত নয় ইট। বিধান রায় শিশল ফার্ম করে এ সব ডাঙায় শিশলের চাষ হবে পরিকল্পনা নিয়েছিলেন। কোঙার চাষ রে। ওর ফাইবারে দড়ি, পাপোশ কত কী হয়। দারুণ শক্ত। পচে না। রয়েছে ত। শিশলও বাঁধা এলাকায় হচ্ছে। পরিকল্পনার আংশিক কাজ হয়েছে। নো ডেভালপমেন্ট। ডাঙায় কোন চাষই হবে না। প্রায় ডাঙাই তো ফরেস্ট নিয়ে নিল। যাক্ গে, তিলডাঙায় যাতে চাষ হয় তার উদ্যোগ কী তুই নিবি?

'আমি। আমি কী উদ্যোগ নেব। বটুক আমাকে বলেছে—।'

' পাগলাই ত সবাইকে উসকে বেড়াচ্ছে। ঝঞ্ঝাটের জমি। একক মালিকানা নেই। তোর কাছে এলে মদত দিবি না।'

'কেউ আসবে না।'

'বিশ্বাস কী। ধনা ত—।' দুলাল যেন মাছি সরাল চোখের সামনে থেকে, এমন হাতের পাতা নাড়া দিয়ে বল্ল, 'ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে একটা কিছু কর না। পোলট্রি করবি? পঁচিশ হাজার পেয়ে যাবি। তবে আমাদের স্কুলে ভেকেন্সি হচ্ছে। তোর ত বি এড নেই। অনার্সও না। ত কী। আমি আছি।'

অবনী আশাভরা চোখে তাকাল।

'শিপ্রা বলছিল, দুলালদা দেখ না ওকে। আমি বললাম, তুমি বলবে কী। অবনী আমার পর নয়। যাকগে, কিছু কর। সংসার না করলে মানুষ সম্পূর্ণ হয় না। শিপ্রাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে। আই ফিল ইট। না, তোর সঙ্গে আবার বেশিক্ষণ কথা বললে কেউ দেখলে বলবে সাপে নেউলে চুমু খাওয়াখায়ি হচ্ছে।' দুলাল বলে শব্দ করে হাসে। স্বর দ্রুত বদলে বলে, 'সন্ধের পর ত আসতে পারিস আমার কাছে।'

অবনী নিরুত্তর।

'কারে আমার উপর রাগ তোর যায় নি।'

'বাঃ, রাগ কেন?'

'রাইট। রাগ কিসের? ফাইটিঙের ময়দানে আমার প্রতিপক্ষ। কিন্তু অন্যসময় উই আর ফ্রেন্ড। এটাই বেঁচে থাকার শর্ত। আসবি — এনি টাইম। তোর জন্যে কিছু করতে পারলে সত্যি বলছি, এখানে পলেটিকস নেই, আমি খুশি হব। আমিও ত মানুষ রে।'

অবনী সাইকেলে উঠল। শিপ্রা দুলালকেও বলেছে তার জন্যে, রাগ হচ্ছিল না তার।

এক ফসলী ভুঁইয়ে চাষ মরসুমের পদসঞ্চারী শেষ বৈশাখের ঝড়জল হয়। সামান্য স্নান। মেঘকে উড়িয়ে নিয়ে যায় বেগবান ধুলোবালি খড়পাত ওড়ানো ঝড়। কোথাও জল জমে নি। ভিজেছে শুধুমাত্র। খড়পাত চারিদিকে ছড়ানো, কীর্তি খড়ো চালে, ভাঙা গাছের ডালে, ছড়ানো পাতায়। প্রকৃতির মত্ত হাতির মত মাথা নাড়া, উন্মত্ত আন্দোলিত হওয়া এক অদ্ভুত শান্ততায় ভরে রেখেছে রক্তরাঙা বিকেলকে। বাতাসে তাপ নেই। ঠান্ডা পরিমন্ডল। কতদিন পরে যেন জ্বরতপ্ত মাটি শীতল হল। দুলাল ফিরছিল স্কুটার ছুটিয়ে। গাঁ ঢোকার মুখে তার চোখে পড়ে তিলডাঙায় পাশাপাশি দাঁড়ানো একজোড়া পুরুষ-রমণী। পিতিমা এবং বটুক। পিতিমা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসিতে ভেঙে পড়ছে। বাতাস আন্দোলিত ধানের গুচ্ছ যেন। দূরবর্তী রমণী শাদা শাড়ি এলোচুলে অমন বিভঙ্গে অপরূপা। মস্তিষ্কে আঘাতের সঙ্গে উপলব্ধ হয়, চিত্র গভীর অন্তরঙ্গতার। নারী যেন পক্ষিণী, পুরুষকে ডানায় বসিয়ে মত্ত আকাশে উড্ডীন। স্কুটার থেমে গিয়েছে। রক্ত ছলকায়। প্রত্যাখানের জ্বালা ত কামক্ষুধাকে কয়েক গুণ বৃদ্ধি করেছে। হাত বাড়াতে, নাগালের বাইরে যেন আরও দীর্ঘ হওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে উত্তেজিত করেছে। বিস্ময়াহত দুলালের দু'চোখে জিজ্ঞাসার তীক্ষ্ণ ফোঁড়। কাঁথা বুনুনি মস্তিষ্কে। আধপাগলা মানুষটাই কী সেই পুরুষ। প্রেমের রীতি বোঝা দুষ্কর। বটুক কিনা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। চারপাশের এমন মোলায়েম বাতাসও মুখে ঘামের পুঞ্জ নির্মাণ করে। গ্রীষ্ম শিরাপথে প্রবাহিত হয় তার।

ত এমনও হতে পারে, বটুক পাগলা তিলডাঙায় দাঁড়িয়ে বর্ণনা করছে তার তিলডাঙা কন্যা দর্শনের, এখানে চাষ হবে, এমন স্বপ্নের বীজ বুনে যাচ্ছে, তাই পিতিমার অবিশ্বাসী হাসি। ব্যাপারটাকে গুরুত্ব সে কেন দিচ্ছে। ওদের পাশে সাদা গরু চরছে একটা। গোঁসাইদহের পাড় দিয়ে হেঁটে আসছে কে যেন। দুলাল কী ডাকবে বটুককে, পিতিমা তার দিকে ঘাড় ফেরাবে, সে ঘটনার পর মখোমুখি হয় নি, একবার হওয়া দরকার। মেয়েমানুষের মন এক জায়গায় স্থির হয়ে থাকবে, তার কী নিশ্চয়তা আছে। পরিবর্তিত হতেই পারে। তার আমন্ত্রণকে পিতিমা একবার ফেরালেও বারবার ফেরাবে এমন নাও হতে পারে।

সাইকেলে বিপিন আসছিল। কাপড়ের ব্যবসা করে। কেরিয়ারে গাঁটরি। এ-গাঁ সে-গাঁ ফেরি করে বেড়ায় দিনভর। ঘন দাড়ি গোঁফের মুখ, মাথার চুলও রাখে, কালো ঠোঁট পান খেয়ে লাল টুকটুকে, চন্দপুরে বাড়ি। ব্রেক কষে এক পা নামিয়ে বলল, 'কী হল। মাঝরাস্তায় দাঁড়িয়ে কী দেখছেন পেধানবাবু?'

'ও দুটো কে বল ত?'

'বটুক মনে হয়। আর সমুর বেধবা। কী করছে দু'জনাতে।'

'পাগলার খেয়াল। তারপর বিক্রিবাটা কেমন?'

'কোথা পাবেন? সব ধারে কারবার। জল ইদিকে তাহলে হল।' যেন বৃষ্টি হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এমন ভাব।

'ঝড়েই ত উড়িয়ে নিয়ে গেল মেঘ। কালবৈশাখীর যা দস্তুর। তবু লক্ষণটা ভাল। আসছ কোথা থেকে?'

'গণেশপুর।' বিপিন প্যাডেল মারে।

দুলাল আর দাঁড়ায় না। স্কুটার ছোটায় গাঁয়ের দিকে।

বটুক-পিতিমা দৃশ্য সম্পর্কিত ধারণাটা চকিত দুলালকে যে আহত করে, সংলাপ শ্রুতিতে এলে সে স্তম্ভিত হত। এবং সত্যের নির্মমতায় রক্তাক্ত হত। চিত্রটি ঘনিষ্ঠতারই। যেন এক লতা সূর্যপিপাসায় জড়াতে চায় এক বৃক্ষকে। তার রুক্ষতা, কাঁটাকে ভয় না করে নরম পেলব অঙ্গের আবেষ্টনীতে ভরাতে চায়। ঘনিষ্ঠতা করার আগ্রহ পিতিমারই তরফে। গাঁ বাইরে পুকুরে যাবার পথে তিলডাঙায় একা দাঁড়িয়ে থাকা বটুককে দেখে সে পথ ছেড়ে এই দিকে হেঁটেছে। তারপর সকৌতুকে মেঘ ঝড়ের পর রক্তিম সূর্যের আলোকে স্নাত দিনের শেষ টুকরোটির মতই ঝলসে উঠে বলেছে, 'কী খুঁজছ? তিলডাঙা কন্যা! এই ত আমি।'

'তুমি।'

'আমি নই?' অমনি হাসি। কলকলানি, ছলছলানি।

বটুকের মুখে অবশ্য হর্ষ আসে না। কাঁচের চুড়ির বাজনা, আলো ঝলকানি, রমণীর এলোচুল কিংবা দেহলতা থেকে উঠে আসা গন্ধ, বুকের রক্তে ছলাৎ ছলাৎ বাজে। উপভোগ্য নয়, ভয়ের রোমাঞ্চতা। চোখ তুলতে সাহস হয় না। সময় সময় কেন যে পিতিমা এমন হয়ে যায়। অথচ না তাকিয়েও পিতিমার দুঃখে বুক ভরে। পিতিমার হাসিকে মনে হয়, কান্নার মুখোশ। কী সাংঘাতিক। বটুক চোখ তুলেই মুখ নামিয়ে নেয়।

পিতিমা বলে, 'কী হল! তুমি আমাকে খুব ভয় কর কেনে গো। থাক — উত্তর দিতে হবে না। পারবেও না। তা তিলডাঙায় মাটির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছ। কী বলছে কন্যে — জল পেয়েছি — চষ এই ত।'

অবাকের পর অবাক। একটা কঠিন গিঁট খুলে দেয় কিংবা ম্যাজিকের মত চোখের সামনে টুপি উলটে রঙিন রুমাল, তারপরই ওর ভেতর থেকে ফড়র ফড়র শাদা পায়রা তুলে আনে, 'তুমি কেমন করে জানলে?'

'কী ভাব — তুমি একাই জানো! আমি জানি না?'

'জানো। জানো। ঠিক ধরেছ। আমি ভাবছিলাম —।'

'তা জমি ত তোমার নয়।'

'না হোক। আমাকে দর্শন দিয়ে ত বলেছে। আর কাউকে বলে নাই।' বালকের মত নির্মল অহঙ্কার ফোটে বটুকের মুখে।

পিতিমা অকস্মাৎ ভিন্ন স্বর আনে। যেন বুকের গভীর থেকে গাঢ়, মৃদু কম্পমান অমানুষী স্বরপাত, 'বটকবাবু, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে। আমাদের গোয়ালে সেই ফাগুন মাসে

আগুন লেগেছিল। তুমি—।'

'ইস — কী আগুন। আমি গরু বাইরে আনতে ঢুকলাম। চালটা পড়ল জ্বলতে জ্বলতে। তবে আমি পুড়ি নাই। আহা, কী ক্ষতি তোমাদের।'

'পুড়েছিলে, পায়ের কাছে, মনে থাকে না তোমার। ধরম পুজোতে আমার মানত ছিল একশ পদ্ম দুব। কোথা পাই। কোথা পাই। তুমি এনে দিয়েছিলে।'

'এবার ধরমপুজো জষ্টিমাসের মাঝামাঝি।'

'হ্যাঁ। তুমি জানো তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে ঠিক হয়েছিল।'

'ধুস্। তা তুমি পুরনো কথা এত টানছ কেনে?'

'কে বলেছে পুরনো। তুমি আমি দুজনে রয়েছি। পুরনো হবে কেন? তোমার মনে আছে সেই চন্দপুরে যাত্রা দেখতে যাওয়া। তোমার দাদাও ছিল।'

'দাদা?'

'আমার সোয়ামী।'

'সমু? দাদা হবে কেনে? কত বয়েস বটে। একসঙ্গে হা-ডু-ডু খেলতম। আহা মরে গেল। তোমার কষ্ট হল।' বটুকের বুক যেন নিঙড়ে যায়, 'তোমার কত কষ্ট।'

'আমার ঘুম আসে না রাতে। তোমার কথা ভাবি। আগে ত ভাবতাম না। কেন ভাবি বল ত। এত মানুষ থাকতে তোমাকেই।' পিতিমা নিজের ঝোঁকে, যেন বহুদূর থেকে কথা, কিংবা নিজের সঙ্গে নিজের, বলে যায়, 'বটুকবাবু, তুমি তিলডাঙা কন্যে দেখতে পাও, কত কী দেখতে পাও, আমি যে এখন তোমাকে ছাড়া আর কিছু দেখতে পাই না।'

বটুক, এ মা কী বোকা, কী বোকা, কিছু বোঝে না, মাথা ঝাঁকিয়ে বলার প্রবল তাড়নায় যেন এক প্রশস্ত শিলাস্তূপের আচমকা ধাক্কায় আটকে গিয়ে ওষ্ঠ কাঁপায়, হৃৎপিণ্ডে অশ্বক্ষুর ধ্বনি, সে বলে ওঠে, 'তুমি এ কী কথা বলছ।'

সহসা যেন পিতিমা সংবিৎ ফিরে পায়। কিংবা তার বোধ অভীষ্টের শিখরে পৌঁছেছে টের পায়, বিজয়িনীর উল্লাসে বলে, 'ওমা, তাই ত গো বটুকবাবু, আমি এ কী বলছি, তুমি কী রকম হয়ে যেছ।' আঁচল চাপা দিয়ে মুখে বন্যার মত হাসতে থাকে।

ধনঞ্জয় তিলডাঙায় যাদের জমি আছে, তাদের নামের তালিকা বানিয়েছে। বারটি ...ম। এরা সকলেই গ্রামের বর্তমান বাসিন্দা। বাকি মালিকও রয়েছে—চন্দপুরের মোড়লরা, গণেশপুরের সৌ'রা, সিউড়ীর চাটুজ্জেবাবুরা। গোঁসাইদহ আসানসোলের দত্তবাবুদের। ত চাষ হলে কেউ বসে থাকবে না। ঠিক হাজির হবে। পরিবার ভেঙে জমির অংশ টুকরো টুকরো। ফলে কার কত পরিমাণ কে জানে। অধিকার নিয়ে কী ধরণের যুদ্ধ হবে, তাই-বা কে জানে। আগে ত চাষের প্রস্তুতি হোক, ঝঞ্চাট হবে বলে এড়িয়ে যেতে হবে, এটা ত কথা নয়। ঝঞ্চাট কিসেই-বা নেই। জন্ম থেকে মৃত্যু বরাবর ব্যক্তিমানুষে, যে কোনো উৎসবে, গাঁয়ের যে কোনো সামাজিক কর্মে—তবু সবই হচ্ছে, হয় এবং হবেও। আপাতত গাঁয়ে বসবাসকারী পরিবারগুলিকে উদ্যোগ নিতে হবে। ধনা সকলের সঙ্গে কথা বলেছে। চাষে রাজি সকলেই। জমি মা। তার চিৎপাত পড়ে থাকা ত কর্মের কথা নয়। বটুক বলেছে বটে, ত সেটা মনের

কথা সবার। খগা, বিশে তার মতই উৎসাহী। এ সময় মূল ফসল ধানের। বর্ষার গন্ধের সঙ্গে তার শুরু। আগে ধানচাষ তোলা। কাতকে এবং বড়ানে। কার্তিকে যে ধান পাকবে, পাঁড়ু ধান, তা কাতকে। বড়ানে ধান সেই অগ্রহায়ণে। রঘুশাল, কলমকাঠি ইত্যাদি। এক ঝটকা বৃষ্টিতেই গাঁ জুড়ে ধানীমাঠের দিকে টান ছড়িয়ে পড়েছে। তো চাষ উঠলে মাতা যাবে। তিলডাঙা নিয়ে। মাটি তো নরম সরম ভাদ্দর বরাবর থাকে।

ধনা বেনেপুকুরের ধারে বীজতলার মাঠ অর্থাৎ বীজধান ফেলার মাঠকে এক চাষ দিয়ে রাখবে। এই বৃষ্টি সব জমিকে লাঙল মারার যোগ্য করে নি। কিন্তু বেনেপুকুরের জমিটা কাল সন্ধেতেই সে দেখে এসেছে। লাঙল নেবে মাটি। বলদ জোড়ার কাঁধে জোয়াল, লাঙল ঝুলিয়ে সে হাঁটা দিয়েছে। সকালের রোদ তকতকে। কিছুক্ষণেই শুষে নেবে কালকের রস। তবে কালবৈশাখী দেখা দিয়েছে, দু-একদিনের মধ্যে সে বৃষ্টিকেও কিছুটা আনবে।

খগা রাস্তায় ধরল, 'লাঙল তাহলে লাগবে আফোড়েতে।'

'হ্যাঁ। দেখি গা। না হলে ঘুরে আসব।'

'তিলডাঙা নিয়ে আমরা লাফাছি। কিন্তুক আসল জিনিসটই ভাবি নাই। মদনা বলছিল, তা চষবে ত সবাই, এদিকে মাটি ত দেখছ। মাটি নিয়ে খালখন্দ করে দিয়েছে। আল একদম নাই। অবশ্যি জমি যে যার চিনে। কিন্তু আল টানতে গেলে হুজ্জোত হবে। আমিন ডেকে মাপজোক করাতে হবে। অতটা জমি। শরৎ আমিন না হয় করে দেবে, মিনিপয়সাতে ত করবে নাই। তাহালে চাঁদা করতে হয়।'

'চাঁদাই তোলা হবে।'

'সব মালিককে পেছিস কোথায় তুই।'

'যারা রইছে, তারা দেবে।'

'তাহলেই হয়েছে। ব্যাপারটা যে মাথায় করবে তার ঘাড় ভাঙা যাবে। গাঁয়ের মানুষ চিনতে আমার বাকি নাই। তারপর গোঁসাইদহ না খুঁড়লে আল টেনেই-বা লাভ কী! জল ত আগে—। আমি ওসব ঝামেলাতে নাই।'

'বলিস কী রে।'

'বরঞ্চ চল, দুলালের কাছে যাই।'

'আমার যেতে আপত্তি নাই। সবাই মিলে চল তাহালে।'

'সবাইকে তুই পাবি হেথা।'

'বাঃ, তুই আমি কী করব।'

'করতে হবে দু-একজনকে। তারপর সবাই আসবে। যা দেরি হয়ে যেছে। বিকেলে কথা হবে। ভাল কথা, হ্যাঁ, রঘুশালের বীজ হবে, বিশ সেরের মত।'

'তোর নাই?'

'মিশেল হয়ে গেইছে অন্য ধান।'

'আছে। যাবি।'

হেট হেট করে বলদজোড়া ডাকিয়ে নিয়ে যায় ধনা।

সমস্যা যে আরও, তিলডাঙা কন্যাকে ফলবতী করার অন্তরায় ঢের, মাটি জল বীজ সার

সব নয়, এ সবের ছাড়াও শ্রম লাগে এবং তা মানুষকে করতে হয়; যে মানুষের মধ্যে আত্মস্বার্থ, হিংসা দ্বেষ ইত্যাদির অসংখ্য বীজাণুর ক্ষয়িত করার অব্যাহত ধারা বহমান, এ সব ধনঞ্জয়ের মস্তিষ্কে ধাক্কায় ক্রমশ তার জেদকে, তিলডাঙা চষবেই এমন সম্ভাবনাকে দূরবর্তী করে দেয়।

তবু সমগ্র ব্যাপারটা নিয়ে ভাবা এবং নানাজনকে বলায় সে ব্যস্ত থাকে। তারিণীস্যার ধনাকে ভ্রুতে খিঁচরেখা নিয়ে বলে ওঠেন, 'তোর কী খেয়েদেয়ে কাজ নাই ধনা, পড়ে আছে থাক। হ্যাঁ, আমার চোদ্দ কাঠা আছে। তাতে কী। হীড়ের ধারে চার বিঘে ডাঙা পড়ে। থাকুক। বুঝলি শুনতে ভাল। প্রথমে আমিও ভেবেছিলাম, বটুক ভাল প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু ভাল কাজ হবার দিন চলে গিয়েছে। মানুষের মধ্যে এখন খালি বিষ। জমি না যন্ত্রণা। তুই নিজে চষিস। তোর প্রবলেম নেই। কিন্তু বামুন-বদ্যি পাড়ায়! গেরস্ত কিষান বর্গাদার, পরস্পরের ঘোরতর শত্রু। স্রেফ ছেঁড়াছেঁড়ি। আমি বাবা ওসবে নাই। নিজের হাল গরু নাই। সেই ত পরকে দিয়ে চাষ করাতে হবে। সেই মালিক হয়ে বসবে। যেমন আছে পড়ে থাক।'

সেনেদের প্রফুল্ল পানাগড়ে চাকরি করে ব্লক অফিসে, এখানেই সংসার, সাত বিঘে জমি ভাগে দিয়েছে, বর্গাদারের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত, তিলডাঙা মাপজোক হবে শুনে হাত নেড়ে বলল, 'জমির পিছনে এক পয়সা ইনভেস্ট করব না। চারটে লোকের সংসারে আমাকে চাল কিনতে হয়। আবার জমি! টাকা ফিক্সড করলে বেশি ইন্টারেস্ট।'

এমন কথা এবং গ্রামীণ চাষচিত্রও ধনার দৃশ্যে এবং অনুভবে। নিজের জমি নিজেই করে, সমস্যা নেই। ভাগের জমিতে কিংবা কিষান রেখে হাল-গরু চাষ খরচা দিয়ে মালিকের হাত বরাবর ফসল প্রায় কিছুই উঠে আসে না। কৃষিমজুর দিয়ে এখানে মালিক চাষ করতে পারে না, তেমন নিয়ম নেই। চাষ যে করবে তাকে ভাগ দিতেই হবে। বর্গাদার ধান দেয় না ঠিকমত। সময়ের ফেরে মালিক শোষিত। শোষক বর্গাদার। তবে বলা চলবে না। মালিকের বিনিয়োগে উৎপাদন বাড়ে, কিন্তু সম্পর্কের রক্তপাতজনিত দুর্ঘটনায় কোনো মালিক উপুড় হস্ত হয় না। কী যে চলছে। মা জননী মাটিকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া। তারপর আছে ভাগে না পাওয়া একটা মজুরশ্রেণী। কৃষিমজুর। তাদের দুরবস্থার অবধি নেই।

প্রহ্লাদ রায় বলল, 'পড়ে আছে থাক। দিন পালটালে দেখা যাবে। বাপ-ঠাকুরদার সম্পত্তি। পরের ভোগে লাগে কেন? নেতারা শেখাচ্ছে গেরস্তকে লবডঙ্কা দেখা। স্রেফ ভোটের ফয়দা লুটতে বলছে বর্গাদারই মালিক।'

ধনা কী যে করে। প্রাথমিক সায় ত সকলেরই ছিল। কিন্তু উদ্যোগ মাত্র ছিটকে যাচ্ছে সব। চাষ ব্যবস্থায় বেশ কয়েকটি শ্রেণীর নির্মাণ ঘটেছে। যে যার শ্রেণী রক্ষায় ব্যস্ত। পঞ্চায়েত রাজনীতির ফল। ভোট সংগ্রহের জন্য এ ধরণের ক্রিয়া-পরিকল্পনা। ত তাতে ত দেশেরই ক্ষতি। এ সব ভাবনায় বড় কাতর হয়ে পড়ে ধনা। দিব্যি ছুটছিল আচমকা পথের উপর একটা দেওয়াল খাড়া হয়ে প্রতিহত করল যেন গতি। একটা নয় অনেকগুলো দেওয়াল। খগা তাকে সাহস দিয়েছিল। বিশুও কোমর বেঁধেছিল। আর তিনজনেই ত নিজেরা চাষ করে। পালদের ভুবন রয়েছে, ওদিকে রাম আর ভরত। ওরাও ভাগাভাগিতে নেই। নিজে চাষী। ত লাগলে বাকি মালিক পক্ষও এগিয়ে আসবে। পাশের জমি ফলবতী, নিজের নিষ্ফলা, কোনো মানুষেরই এ সহ্য হয় না।

ভুবন পাল, বেঁটে, কাঁচাচুলের মাথা, স্বাস্থ্যবান, গুটিয়ে কাপড় হাঁটু বরাবর, খদখদে শাদা দাঁত কালো ছোট মুখে, যথেষ্ট মোলায়েম স্বরেই জিজ্ঞাসা করল, 'তাহালে ধনা, তিলডাঙাতে চাষ করার ব্যবস্থা কত দূর।'

ঝাঁ করে রাগ উঠে যায়, 'তার আমি কী জানি। উ কী আমার একার বাপের।'

'অয় দেখ, রেগে গেলি ত।' ভুবনের বয়স মুখে চোখে চেহারায় ছাপ ফেলে নি। পঞ্চাশ পেরিয়েছে। নরম স্বভাব। গাঁয়ে কীর্তন দলের মূল গায়েন। দু-একটা পালাও তুলেছে। মাঝখানে বৈষ্ণব হয়ে যাবার মতলব করেছিল। বলল, 'তোকে এমনি শুধুলম।'

ধনা শীতল হয়। রাগটা যে অন্যের উপর বোঝাতে, সে ঠাণ্ডা গলায় বলে, 'বুঝলে, সবাই নানারকম ফ্যাকড়া তুলছে। আরে বাবা কাজে লাগ।'

'এদিকে আমি এমন ঝামেলাতে পড়েছি। ওই ছেলেটাকে লিয়ে।'

'আছে কেমন?'

'এখন ভাল। কম হুজ্জোত গেল। ওষুধে পাঁচশ। সিউড়ী ছোটাছুটি। হারামজাদা জামগাছ থেকে পড়ল। জানে না জামের ডাল নরম। তারপর ধর, বিটির বিয়ের দেনাটি। জেরবার। সামনে চাষ আসছে। খাসি দুটোকে বিচে চাষের খরচা তুলতে হবে।'

'সবারই সমান। কে কার দুঃখ শোনে।'

ভুবন অল্প করে হাসে, 'যাক যে কথা বলছিলম, আমিন দিয়ে মাপজোক করে যদি যে যার আল নিজেরা টেনে নিত, তাহলে বর্ষায় জল ত বাঁধা থাকত। তারপর চাষের কাজের ফাঁকে লাঙলও দিতে পারত।'

'ঠিক কথা বলেছ।'

'আমিনের জন্যে চাঁদা করব, ওমনি ঝগড়া।'

ভুবন নীরব থাকে।

'বিকেলে একবার প্রধানের কাছে যাব। ওই সন্ধের সময়। তুমি যাবে?'

'কেনে?'

'কেনে আবার কী! তিলডাঙার লেগে। গোঁসাইদহ খোঁড়াতে হবে। পার্টি মদত না দিলে গাঁয়ে আর কিছু হবে না। দেখছ ত সবই। তাহলে যাবে তুমি?'

'যাব। গাঁয়ে বাস করছি। পাঁচজনের সঙ্গে থাকতে হবে।'

দুলাল নন্দীর আপ্যায়নে ত্রুটি থাকে না। কার্যক্ষেত্রে যাই হোক মৌখিক ব্যবহার সর্বদাই মাখন পেলব হওয়া প্রয়োজন, রোষকে বুকের অন্তরালে রেখে পদক্ষেপ, মাপাজোকা শব্দের ব্যবহার, সামান্য হাসি, আত্মীয়তা প্রদর্শন এবং গ্রামীণ সুচিন্তায় যে নিশিযাপন ঘটে তারও প্রকাশ দরকার। জনগণই বিধাতা। প্রায় বক্তৃতার ঢঙে সে নিবেদন করে, এলাকায় চাষযোগ্য জমি যথেষ্ট কম মানুষের অনুপাতে। এটা ভারতবর্ষেরই সামগ্রিক চিত্র। ভাগে কতটুকু জমি পড়বে পরিবার পিছু। অতি সামান্য। চাষভুঁই বৃদ্ধির পরিকল্পনা তাই স্বাগত। কিন্তু প্রসঙ্গ তিলডাঙা। সে বলে, 'তিলডাঙাতে চাষ হলে ভাল হয়, কে না জানে। কিন্তু জলের ব্যবস্থা ত আগে দরকার। আমি সবই শুনেছি। আধপাগলার কথা শুনে নাচলে ত হবে না। গোঁসাইদহ কাটানোর ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাঙ্ক ইম্প্রুভমেন্ট ডিপার্টমেন্ট রয়েছে। হবে ব্যবস্থা। পঞ্চায়েতের

ক্ষমতাও সীমিত। সবাই ভাবে, আমি যা খুশি করতে পারি। কিন্তু নিয়ম আছে, আইন আছে।'

ধনা একা নয়, সঙ্গে খগা, বিশে, রাম, চাটুজ্জেদের গোবিন্দ এল। ধনারই প্রথম কথা। সে বলল, 'সবাই তখন লাফাল। এখন দেখছি সব চুপচাপ।'

'মানুষের এটাই নিয়ম। মূল কাজের সময় লোকের অভাব হয়। যাই হোক চিন্তা করে কাজ করা দরকার। ব্যাপারটা নিয়ে আমিও ভাবছি।'

খগা বলল, 'এখন ত দেখছি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা না নিলে পড়েই থাকবে।'

'পঞ্চায়েত ত ব্যবস্থা নেবেই। সব গ্রামীণ ব্যাপারেই পঞ্চায়েতই করবে। ক্ষমতা বাড়ানো হচ্ছে পঞ্চায়েতের। এতে লাভই হবে গাঁয়ের মানুষের।'

ধনা বলল, 'তুমি এখন আল টানানোর ব্যবস্থা কর।'

'আল। খেতের আল। যার যা জমি, সেটা দেখিয়ে দেওয়া?'

'হ্যাঁ। আল থাকলে মাটি জল ধরে রাখবে বর্ষার।'

'কিন্তু ব্যক্তিগত ওসব কাজ পঞ্চায়েত করবে কেন? যার যতটা জমি, যত কাঠা তা নিজেদেরই আল টানা মাটি ঠিক করা করে নিতে হবে।'

'কিন্তু কেউ ত এগিয়ে আসছে না। মাপ করতে আমিন লাগে। তার পয়সা কে দেবে? চাঁদা চাইলে ত সবাই পাশ কাটাচ্ছে।'

'বোঝ। তাহলে চাষ হবে কী করে।' দুলাল হাসল, 'যাইহোক দেখছি আমি ব্যাপারটা। ৫ ৩ ঝামেলায় রয়েছি। খুঁটি পোঁতা, কারেন্ট আসছে না, তারপর রাস্তাটা, এদিকে ব্যাঙ্ক লোন নিয়ে দিচ্ছে না, কম ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। তিলডাঙা নিয়ে নতুন করে ভাবব কী। তাড়াহুড়ো করলে হবে না। জেনে রাখ—হবে।'

ধনা স্পষ্ট অনুভব করে, তিলডাঙা চাষযোগ্য হওয়ার সম্ভাবনা সমাধিপ্রাপ্ত হয়ে গেল। ভাবনাটা তার কপালে টিপটিপে ব্যথার জন্ম দেয়। বেয়াড়া ক্রোধ যে কার উপর জাগে! কে সেই প্রধান শত্রু, প্রতিরোধকারী তিলডাঙাকে ফলবতী করতে না দেওয়ার — প্রত্যক্ষ করতে পারে না। ব্যথাটা তাকে শুধু পীড়া দেয়। কপালে হাত বুলুনির মত সাময়িক স্বস্তি — একা মানুষ অসীম ক্ষমতাধর নয়, এবং ফসল ত সে একা পেত না, ক্ষতি সকলেরই।

রাতের বিছানায় বউ লক্ষ্মী বলল, 'কী হল, কারও সঙ্গে ঝগড়া হল নাকি?

'ঝগড়া কিসের জন্যে হবে! তুমি ত ঝগড়াই দেখ। মাথা ধরেছে। কপালে বেদনা।'

লক্ষ্মী কপালে হাত রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে বলল, 'পুকুরঘাটে শুনলম তিলডাঙাতে চাষ হবে না। তুমি ত উর লেগে বেশি ছোটাছুটি করলে, কী করবে, কেউ যদি চাষ না করে।'

'কেউ না করুক। শালা, ইকাই করব। নিজের জমি আমি চিনি।'

'একা চাষ করে ফসল রাখতে পারবে। তাবাদে জল! ছেড়ে দাও উ সব ভাবনা।' লক্ষ্মী হাতের চাপ দুকাঁধে দিয়ে বলল, 'দাঁড়াও, তোমার গায়ে হাত বুলিয়ে দি। ঘুম আসবে তাহলে।' তারপরই অবাক হয়ে বলল, 'এ মা, তুমি কাঁদছ! এত বড় বেটাছেলে, তুমি কাঁদছ।' বলতে বলতে আর্দ্র হয়ে যায় তার স্বর। দু'হাতের আদর, নরম শরীরের চাপ দিয়ে সে কান্না মুছে দিতে চায়। জেদী পুরুষটা যেন একটা নিতান্তই শিশু। জননীর মত মমতায় গাঢ় হয় সে।

ধনা ডুবে যেতে থাকে মেয়েমানুষের শরীরে। কোনো বোধ তার থাকে না।

চার

সকাল থেকে বটুক ঘর বাইরে পা দিতে পারে নি। চা খেয়েই মাটি কাটা। রাম হাতে ফাবড়া ধরিয়ে দিয়েছে। খামারের দক্ষিণে মাটি কেটে কচু লাগানোর ভুঁই তৈরি করতে। ঘরের লাগোয়া খামারবাড়ি কাঠা পাঁচেকের মত। কাঁটাগাছ, বাঁশের কঞ্চি, শিরীষ-বাবলার ডাল, তার সঙ্গে সারিবন্দী বিলিতি কঙ্কে দিয়ে পরোটা সাইজের জমিটা ঘেরা। একটা অংশে ধান ওঠে। তখন 'তালবাগড়ো' মানে ডাঁটি সমেত মস্ত মস্ত তালপাতা দিয়ে পাঁচিলের মত করে দেওয়া হয়। খামারে সামান্য কিছু ফসলও হয়। বারমেসে লঙ্কা, বেগুন, কী পুঁই, কী লাউ-কুমড়ো। এখন লঙ্কার আর বেগুনের কয়েকটা গাছ রয়েছে। খরা জ্বালায় সবুজ হারিয়ে হাভাসাভ। রোগাটে হয়ে কোনক্রমে মাটি কামড়ে আছে। ঘরে ইঁদারা নেই। তবে দু পা হাঁটলেই সেনেদের পুকুর। গ্রীষ্মেও বেশ কিছুটা জল ধরে রাখে। ওদিকে গোয়ালঘর। দোচালা একটা মাটির হাঁড়ি-কলসি পাতনা বানানর জন্য। পোড়ান সামগ্রীও ওখানে রাখা হয়। খামারের উত্তরে 'শাল'। কাঁচা মাটির সামগ্রী ওই 'শালে' সাজিয়ে তার উপর পাতলা মাটির আস্তরণ দিয়ে পোড়ানো হয়। বিশাল উনুনের আকৃতি ওটার।

আট বছরের ভাইপো কুশ, রোগা চেহারা, ফরশাপানা রঙ, কালো প্যান্টের উপর গেঞ্জি—উবু হয়ে বসে মাটি খুঁচছে। দক্ষিণের দিকটা বেশ ঢালু। গর্তের মত। ফলে সামান্য বৃষ্টিতে বাড়ি এবং খামার ভাসানো জল ধরে রাখে। মাটিটা এখানকার ঈষৎ নরম। একটানা চোট মারার ফলে বটুকের সারা গা ঘামে ভেজা। সকালেই পুবের আকাশ থেকে তাপ আসছে। ঝকঝকে সূর্যমুখ। খামারবাড়ির শিরীষগাছটা খানিক ছেঁড়া ছায়া দিয়েছে।

বড়বউ এসে ছেলেকে ডাকল, 'এই কুশ, পড়তে বসবি চল। উদিকে বইগলা —।'

কুশ মায়ের দিকে ঘাড় ফিরিয়েও দেখে না। বটুক কাজ না থামিয়ে বলে, 'যা বেটা পড় গা। লেখাপড়া করে যে, গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে। কিসে চাপবি তুই বেটা?'

কুশ বলল, 'ঘোড়ায়। তুমি আমাকে পাখি ধরে দাও।'

'দেব বৈকী। কী বোকা। কী বোকা। দেখলি ত ধরতে গেলাম, পারলাম না।' বটুক ফাবড়ার বাঁট ছেড়ে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। ঘামে মুখ ভেজা। বুকে শ্রমের বাতাস টানুনিতে ঘন ঘন স্ফীতি সংকোচন আন্দোলন।

'ঠাকুরপো, তখন থেকে দেখছি, একটানা মাটি কেটে চলেছ। জিরেন দাও। যা ধরবে শেষ না করে ছাড়বে না। কে মাথার দিব্যি দিয়েছে, একদিনে মাটি কাটতে হবে।'

'জিরেন নিলেই ফুটুস। তখন আর কোদাল পাড়তে মন হবে না। বোকা, কী বোকা! কিছু

বোঝে না। রাবণ রাজা সিঁড়ি বাঁধতে পারে নাই স্বর্গের। আজ কার কাল কার করে। আহা হলে কত ভাল হত। তা দাদা কোথা?'

'ঘরে নাই। আমাকে কী বলে যায় কোথা যায়। এই কুশ, চল। ঘরে সব কাজ পড়ে।'

ছোটভাই শ্বশুরঘর গিয়েছে। বউ বাপের বাড়িতে। তিনদিন যাওয়া হল ভরতের। ফেরার নাম নেই। বড়বউকে একলা সব করতে হচ্ছে।

'আমি ডাকতে আসব না। মুড়ি খেতে যাবে। ওই দেখ ডাল উতলে পড়ল মনে হচ্ছে। গন্ধ উঠেছে।' বড়বউ দাঁড়াল না। কুশকে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে যেতেও ভুলে গেল।

কুশ চেঁচিয়ে উঠল, 'ও কাকা, আবার এসেছে।'

শিরীষগাছে পাতার মধ্যে বেনেবউ আবার এসেছে। উজ্জ্বল হলুদ পালকের বর্ণটি। হলুদ চোখে মা যেন আদর করে কাজল পরিয়ে দিয়েছে। চমৎকার রেখার টানুনি। লাল ঠোঁট। পাতার আড়ালে হলুদ অঙ্গ দেখিয়ে যেন লুকোচুরি করে। উহুঁ, কথা বলছে না।

বটুক মাটি কাটা ছেড়ে ভাইপোকে ঠোঁটে আঙুল রেখে ইশারা করে, চুপ। তারপর পা পা করে এগিয়ে গাছে চড়ার উদ্যোগ নেয়। ওদিকে তখন বড়বউ শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে কুশকে নিতে এগিয়ে আসে। বটুককে গাছে চড়তে দেখে অবাক।

'ও কী ঠাকুরপো, গাছে উঠছ।'

'চুপ। বেনেবউ আবার এসেছে। ধরব;'

'নিজের জন্যে একটা বউ ধরে আনতে পারলে না, আবার বেনেবউ ধরবে। ও যে উড়ে যাবে। বসে থাকবে নাকি ধরা দেবার জন্যে!'

কুশ, বলল, 'থাকবে। থাকবে। ওঠ কাকা।'

ডাল একটা ধরে গুড়িতে পা ছেড়ে উঠেছে বেনেবউ ফুড়ুৎ।

বড়বউ হেসে ফেলল, 'হল ত!'

বটুক ডাল থেকে মাটিতে ঝাঁপাল, 'দুবার এল। পারলাম না। বুঝলি ও মাটিতে নামুক। ঝপ করে ধরে দেব।'

'হ্যাঁ, ততক্ষণে কুশ অঙ্কগুলো করে নে। মাস্টার যে মারবে।' বড়বউ এবার ছেলের রোগা হাত ধরে হিড়হিড়িয়ে টেনে নিয়ে গেল।

দুপুরে গাঁয়ের খবর করতে বটুক বের হয়। খেয়েদেয়ে সামান্য বিশ্রামও নেই। তুখোড় রৌদ্র ঝরানিতে মাটি, বাতাস, সকল সামগ্রী উত্তপ্ত। ছ্যাঁকা লাগে উনুনে বসানো তাওয়ার মত। ত তাতে কী। আবু চক্রবর্তী ধরল, 'এই যে বটুক, ভূষণের দোকান থেকে আমার নাম করে এক বাণ্ডিল বিড়ি আন তো—সাদা সুতো নিবি।' এনে দিয়ে 'কোথা যাই কোথা যাই' ভাবছে, তেঁতুলতলার ছায়াতে বামুনপাড়ায় দ্বিজু, ওর কাছে যাবে না অন্য কোথাও ওমনি জেঠী, 'অ বাপ। বটুক, আমার বাছুরট হামলাছে, দু-বেলা দুইব বলে রেখেছিলম, গাই ত পালে, একবার খোঁড়াদের ঘরে বলে আয়, যেন গাইটা এনে দেয়।' যেতে হল। ফেরার পথে দেখা ধনার সঙ্গে। বড়পুকুরে চান করতে যাচ্ছে গায়ে গামছা ফেলে।

ধনার পাশে দাঁড়িয়ে বটুক বলল, 'আজ ঝড় জল হবে।'

'হলেই ভাল। চাষ খানিক এগিন থাকবে।'

'তিলডাঙাতে লাঙল দিবে ত।'

ধনা থমকে আগুনে চোখে তাকাল, 'তিলডাঙাতে চাষ হবে না।'

ছেলেমানুষের মত আবদেরে গলায় বটুক বলল, 'তুমি, খগা, বিশে, সবাই বললে চাষ হবে। বললে বটুকরে তুই ঠিক বলেছিস। আমরা বুকাই বটি। তুই ঠিক বলিস।'

'আমরা বুকা লই। আমরা সবাই চালাক। সব শালা চালাক এ-গাঁয়ের।'

ধনার ক্রোধ বটুকের বোধে ধাক্কা দেয় না। কাতর গলাতে সে বলে, 'চাষ না হলে তিলডাঙাকে আমি কী বলব। উ যে কাঁদছিল — মাইরি বলছি।'

'কাঁদুক শালা তিলডাঙা কন্যে। কত মানুষই কাঁদছে। ও ত মাটি।'

'মাটি মা লয়? মাকে কাঁদাতে আছে।'

'আছে। আছে। ছাড় উসব। বিলা হছে—চান করব।'

'তুমি চাষ কর।'

'না। আমার ক্ষমতা কী। আমি কী প্রধান বটি। পঞ্চায়েতের কর্তা?'

'প্রধানের ক্ষমতা আছে বল। দুলালরাজা। রাজারা সব পারে — বল।'

'পারেই ত। গাঁয়ের বাপ বটে।'

ঝাঁ করে বটুকের মাথাতে চলে আসে দুলালরাজাকেই চেপে ধরতে হবে। উহুঁ, আরও মেম্বার রয়েছে। গাঁয়েই ত নরেন ঘোষ, বাবুবাড়ির আশুবাবু, ভক্তিবাবু, ওদিকের রানীপুরের মাস্টার রয়েছে, সাঁওতালপাড়ার ডোমনা। কিন্তু প্রধান ত দুলাল।

বটুক এক কাণ্ড ঘটিয়ে বসল। দুলালের দু'হাত চেপে ধরল। স্কুটারটা বের করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত ঝেড়ে চাপার উদ্যোগ করছে তখন। এক ঝটকানে দুলাল হাত ছাড়িয়ে নিয়ে, ভ্রূ-র বাঁকে ঘন হয়ে জমা রাগ, রক্তও যেন ছলকে উঠল, 'পাগল। সেয়ানা পাগল। শালা একেবারে হাত ধরে।' ত হাত না বটুক পায়ের উপর পড়ে গেল। চটিপরা পা দুহাতে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ও দুলালরাজা, তুমি গাঁয়ের বাপ বট। তিলডাঙাতে চাষ কর।'

দুলাল অনায়াসে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বটুককে স্তোকবাক্য দিতে পারত। তারপর স্কুটার ছোটাত। কিন্তু মধ্যিখানে নারী পিতিমা। বটুক ত পুরুষ বটে। প্রত্যেকটি অঙ্গও আছে, কাম নেই, এমন নয়। বটুক প্রতিদ্বন্দ্বী তার। মস্তিষ্কে কে যে বাজায়। তিলডাঙায় অন্তরঙ্গ দৃশ্য ঝটিতি চলে আসে। পিতিমার ক্ষুধা আছে। সে ক্ষুধার এ আধপাগল নিবৃত্ত ঘটায়। আধপাগলা, সুতরাং যেমনি খুশি নাচানো যায়। এর জন্যে পিতিমা ওমনি করে তার দিকে বেয়াড়া গাইয়ের মত দুধ না দেবার মতলবে পা ছোঁড়ে। আবার শিবু আর পাঁচুর খবরটাকে ত তাচ্ছিল্য করা যায় না। পিতিমার যৌবনগ্রাসে পতঙ্গ ধাবমানতা গাঁয়ের কিছু পুরুষের আছে। তাদের চেষ্টা অসফল। কিন্তু বটুকের সঙ্গে মেয়েমানুষের বড়ই ভাব। ইদানীং প্রায়ই দুজনকে গল্প করতে দেখা যাচ্ছে এখানে ওখানে, পুকুরঘাটে, বাঁশতলায়। এ ভাবনা নিশিশয্যায় কাঁটার মত বেঁধে। এটা ত ঠিক, দুলাল হাত বাড়িয়েছিল, ত হাতে ছোবল পড়তে সে হাতটা সরিয়ে নিয়েছে, কিন্তু চলে যায় নি। দৃষ্টি আছে, শিকারের উপর তীক্ষ্ণ নজর আছে, সুযোগের প্রতীক্ষায় স্নায়ু টান টান সতত অনুভূতি আছে। তা নইলে তন্দ্রা হোক স্বপ্ন হোক কিংবা ভাবনার অদ্ভুত

কারুকাজ হোক, সে কেন দেখে পিতিমা হাসিমুখে তার দিকে এগিয়ে আসছে। মাথার চুল খোলা, কপালে টিপ, উঁচু বুকে রঙিন শাড়ির আঁচলের ঢেউ, দু চোখে কামনাঘনতা, মাটিতে পা নেই, যেন ভাসমান যুবতী সাগ্রহ দুটি নরম বাহু মেলে মিশে যেতে চাইছে তার মধ্যে। জায়গাটা নির্জন। দীঘল বৃক্ষ আছে। কিংবা দীর্ঘ বালুবেলা। তখনই পিছনের ডাক। পিতিমা ঘাড় ফেরায়। বটুক ভেসে ওঠে। ফেরানো ঘাড় যুবতীর আর সোজা হয় না। ক্রমশ পিছিয়ে যেতে থাকে। সে দূর থেকে দূর হয়। এগিয়ে যাবার প্রবল আগ্রহ নিয়ে সে ছুটতে চায়। অসম্ভব ভারী জঙ্ঘা, পায়ের পাতা যেন মাটি কামড়ে ধরেছে। যন্ত্রণায় সে ছটফট করে।

বটুককে সরাতে পায়ের একটা ঝাপটা দিয়ে বসে দুলাল। বেশ জোরেই। উলটে পড়ে বটুক। সঙ্গে সঙ্গে উঠেও দাঁড়ায়, 'লাথি মারলে। লাথি মারলে। আমি কুকুর না বিড়েল।'

'পাগল কাঁহাকা।'

বটুক এবার শরীর এগিয়ে দেয়, 'মার। মার। তুমি কত মারবে।'

পিছিয়ে যায় দুলাল। বটুক তবু এগিয়ে যায়। ফলে ধাক্কা লাগে। দুলালের ক্রোধ বাড়ে। রক্ত ফোটে। পাগলকে না পিটলে হয় না। খেপামি বাড়লে লাঠি ধরতে হয়। কোথায় লাঠি। পায়ের চটি একমাত্র অস্ত্র। সে খুলে ফেলে। চটিই এখন কাটারি, দা, তরোয়াল। সামনে শত্রু। সে চটি দিয়ে পিটতে থাকে। আঘাতের পর আঘাত চামড়ার শক্ত চটি। অন্ধের মত সে মেরেই যায়। যেন শেষ না করে ছাড়বে না।

বটুক সরে যায় না। তারও যেন প্রচণ্ড জেদ। যন্ত্রণা নেই, নিজেকে বাঁচানোর তাড়না নেই। সে চেঁচাতে থাকে, 'মার। মার। যত খুশি মার। কিন্তু তিলডাঙাতে তুমাকে চাষ কবতে হবেই — আমি ছাড়ব না। ও দুলালরাজা, তুমি গাঁয়ের বাপ বট। তুমি না করলে কে করবে। তিলডাঙা কন্যে যে কাঁদে।'

দুলাল থামত না। একেবারে নীরব করে দেবার হিংসাপরায়ণতা তার সব স্নায়ুকে নির্মম খুনির মত উত্তেজনাপ্রবণ করে তুলেছিল। কিন্তু রাস্তার ঘটনা। সুতরাং দ্রুত ভিড় হয়ে যায়। সংবিৎ ফিরে পেতে সে বলে, 'পাগলটা কামড়াতে এসেছিল।'

বটুক হাউমাউ করে এবার কাঁদে। তার মুখে রক্ত পড়ছে। চটির কালসিটে পড়েছে গালে, কপালে, চোখে, গলায়, হাতে। দুলাল দেখে না। শিবু ওকে টেনে নিয়ে যায়। ভেবে পায় না শিবু, তার দুলালদার অকস্মাৎ মস্তিষ্কে কী ভূত ঢুকেছিল। পাগলটাকে মারতে গেল কেন। মানুষটার এ ব্যবহার স্বভাববিরুদ্ধ। পিটতে হলে ত পাঁচু ছিল, পটলা ছিল। কালই ত পাঁচু দশটা টাকা নিয়ে গেল, মদ খাবে। সাইকেলে করে মারল ধাক্কা পঙ্কজকে। কেউ টের পেল! কপালে এখনো কাটা দাগ আছে। আরে তাকে বললেই ত দু-চারটে চড়চাপড় চালিয়ে দিত। বাড়াবাড়ি করার কী দরকার। এবার ম্যাও সামলাও।

ওদিকে নীরব পড়শীরা। তবে দুলাল সরে যেতে, 'এত মারা ঠিক হয় নাই', 'আহা হা ওষুধ লাগা', 'কী রক্ত পড়ছে', 'পাগলা কামড়ালে সেও পাগল হয়, সাপের বিষের মত সাঙ্ঘাতিক', 'কামড়িন ছিল নাকি' ইত্যাদি কথা হয়। এরমধ্যে এক ছোঁড়া ছুটে গিয়ে রামেদের ঘরে সংবাদ দেয়। রাম ভরত দুজনই ছুটে আসে। কোনো কথা না বলে তারা ভাইকে নিয়ে যায়। বটুকের কান্না বন্ধ হয় না। সে কেঁদেই চলে।

বটুককে পিটিয়ে দুলাল বুঝতে পারে, কাজটা ঠিক হয় নি। এতটা উত্তেজিত সে না হলেই পারত। ক্রোধ নামী শয়তান অবিশ্বাস্য কাণ্ড ঘটায়। মাথা আগ্নেয়গিরি হলে গর্ভস্থ আদিমতার বমন ঘটে। দুলাল ভাবল, ব্যাপারটা নিয়ে কী ঘোঁট পাকাতে পারে! অন্য সদস্যদের কোনো মন্তব্য কিংবা অবনীর মিছিল কবে এসে, 'প্রতিকার চাই' নামে আস্ফালন। না, অতদূর ভাবছে কেন সে। গাঁয়ের মানুষ তার কব্জায়। আশুবাবু, ভক্তিবাবু হয়ত বলবেন, দুলাল কাজটা ঠিক হয় নি। তবে প্রতিরোধের জন্য চমৎকার কথা ত জনতাকে শুনিয়েছে। তাকে কামড়ে দিতে এসেছিল। পাগল কামড়ালে বিষক্রিয়া স্বাভাবিক। এমনি মানুষের মধ্যেও কী কম বিষ। সাপের চেয়ে যা উগ্র। মানুষের বিষ কী সংরক্ষিত হয়? বিজ্ঞান যে কী করছে। যাক গে, মোদ্দা কথা হল, কামড়াতে এসেছিল কামড়ায় নাই। বিপক্ষ ভাবনা প্রশ্ন জাগায়, তার জন্যে এতখানি! তারপর বটুককে যথার্থই পাগল বলা হবে কী! গায়ে গু মাখে না, ন্যাংটো হয়ে ঘোরে না, গুম মেরে বসে থাকা কিংবা চিৎকার করে বুক চাপড়ে বেড়ানো, কী অসংলগ্ন কথা, প্রলাপবাক্যও ব্যবহার করে না। এমনিতে স্বাভাবিক। ইতিপূর্বে কাউকে কামড়ানো কী তেড়ে ধরতে যাওয়ার ঘটনা নেই। মানুষের উপকার করে। যে কেউ ডাকুক, তার কাজ করে দেয়। এর দরুণ লাভ কিছু চায় না। ফলে গ্রামের মানুষদের একটা সহানুভূতি আছে। ওর ঘরে দুভাই, ভাই-বউ তাচ্ছিল্য করে না। প্রীতি আছে। তাহলে সব মিলিয়ে ব্যাপারটা তার বিপক্ষে দাঁড়াচ্ছে। প্রমাণ শক্ত বটুক পাগল। পাগলামি করলেও বাড়াবাড়ি করে নি। তাহলে সে কেন এত উগ্র হল! দুর্বলতার প্রকাশ এটা। নেতাগিরির এও এক ধরনের স্খলন। গোড়াতেই এর বীজ মেরে দেওয়া দরকার। সামান্য নত হয়ে দোষ স্বীকার, উঁহু, অসম্ভব, ওটা কথার মারপ্যাঁচে ফেলে সস্নেহ ভঙ্গি দেখালে নিজের মহত্বকেই প্রকাশিত করা হবে। দুলালের চকিত এই বুদ্ধির উদ্ভাসই তার যাত্রাপথকে সরল মসৃণ করেছে।

'শিবু, রামকে একবার ডেকে নিয়ে আয় ত!'

শিবু নীরবে দাঁড়িয়ে দুলালের দাওয়ায় বসে হাঁসফাঁস করা দেখছিল। বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু পাগলটার উপর তুমি অত রেগে গেল কেন?'

'তার কৈফয়ত তোকে দেব।' দুলাল রক্তিম চোখে তাকাল, 'যা বলছি কর।'

'তা করছি। কিন্তু তুমি ত ঠাণ্ডা কথার মানুষ।'

'আবার বকবক করে। যা।'

শিবু বেরিয়ে গেল। ওদিকে বন্দনা। দরজার ওপাশে কপাট ধরে নিজেকে খাড়া করে রেখেছে। লাল ডোরা তাঁতের শাড়ি, লাল ব্লাউস যেন চামড়া ঢাকা কঙ্কালের উপর পরানো। মাথার রুখু চুল, লম্বাটে মুখের বসা গাল, সামনের চুল উঠে প্রশস্ত কপাল, দুটি চোখ কোটরের ভেতর। মেয়েমানুষের সমতল বুক আন্দোলিত হচ্ছে। শীর্ণ কাঠিহাতের কাঁকড়াদাঁড়া আঙুলে দরজার পাল্লা ধরে হাঁপের শব্দে বলল, 'হ্যাঁগো, কী হল! এত গোলমাল কিসের? কী হয়েছে।'

'খুকার মা গেল কোথায়? একলা উঠেছ।' দুলাল বিরক্তির চাউনি ফেলে। খুকার মা দেখাশোনা করে। কোথা যে যায়। তারপরই বন্দনার মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হল; যথার্থই তার জন্যে উদ্বেগ। অক্ষিগোলক বিশাল হয়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মায়া প্রতিক্রিয়া না.

দুলালের মনে হল বীভৎস এই নারী, প্রেতিনী। তার জন্য ভয়কাতরতা আর্দ্র করল না তাকে, ক্রোধ শিখায় বারুদ ইন্ধন দিল। পিতিমার উপর আকর্ষণ, না পাওয়ার যন্ত্রণা, বটুককে পিটুনি দেওয়া — বন্দনা পুরুষক্ষুধা প্রশমিত করতে পারলে ত ঘটত না।

'যাও। ঘরে যাও — শুয়ে পড়।'

বন্দনা করুণ চোখে তাকাল। যেন এখনই ভিজে উঠবে আঁখিপল্লব।

'কী হল, কথা কানে যাচ্ছে না?'

বন্দনা চৌকাঠের ওপাশে মেঝেয় বসল। শুকনো ঠোঁট নেড়ে বলল, 'তুমি ওরকম করছ কেন গো! কী হয়েছে তোমার!'

'বড় জ্বালাও ত। সব ব্যাপারে তোমার থাকার কী দরকার!'

বন্দনার কাতর চোখ এখন স্ফীত হল। যেন এক্ষুনি জীবনীশক্তির শেষ টুকরোটা মার্বেলের মত ছিটকে বেরিয়ে যাবে। জোর শ্বাসের সঙ্গে সে ধরে রাখার চেষ্টা করছে।

দুলাল নম্র হল। বলল, 'বটুক বেরুতে দিচ্ছিল না। পাগল মানুষ।'

'কেন? তুমি কী করেছ।'

'আরে পাগলের কাছে কেন থাকে। বলে কী, তিলডাঙাতে চাষ করতে হবে। নইলে যেতে দেবে না আমাকে। চাষ কী হাতের মোয়া!' দুলাল উঠে দাঁড়াল, 'চল তোমাকে বিছানাতে শুইয়ে দিয়ে আসি।'

'তুমি? তুমি শুইয়ে দেবে?' ব্যগ্র হাত বাড়ায় বন্দনা।

দুলাল ধরতেই নারী যেন তার অবলম্বিত হয়ে যায়। নারী না শক্ত কাঠ। অনুভূতিতে দুলালের দ্রুত বিরক্তির সঙ্গে ঘৃণা যেন জ্বলুনি বৃষ্টিতে স্নান করায়। ক্লেদ স্নান। অথচ বন্দনা ঘনিষ্ঠতায় বন্ধনকে যেন ভালবাসার ফুলমালা করে গড়ে। তারপর শুয়ে দুলালের একটা হাত বুকের উপর রাখে। চোখ বন্ধ করে। সুখকে হজম করার ক্ষমতাও বুঝি তার থাকে না।

দুলালের মা ঘরে ছিল না। উঠোন থেকেই গলা ছুঁড়ে দেয়, 'হ্যাঁরে দুলাল, কী হল। কী সব শুনছি। বটুককে তুই মেরেছিস। রক্তারক্তি কাণ্ড। কেন রে? বটুক আবার কী করল?'

দুলাল বাইরে আসে। বলে, 'থাম ত। আগে শুনবে ত।'

মা লম্বাপানা রোগা মানুষ। বয়স হয়েছে। তবে রোগাটে গড়নেও শক্ত বাঁধুনি। দু-পুত্রকে কষ্ট করে বড় করেছেন। ইদানিং পুত্রদের কোনো ব্যাপারেই থাকেন না। রামায়ণ, মহাভারত পাঠ, দুবেলা খাওয়া —ব্যস। তবে পুত্রবধূটির প্রতি মহিলার মমতা আছে।

'তুই মারতে গেলি কেন।'

'এমনি মারি নি মা। আমাকে কামড়ে দিত। মনে হচ্ছে হঠাৎ পাগলামি উঠেছে।'

'এখানে ওখানে গাঁয়ের লোক গজলা করছে।'

'করুক।' দুলাল বলল, 'রামকে ডাকতে পাঠিয়েছি শিবুকে দিয়ে।'

শিবু এসে গেল। বলল, 'রাম এখন আসতে পারবে না।'

মা বলল, 'তুই যা দুলাল।'

'না। রাম আসবে বলেছে ত।'

শিবু বলল, 'তা কেমন করে জানব? এখন যেতে পারব না বলল।'

'বটুক কি করছে?'

'বসে আছে। ঠোঁট কেটে গিয়েছে। রক্ত বেরুচ্ছে।'

'আয়, আমার ঘরে আয়।'

'স্কুটারটা বাইরে থাকবে? বেরুবে না তুমি?'

'না—মা দুকাপ চা কর ত। তুমিও ত চা খাবে?' বলতে বলতে নিজের ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসল। সিঙ্গেল খাটের উপর বিছানা। পূবের জানালা দু 'পাট খোলা।

শিবু আর একটা চেয়ারে বসে বলল, 'লাল ওষুধ লাগাচ্ছে। কম্পাউন্ডারের কাছে ট্যাবলেট আনতে গিয়েছে ভরত।'

'ওদের ঘরে আর কে কে রয়েছে।'

'বাইরের কাউকে ত দেখলাম না। ও হোঃ পিতিমাকে দেখলাম।'

দুলালের চোয়াল শক্ত। পিতিমা রয়েছে। দুলালের মনে হল, রাম না আসুক—সে যাবে। পরমুহূর্তে ঠোঁট কামড়ে ইচ্ছা দমন ঘটাল। কিন্তু ভাবনা গেল না। পিতিমা। পিতিমা গিয়েছে। মস্তিষ্কে একটা কাঠি দিয়ে ইয়ার্কির ঢঙে কে যেন টিকির টিকির করতে থাকল। তিলডাঙায় চাষ না পিতিমা, কোনটা তাকে বটুক পিটুনিতে উগ্র করেছে! আর খেপাটে মানুষ, ঈর্ষাযোগ্য সে ত পিতিমা কারণে। পিতিমা কেন গেল? নিছক মায়া না প্রণয় আকর্ষণ? ছলবলে যুবতী কী আধপাগলে মুগ্ধ! সে যা ভেবেছে, দেখা যাচ্ছে সেটাই ঠিক। মেয়েমানুষ বটুককে দিয়ে ক্ষুধা নিবৃত্তি ঘটাচ্ছে। তাই তাচ্ছিল্য! সতীপনা। ক্রোধ যেন আরও জ্বলুনির সন্ধান পায়। মন বনভূমির শুষ্কপাতায় আগুন লেগেছে। কিছু রেহাই দেয় না সেই অগ্নি। সবুজও গ্রাস করে উত্তপ্ত। পুরুষ ক্ষুধার এই ত দস্তুর — নারী অভিমুখে ধাবমানতা পৃথিবীর যে কোনো সর্বনাশকেও বিশাল করে দেখে না।

'পিতিমা কী করছে রে শিবু?'

'বসে আছে। আমার দিকে এমন করে তাকাল, যেন আগুন জ্বলছে। আমাকেও ছাই করে দেবে। বলেছি না দুলালদা পাগলটার সঙ্গে —।' শিবু কথা শেষ করে না।

'থাক। থাক। পরের কেচ্ছা আর শোনাতে হবে না।'

শিবু থমকে গেল। কপালে ভাঁজ। পরের কেচ্ছা না নিজের কেচ্ছা। রামকে ডাকতে যাবার পথেই সে ভেবেছে, দুলাল নন্দীর ক্রোধ নারী কামনাসঞ্জাত। বটুক এখানে তুচ্ছ। পিতিমাকে গ্রাস করতে গিয়ে চোট খেয়েছে। ইদানীং ত খবরও রাখছে। পাঁচুকেও ত জিজ্ঞাসা করছিল। ত শিবু দোষ দেয় না। বউদি ত প্যাঁকাটি। মাংসের চিহ্ন নেই। মাংস না থাকলে মেয়েমানুষ আর কী। তা বলে পরের বিধবার উপর নজর দেওয়াও সে সঙ্গত মনে করে না। যা না বাবা সিউড়ী, টাকা খসালেই মেয়েমানুষ।

শিবু দুলালের মুখটা পড়ে নিল। তারপর বলল, 'বাঃ গাঁয়ে এসব ঘটবে তুমি চুপ করে বসে থাকবে। পাগলা বলে বেটাছেলে নয়।'

শিবুর কথায় দুলাল যেন নত হয়। সাপের মত ফণা তুলে ক্রুদ্ধ বিষ নিঃশ্বাস ফেলছিল সে। শিবু তার সঙ্গে ঘুরছে সর্বদা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে মদত দেবে। কিন্তু শিবু কী টের পেয়েছে দুর্বলতা। পিতিমা কাউকে বলেছে? পিতিমা আকর্ষী লক্ষণ কী তার চোখেমুখে আঁকা হয় —

[illegible]' হয়ে যাচ্ছে! তাই এরকম কথা। হতে পারে। চৌকশ ছেলে।

'কী করব বল!'

দুলালের কথা শুনে শিবু সজোরে মাথা নাচায়, 'ওর শাশুড়ি দেওরকে বলতে হবে।'

সাক্ষ্য প্রমাণ কী। তাছাড়া এসব ব্যক্তিগত ব্যাপার।'

'ব্যক্তি নিয়েই ত সমাজ। মদ খেয়ে মাতলামো করে বেড়াবে গাঁয়ে, এটা ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলতে পারো। গাঁয়ের মঙ্গল ত তোমাকে দেখতে হবে।'

মা চা নিয়ে এসে নিঃশব্দে নামিয়ে রাখল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'শিবু বউমার বোতলের ওষুধটা ফুরিয়েছে, এনে দিতে হবে।'

শিবু বলল, 'এনে দেব।' চা খেয়ে সে উঠে যাবার সময় বলে গেল, 'যা ভাল বোঝ কর। তাহলে আজ আর বেরুবে না। ঘরেই থাকবে। স্কুটারটা বাইরে থাকবে?'

'থাক। সন্ধের পরে আসবি। এখন চললি কোথা?'

কোথা যাচ্ছে উত্তর দিল না। শুধু বলল, 'আসব।'

বটুককে মারার প্রায়শ্চিত্ত ভাবনা, কিংবা ও সংক্রান্ত পরবর্তী চিত্রের কল্পনা কেন যে মাথায় আসে না। পিতিমা, সর্বনাশী নারী কেবল সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। ঠোঁটে বিদ্রূপের হাসি। কিংবা খেলাই যেন, 'ধরতে পারলে না,' 'ধরতে পারলে না,' ছোটে, মাথার চুল ওড়ে, বুকের আঁচল ফুলে ওঠে। তারপরই নজরে পড়ে আধপাগলকে বুকে সাপটে ঠোঁট নামিয়ে আনছে ঠোঁটের উপর। নগ্ন বুক, নগ্ন বাহু।

রাম আসে নি। দুলালকেই যেতে হয়। স্কুলে গিয়েছিল। নৃপেনবাবু, ধীরাজ, নন্দবাবু জানতে চাইলেন, বটুক নাকি আপনাকে কামড়াতে এসেছিল। পাগলের কামড় ডেঞ্জারাস। কামড়ায় নি শুনে স্বস্তি প্রকাশ করল। ঘন্টাখানেক ছিল স্কুলে। একটা ক্লাশও নিয়েছে। তারপর পঞ্চায়েত অফিস। সেক্রেটারি মোহন, মোটাসোটা গোলগাল চেহারা, সবেতেই হ্যাঁ এবং হাসির নিবেদন, সে পর্যন্ত জানতে চাইল, তার লেগেছে কিনা। নরেন বলল, পাগলাগারদ যখন রয়েছে, তখন সেখানে দেয় না কেন? আশুবাবু গম্ভীর স্বরে শুধু জানতে চাইলেন, 'তোমার লাগে নি ত দুলাল।'

এ প্রসঙ্গে যে সব কথাবার্তা হল, বোঝা যাচ্ছে বেশই প্রচার ঘটেছে, তবে দুলাল টের পেল সবই তার পক্ষে। এটা মুখের কথা হতে পারে, মন চিন্তা ত কেউ প্রকাশ করে না। নিজেকে উদোম কে করবে? এতে অবশ্য কিছুই আটকায় না। এভাবেই চলেছে। ব্যাঙ্ক ম্যানেজারের সঙ্গে সে দেখা করল। ভদ্রলোক কলকাতা থেকে এসেছেন। ফ্যামিলি ওখানে। বড়ই বিরক্ত। ঋণগ্রহীতাদের ঋণশোধের কোনো ব্যাপারই নেই। প্রধান হিশেবে তার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলেন। নতুন করে আবার ঋণ দেওয়ার ব্যাপারটা আলোচনাও হল। অনেকেই ত পায় নি। না, ভদ্রলোক বটুক বৃত্তান্ত অবগত নন।

দুলাল ঘরে ঢুকল না। দরজা গোড়া থেকে ডাকল, 'রাম রয়েছে।'

'কে বটে?' উঠোনেই রাম। গলা বাড়াল শুধু। দুলালকে দেখে চোয়াল শক্ত হল।

ভেতরে ডাকছে না, ত কী, দুলাল ঢুকে পড়ল, 'বটুক কোথা গেল?' উত্তরের অপেক্ষা না,

বলে চলল, 'এমন মাথা গরম করে দিল। আরে তিলডাঙাতে চাষ হয়। তা যদি বোঝে। কিছুতেই ঘর থেকে বেরুতে দেবে না। এত খারাপ লাগছে। আচ্ছা ইদানীং ও একটু অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা —।' পিতিমার কথা তোলা সঙ্গত কিনা ভাবনা না হতে দিয়ে বলল, 'মানে মাথাটার কথা বলছি। ঘুমটুম হয় ত! ওষুধপত্র —।'

রাম বলল, 'অন্যরকম কিছু হয় নাই। ভালই আছে, যেমন থাকে। ভাই আমার খিপা নয় — একটু উদোমাদা বলতে পার। নিজেরটা বোঝে না।'

'ঠিকই।' দুলাল মাথা নাচাল, 'এতদিন গাঁয়ে রয়েছে — এমন ত করে না। ওই তিলডাঙাটা মাথাতে ঢুকতে —।'

রামের উদোম গা। কোমরে ময়লা সবুজ লুঙি। বুকে লোম। মুখে খোঁচা দাড়ি গোঁফ। সামান্য টাক হয়েছে। ফলে বয়সটা তুলনায় ভারী দেখায়। বলে, 'খারাপ জিনিশ ত মাথায় ঢুকে নাই। তিলডাঙা অমন পড়ে থাকবে কেনে? চাষের জমি বাড়ছে না। লোক বাড়ছে। গাঁয়ে আনাজপাতি হয় না। সব বাইরের চালান। সাঁইথে সিউড়ীর। হলে ত সবার ভাল বটে।'

'ঠিকই। ঠিকই।' দুলাল মাথা নাচাল। বড়বউ ওদিক থেকে একবার দেখে রান্নাঘরের দিকে গেল। কোনো কথা বলল না। দুলাল দ্রুত চোখ সরিয়ে নিল, 'ওদিকটা ত মানতেই হবে। তবে এখুনি চাষ চাই — এটা ত বাড়াবাড়ি। বটুক তোমার একলার ভাই নয়। আমারও ভাই বটে। তবে তুমি ত দেখ নি, হাত না তুললে ও থামত না।'

'তা বলে ওরকম মারতে হবে? আক্রোশে তুমি প্রধান হয়েও নিজেই যে খেপেছিলে!'

রামের কথাটা দুলালকে সাংঘাতিক আঘাত দেয়। একেবারে শক্তিশেলের মত বুক ফেড়ে যায় তার। বলে, 'রাগ। বুঝলে মানুষের শরীর। কত কাজে মাথা ভার। কত যন্ত্রণা, রাম তুমিও অবস্থায় পড়লে—উহুঁ বোঝাতে পারব না। যেমন বোঝাতে পারব না আমারও কষ্ট হচ্ছে—মেরে আমিও কেঁদেছি। এই যে তোমার কাছে ছুটে এসেছি, বটুক কেমন আছে, কোথায় লেগেছে, বারবার এর কাছে তার কাছে জিজ্ঞাসা করেছি; আক্রোশ থাকলে ত আমি খুশি হতাম, এ সব করব কেন—বল।' কন্ঠস্বরকে দুলাল একেবারে স্যাঁতস্যাঁতে করে ফেলে। বলে, 'উত্তেজনায় কত কী যে হয়ে যায়'।

রামের মন ভেজে। টানটান শরীরটা কুঁকড়ে যায়। কোন কথা বলে না।

'কোথা গেল বটুক? একবার ডেকে দাও।'

'ঘরে নাই।'

'যাকগে তুমি কিছু মনে করো না। আমি বটুককে বুঝিয়ে বলব। আমি ওর মন জানি। আর রাগ রেখ না মনে। আমি তোমাদের পর নই। শুধু প্রধান হিশাবে বলছি না, গাঁয়ের মানুষ হিশাবে আমরা আত্মীয় পরস্পরের।'

বেরিয়ে আসার সময় দুলাল পরিষ্কার টের পেল, রাম গলে পাঁক হয়ে গিয়েছে। কথাই ত সব। কথাই সম্পর্ক গড়ে, আবার ভাঙে। জন্ম দেয় হাজারো সমস্যার। আবার সমাধানও করে। দু-ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে শব্দ নির্গমনের কৌশলে সে যে দক্ষ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

বটুকের দুলালের উপর রাগ আর নেই। আসলে তার রাগ নামক অনুভবটি তো উড়ন্ত

মেঘের সূর্য ঢাকা দেওয়ার মত। এই ঢাকল, এই খুলল। দুলালের স্কুটার সামনে থামাতে ঘাড় ফেরাল না, যেন শব্দই পায় নি। ডাকতে মুখ ভার, টইটম্বুর অভিমান, চোখ ছলছল, চাউনি মাটিতে।

'তোর রাগ হয়েছে খুব?'

'হবেই ত। তুমি মারলে কেনে আমাকে!' বেয়াড়া মাথা নাড়ল বটুক।

'রাগ করিস না বটুক। কী রে রাগ করবি না ত? নে, হাস দেখি।'

বটুক হেসে ফেলে, চোখে অশ্রুরেখা।

'এই ত। আমার উপর রাগ করবি কেন? আমি তোর দাদা।'

'না, তুমি দাদা নও। তুমি হলে দুলালরাজা। তুমি ভালো লোক নও। আমি জানি।'

'এখনও তোর রাগ যায় নি।' সস্নেহ প্রশ্রয় হাসি ঠোঁট থেকে সরে না দুলালের। বলে, 'বুঝেছি। তিলডাঙাতে চাষ হবে না বলে, তোর রাগ ত। ঠিক আছে, হবে চাষ।'

'হবে!' তুবড়ির মত জ্বলে ওঠে বটুক। উল্লাস মুখমণ্ডলকে বিস্ফারিত করে।

'হ্যাঁ, হবে। তবে তাগাদা দিবি না। সময় লাগবে। বিরক্ত করলে হবে না।'

'তাই তাগাদা দেয়, তাই বিরক্ত করে।' বটুক যেন ধরে রাখতে পারে না ভেতরের আহ্লাদকে। সে যে কী করবে! আশেপাশে তাকায়। কেউ নেই। দূরে একটা গরু চরছে। তবে পাশেই ত খেজুরগাছ। গাছকেই সে বলে, 'শুনলি! তু শুনলি ত।'

'হ্যাঁরে, পিতিমা, কী বলছিল?'

সন্দিগ্ধ চোখে তাকায় বটুক। দুলালকে কামড়ে দিয়েছে পিতিমা, সেটার কথা জানতে চাইছে? মাথা খারাপ নাকি! সে বলবে না। মেয়েমানুষ নিষেধ করেছে। সে বলে, 'কী আবার বলবে।'

'ওই যে তোকে মেরেছিলাম।'

পিতিমা রাগ করেছে। তাকে মেরেছে দুলাল, তাই বলেছে ঘরে এসে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে 'প্রধান বলে যা খুশি তাই করবে! তোমরা সব চুপ করে থাকবে!' তার মাথায় হাত রেখেছে। বলেছে, 'খুব বেজেছে তোমার বল।' তখন মেয়েমানুষের দু'চোখ অশ্রুময়। বলেছে, 'দুলাল মানুষ নয় — জানোয়ার।'

'কী রে বলবি না?'

'কিছু বলে নাই?'

'সে কী তোর সঙ্গে অত ভাব। অত গল্প করে? কী বলে।'

'জানি না। আমার মনে থাকে না।'

'তুই পিতিমাকে বলবি —।'

'তিলডাঙায় চাষ হবে — তুমি বলেছ, বলব। নিশ্চয়ই বলব। এই কথাটাই তো। এখুনই বলব। এখুনই বলতে যেছি।' বটুক দ্রুত পা চালায়।

পাঁচ

আবার একটা ঝড়-বৃষ্টির বিকেল আসে। যেন প্রকৃতি এই রুক্ষ ভূঁইকে সিক্ত করে আগামী ফসল সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে দিতে চায়। বর্ষা এখনও ত ঢের দূরে। মাঝে মধ্যে বৃষ্টি, মটিকে গড়ে নেবার সুযোগ দিচ্ছে চাষীকে। তবে সেটাও বন্ধ হয়ে থাকে। বৈশাখ আগুনের মাস, জ্বালার মাস। তার ধর্ম যাবে কোথায়।

এদিকে বটুক যতই পিতিমার নিকটবর্তী হয়, ততই পরিবর্তিত হতে থাকে তার মানসিকতা। সে এখন যুবতীর দিকে তাকাতে পারে। পড়তে পারে শরীরের প্রতিটি রেখা। কামনার নিখুঁত বুনুনি তাকে মুগ্ধ করেছে। দু - চোখের নিবিড়তায় ভোগবাঞ্ছা জাগে। পিতিমার কথা বলা, ঠোঁট নড়া, হাসি, শরীরের প্রতিটি মুদ্রা, হাঁটা ফেরায়, তার সামনে উর্ধ্ববাহু আড়মোড়া ভাঙায়, সে তন্ময় হয়ে যায়। বোধে ছলাকলায় ভুলব না, এমন প্রশ্নও নেই। নারীর জন্য আকাঙক্ষার পারাবত ডানা ঝাপটায় বুকের মধ্যে। রক্ত চঞ্চল হয়। রাতের বিছানায় ওই নারীমুখ যেন ঝুঁকে থাকে তার বুকের উপর। শ্বাসপাত পর্যন্ত টের পায়। প্রবৃত্তির এ তীব্রতা সে কখনোই টের পায় নি। ফলে তার জীবনের ধারাবাহিকতায় যেন মোচড় নিয়ে প্রবল বন্যা যেমন নদীপথকে বিচলিত করে, তেমনি করেছে। লোকের কাজ করার জন্য ছুটতে কেন যেন মন যায় না। মনে হয় শুধু— বড় কষ্ট পিতিমার। আচ্ছা, ওর কষ্টটা যদি ঘুচিয়ে দেওয়া যেত! আবু চক্রবর্ত্তি 'বটুক শূনে যা', বলা ডাকাতেও 'পরে শুনব' বলে হাঁটা দিয়ে দেয়। পিতিমা ডেকেছে।

তবে বর্তমান ঘনিষ্ঠতায় পিতিমার ভূমিকাই মূখ্য। সে ধেয়ে এসেছে সর্বস্ব নিয়ে আধপাগলা মানুষটার দিকে। রমনীয় আয়ুধে ক্ষতবিক্ষত করছে। বুঝি আবিষ্কার করেছে পৃথিবীতে তার কাঙ্খিত পুরুষ একটাই। দিব্যি ত ছিল। কী যে হয়ে গেল তার? কেন হল? শুধু কি দু'বাহু দিয়ে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনপ্রয়াসী অন্ধতা? নাকি তার বাইরেও কিছু আছে। বেঁচে থাকার কোনো মন্ত্র। যাতে পৃথিবীকে মনোরম করে। যাতে এই আকাশ বাতাস বৃক্ষশ্রেণী মনে হয় বড় আপন। শরীর তুলোর মত হালকা হয়ে যায়! পিতিমা কী আশ্রয়হীনা বোধ করত নিজেকে। বটুককে আশ্রয় করে বাঁচার তাড়না থেকে নিঃশব্দ জন্ম এর? শাশুড়ি দেওরের সঙ্গে সম্পর্ক ত তিক্ততার। দেওরের তার ব্যাপারে আগ্রহ আছে। কিন্তু সে ত এক কলুষিত উদ্দেশের। গোপন দেহ সম্পর্ক গড়ে উঠুক। মাতালের ত কেবল দেহভোগের লালসাঘন দৃষ্টি। হাত বাড়াতে সাহস করে না। ইঙ্গিতে সেটা বোঝায়। ঘেন্না করে পিতিমার। আর অন্য পুরুষ, এ গাঁয়ের। সব সমান। সবাই দুলাল। বটুকবাবু স্বতন্ত্র। বটুকবাবু তার জন্যে জীবন দিয়ে দিতে পারে। বটুকবাবু পৃথিবীকে একধারে সরিয়ে তার দিকে দাঁড়াতে পারে।

বুড়োশিবতলায় অশ্বত্থের ছায়ায় ভরদুপুরে পিতিমা বসে আছে। সামনে বটুক। 'দেখা' করতে বলেছিল পিতিমাই। গাঁ বাইরে শিবমন্দির। সামনে এক পাড়ের পুকুর শিবগড়ে। শিবরাত্রিতে শুধু পূজো। তবে ইদানীং সোমবারে কিছু কুমারীও ঘটিতে জল আর ফুল নিয়ে শিবলিঙ্গে চড়িয়ে যায়। মন্দিরকে ঘিরে আছে বাগানের মত খানিকটা জায়গা। চারটে আমের গাছ। তাছাড়া বিলিতি কল্কে, আঁকড়, ঝোপঝাপ। দিব্যি আড়াল অশ্বত্থতল। দূরে রাস্তা। গাঢ় দুপুরের ঘনত্বে তাপের পারদ বাড়ছে। বাতাসও তাপের শিকার। শনশনানির মধ্যে তার আহত উষ্ণশ্বাস কেবল। মানুষজন নেই। এই প্রথম তারা নির্জনে মিলিত হচ্ছে। ডাকটা পিতিমারা। সে ডাক শুনেছে বটুকের পৌরুষ। নিষিদ্ধ গোপন সাক্ষাৎকারটি যেন উভয়ের সম্পর্ক এ মুহূর্তে না বললেও স্পষ্ট করে দিয়েছে।

'তোমাকে ডেকেছি কেন জানো?'

'না।'

'না জেনেই চলে এলে।'

'তুমি ডাকলে আমি আসব না?'

'বটেই ত। আমি ডাকলে তুমি না এসে পার। জানো, শাশুড়ি দেওর আমাকে ভেন্ন করছে।'

'তাতে কী। তুমি একা থাকবে। জমি রইছে। আমি চাষে লেগে দেব। অভাব কী তোমার!

'আমার অভাব ত মানুষের। তুমি যদি একটু বুঝতে!'

বটুকের সব ইন্দ্রিয় একযোগে বলে উঠতে চাইছিল, বুঝি, সব বুঝি পিতিমা। কিন্তু একটা শব্দও সে বের করতে পারল না। নির্বোধ চাউনি ফেলে রাখল। এক দমকা উষ্ণ ঝোড়ো হাওয়া কলকেগাছগুলোকে নাড়া দিয়ে গেল। আগুনে তরঙ্গ আছড়ে পড়ল।

'হ্যাঁ করে কি দেখছ বটুকবাবু, আমার বাইরেটা না ভেতরটা?'

'তুমি কথা বললে মনে হয় কাঁদছ — আমার কষ্ট হয়।'

'আমিও যে তিলডাঙা গো। তোমাকে বলেছি না?'

'দুলালরাজা বলেছে, চাষ করবে। অ, তোমাকে ত বলেছি।'

'আমিও বলেছি, ও মুখের কথা। মেরেছিল তাই স্তোক। তুমি মানুষ চিনলে না।'

'মিথ্যে কথা কেন বলে!'

'লোক ঠকাতে। পুঁজি বাড়াতে। ধনের মানের — তুমি এসব বোঝ? বোঝ না।'

বটুক বোঝে না। কিন্তু দেহ-মন ভরে যায় যেন দুঃখে। চতুর্দিক থেকে গাঢ় ধোঁয়া এসে আচ্ছন্ন করে। বিষাদ ভরা গলায় বলে, 'তাহলে কী হবে!'

'জানি না। নিজের কথাই ত জানি না গো। তোমাকে ডেকেছি কেন বল ত!'

বটুক অবাক চোখ মেলে তাকিয়ে থাকে।

'তোমার সঙ্গে কথা বলব বলে। তুমি বলবে, আমি শুনব। আমি বলব তুমি শুনবে। কেউ কোথাও থাকবে না। বটুকবাবু কাছে এস। পাশে বস। দূর থেকে কী কথা শোনা যায়।' যেন দীর্ঘ হাত বাড়িয়ে পিতিমা তাকে টেনে পাশে বসিয়ে দেয়। তারপর স্বাভাবিক হয়ে যায় হাত। নরম আঙুলে কাঁধে আঁকড়ায়। বলে, 'তুমি বুঝতে পার না?'

'পারি।' বটুক এখন প্রেমিক। তার মস্তিষ্কে আবর্তিত হয় শুধু পিতিমা। নিকট স্পর্শের এমন মাদকতা, রক্তধারা যেন জয়ী, উল্লাসধ্বনিতেমথিত, সে পিতিমার কাঁধ ধরে, নারীশরীর প্রেমে আপ্লুত, সম্বিতহারা, টের পায় বোঁটা আলগা পাতার মত কম্প।

'বটুকবাবু আমি তোমার সঙ্গে ভালবাসা করার জন্যে এখানে ডেকেছি।'

মেয়েমানুষ শরীর সমর্পণ করে। আলগা নয়, ভাসমানতায় এক গাঢ় আশ্রয়ে। তারপরই কাঁদে, 'বটুকবাবু, আমার মরতে ইচ্ছে করছে। মার বটুকবাবু, আমাকে দলেপিষে মেরে দাও। আমি যে আর পারি না।' কান্নার ঢেউয়ে আন্দোলিত নরম উষ্ণ শরীর, যা কি না বটুকের নারী আস্বাদন উন্মুখতা, ক্ষুধিত বাঘের শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে ইন্দ্রিয় শিথিলতাব মত অবসাদ এনে দেয়।

নিমু অনেকটা দূর থেকেই এ দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। বউদির উপর তার কড়া নজর ইদানীং। ঘরে ঝগড়াঝাটি চলছে। বউদি তোয়াক্কা করে না। যখন তখন বেরিয়ে যায়। বটুকের সঙ্গে সম্পর্কের আঁশটে গন্ধও ছড়াচ্ছে। বড়ই অহঙ্কারী। মা-ও বউদিদির বিপক্ষে। হবারই কথা। ছেলেকে খেয়ে ছেলের বউ যদি টগবগে যৌবন নিয়ে ঘোরে তবে কোন মায়েরই-বা সহ্য হয়। বৈধব্য কপাল নিয়ে বউ এসেছে বলেই না পুত্রের অকাল মৃত্যু। নিমুর ভাবনায়, দাদা নিজেই বিয়ে করে দিব্যি সুখভোগ করছিল। মা তার বিয়ের কথা ভাবে না। মাতাল ত কী। মাতাল পুরুষ নয়! দাদার মৃত্যুতে সে কর্তা। চাষ তাকেই তুলতে হয়। সংসার তাকেই দেখতে হয় — দেখবে বই কি। ত বউদি যদি তার দেখভালে আগ্রহ না দেখায়। দাদা থাকতে দৃষ্টি ভিন্ন ছিল- তখন বউদি- এখন তো মেয়েমানুষ। বাপের বাড়িতে যাও নি ভাল কথা। এখানেই থাক। মনে মনে ছবিও এঁকেছিল। যে বিয়ে-থা করবে না। হয়ত একটু সময় লাগবে, তবে মেয়েমানুষ ঢলবে। স্রেফ রাতের বিছানাকে উষ্ণ করা। শরীরের একটা ব্যাপার আছে না। সারাজীবন পার করে দিল বাউরিদের নাদু, তার বউদির সঙ্গে। বউ মরেছে। নাদু এখন ভিক্ষে করে। আর গোপন সম্পর্ক অমন ঢের আছে। দেবর মানে তা দ্বিতীয় বর। দ্রৌপদী অর্জুনের সঙ্গে সব বিয়ে করেনি! বউদির সঙ্গে ইয়ার্কি-ফাজলামি দাদা বর্তমানে হত না। বউদির অবশ্য স্নেহ ছিল। বলত, ঠাকুরপো, মদ খাও কেন বল ত! তোমার দাদা ত মাতাল নয়। বাজে লোকেদের সঙ্গে মেশ কেন? লুকিয়ে পয়সাকড়িও দিত। দাদা মরতে সে ত ভালমানুষ হতে চেয়েছিল। বলেছিল, কিছু ভেব না বউদি, আমি ত আছি। তোমার কোন অসুবিধা হতে আমি দেব না। বলেছিল, বিয়ে-থা আমি করছি না। শেষে বউ এসে তোমার সঙ্গে ঝগড়াঝাটি করবে। দিব্যি দুজনে থাকব। তারপর আরো নিকটবর্তী হয়ে বলেছিল, 'দাদা নেই ত কি! ওরকমভাবে থাকবে। সাজগোজ না করলে তোমার মত সুন্দরীকে মানায়!' কদিন বউদির মন জোগানোর দুরন্ত চেষ্টা, কাছে থাকা, গা ঘেঁষার চেষ্টা, রঙ্গরসিকতা, চাউনিকে শব্দমুখর করা। ত সতী বলে বসল, 'তোমার দাদা নেই বলে ভেবো না, তুমি দাদা হয়ে গিয়েছ। আর বেশি কিছু বলব না।' শুনে মাথায় রক্ত চড়ে গিয়েছে নিমুর। মনে মনে বলেছে, সতীপনা। তবে মনেই শুধু। সাহস করে এগুতে পারে নি। এক বাড়িতে বাস। মাঝরাতে ঢুকলে শিকার আগ্রহে, সতত ওত পেতে থাকলে-মেয়েমানুষ বাঁচাবে কী করে নিজেকে! এ সংক্রান্ত ভাবনা

এবং তার ছকও কয়েকবারই সে নির্মাণ করে। কিন্তু অগ্রসর দুরূহ। মেয়েমানুষের একটা শক্তি আছে, চোখেমুখে, কথায় ব্যবহারে যা ধারাল। এখন বাপের বাড়ি পাঠাতে পারলে বেঁচে যাবে। যাবে না! সুতরাং ভেন্ন হাঁড়িতে থাকুক। তা বলে আধপাগলা একটা মানুষের সঙ্গে তার বউদি ভালবাসা করবে, তা ভাবা যায় না, দেখা যায় না।

এখন ওদের ঘনিষ্ঠতার দৃশ্য দেখামাত্র বিস্ময়ে বাক্য স্ফুট হয় না। ওদের একটা কথাও কানে যায় নি তার। দরকার কী! দু'জনে ত জড়াজড়ি। তার শব্দও পায়নি এতই প্রেম তন্ময়।

'বাঃ। বাঃ। তাহালে এই ব্যাপার।'

ঝোপের ওদিক থেকে গলা বাড়িয়ে নিমু বলে উঠতেই চমকিত দু'জন পরস্পরকে ছেড়ে দেয়। বটুক উঠে দাঁড়ায়। পিতিমাকে দেখে। হৃৎপিণ্ড দাপাচ্ছে।

পিতিমা হাত ধরে বটুকের, 'চল।'

নিমু ঝোপ সরিয়ে আসে, 'খুব যে সতীপনা। ছিঃ ছিঃ। একটা পাগলার সঙ্গে — এ শালারও ত খুব রস। শালাকে মেরে শেষ করে দেব।'

পিতিমা বটুককে আড়াল করতে দু'হাত ডানা করে, 'মেরে দেখ না একবার।'

'ওরে ব্বাস। নাগরের জন্যে খুব দরদ।'

পিতিমা অগ্রাহ্যের ভঙ্গি করে বটুকের হাত ধরে টেনে নিয়ে ঝোপের ওপাশে একেবারে রাস্তায়। যা নিমুকে অপরাধ সত্ত্বেও রমণীর দর্পিত ভঙ্গি আশ্চর্য করে, কী করবে ভাবতে দেয় না। ছুটে সেও রাস্তায় এসে দাঁড়ায়।

'কী ভেবেছ, ছেড়ে দেব? তোমার কীত্তি — গাঁয়ে সবাইকে বলব। দশ জনকে ডাকব। ঘরে সতীপনা এদিকে —।

'পথ ছাড়।'

'লজ্জা লাগে না। আমাদের বংশের মুখে কালি দিচ্ছ। আমি পাঁচজনকে ডাকব।'

'তোমার যা খুশি কর।'

পিতিমা বটুককে পাশে নিয়ে গাঁয়ের দিকে হাঁটে। নিমু বোকার মত দেখে। চেঁচাতে চেঁচাতে পিছন ধাওয়া করলে প্রমাণিত হত, সে হাতে-নাতে ধরেছে। রাস্তায় কেউ নেই। ইস, কী ভুলই না করল। তারপর ভাবল না, ভুল নয়। ঘরের কেচ্ছা সে ছড়াবে না। বরঞ্চ ওই দৃশ্য দেখার ফল সে ভোগ করবে। যতই মুখের জোর দেখাক, অন্যায়ের গ্লানি অনিবার্য। ব্যাপারটাকে চাপা দেবার চেষ্টা থাকবে মেয়েমানুষের মনে। তার জন্যে তার কাছে ধরা দিতে হবেই। না দিলে সে প্রকাশ করে দেবে। মস্ত সুযোগ। একে হারালে হবে না।

বিকেলে চাপাগলায় ঘরের উঠোনের ওদিকে এসে পিতিমাকে ভারী অন্তরঙ্গতার সুরে নিমে বলে 'পাঁচকান করলে নিজেদেরই মুখে কালি ছিটানো হবে। যা করে ফেলছ, তা ত আর ফেরানো যাবে না।' মুহূর্ত নীরবতা। উত্তরের অপেক্ষা। তারপর পিতিমার শক্তমুখে প্রজ্বলিত চাউনি সত্ত্বেও বলল, 'মায়ের কাছে কিছু বলি নাই। ওই আধপাগলার সঙ্গে সম্পর্ক রেখো না। ভাগ্যিস আমার চোখে পড়ল। অন্য কেউ দেখলে কী কেলেঙ্কারি হত বল দেখি। আরে সমাজ সংসার বলে একটা জিনিশ আছে। এমন কর যাতে লোক জানতে পারবে না।' অপরিবর্তিত পিতিমাকে ষড়যন্ত্রীর গলা নিয়ে বলল, 'রাত্রিতে দরজায় খিল দিও না। আমি যাব — বুঝলে

— তোমার ঘরে।'

নিমু রাতে চুপচাপ এসে দরজা ঠেলে। রুদ্ধ। টুকটাক শব্দ বাজাতেও কপাট সাড়হীন। আক্রোশ রক্তকে ঢালউপুড়ে ফেনপুঞ্জ করে। ঘুম আসে না। কতক্ষণে সকাল হয়। সকাল হতেই সে চেঁচাতে থাকে। বউদির সঙ্গে ঝগড়া, মায়েরও যোগদান পড়শীদের ঘরে আনে। জানতে কারো বাকি থাকে না বাসিমুখে, পিতিমার চরিত্র নষ্ট হয়েছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ নিমুর হাতে। বটুক হল সেই পুরুষ, পিতিমার সঙ্গে গোপন দৈহিক সম্পর্ক। এ বউদিকে নিমু ঘরে ঠাঁই দেবে না। কুলকলঙ্কিনীকে ঘর থেকে বের করে দেবে। জমির ভাগ থেকেও বঞ্চিত করবে।

সাংঘাতিক সংবাদ। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা পরে। নারী-পুরুষের গোপন অবৈধ সম্পর্কের কেচ্ছা শোনা এবং আলোচনায় আত্মরতি ঘটে মানুষের। বিস্ময়ের ভঙ্গি, ছিঃ ছিঃ করা, কী 'হ্যাঁ, আগেই সন্দ হয়েছিল, এই ত পুকুরঘাটে সিদিন দেখি হনহনিয়ে বটুক যেছে উদিকে মাগী দাঁড়িয়ে', 'যাব কুথা, পেটে পেটে এত খিপার।' 'বলি, কোথা যাব, কালে কালে কত দেখব' বাক্যমালার বিভিন্ন মুখের নির্মিতিতে চরম হর্ষ অনুভূতি সকালকে চমৎকার মোড়ক দেয়। আলোর চেয়েও বেগবান এই সংবাদ একপাড়া থেকে অন্যপাড়ায় ধাবিত হয়।

দুলাল নন্দীর কাছেও পৌঁছে যায়। সমুর বউকে নিমু গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দিচ্ছে। না, এসে পারে না সে। ভেতরের তাড়না যেন টেনে আনে। কিংবা বহুদূর থেকে শকুনির দৃষ্টির মত সে ভাগাড়ে এক দেহ দেখতে পায়। সংবাদ যে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। যুবতী আধপাগলাকে নিয়ে মেতেছে। প্রেমের রীতি ভারি অদ্ভুত। পিরীতে মজিলে মন কিবা হাড়ি কিবা ডোম। কিন্তু তার ক্ষুধা! পিতিমা আঘাত দিয়ে যে আরো প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ওকে চাইই, তার জন্য মূল্য দিতে হবে তাকে। পিতিমা পক্ষ অবলম্বন করবে সে। বিপদে আঁকড়ানোর জন্য মানুষ বস্তু বিচার করে না।

নিমেকে ঘরেই পায়। বাঁশের মোড়ায় বসে দুলাল আত্মীয়তার ঘনত্ব নিয়ে বলে, 'কী সব শুনছি, ঘরের বদনাম ছড়াচ্ছিস কেন! এ যে নিজের গায়ে থুথু ছিটানো হচ্ছে। লোক হাসছে।'

নিমু উত্তেজনার চরমে। ঘর্মাক্ত কপাল। দুচোখ রক্তিম। স্বর তার উঁচু তারে বাঁধা। পিতিমার অদ্ভুত নীরবতা তাকে উন্মাদ করেছে। দুলালের নিচু স্বর তার প্রতিরোধ করে না। সে সমান দাপটে বলে যায়, 'লোক হাসানোর কাজ করলে ত হাসবেই। লোক ত কানা নয়। তুমি দাদা এসেছ — ভালই হয়েছে। তোমাকে ডাকতে যেতাম। ওর কোনো অধিকারই নেই দাদার সম্পত্তিতে। ঘরেও থাকতে পাবে না। আজই বিদেয় হোক। তুমি ব্যবস্থা কর।'

দুলাল আলগা কেশে নিয়ে বলে, 'তা বললে ত হবে না নিমু। বউদিকে ভাগ দিতেই হবে। আইন যা বলে। তবে সম্পর্ক না রাখতে পারিস। ভাগ দিয়ে ভেন্ন করে দে। ডাক তোর বউদিকে। দেখি ওর কী বলার আছে।'

নিমু চেঁচায়, 'নষ্ট চরিত্র মেয়েমানুষকে এ ভিটেতে থাকতে দেব না।'

পিতিমা বেরিয়ে আসে। স্পষ্ট গলায় বলে, 'আমার কিছু বলার নাই।'

'নিমুর অভিযোগ তাহলে তুমি মেনে নিচ্ছ?'

পিতিমার চোখ মাটিতে, 'ও অভিযোগ করার কে?'

'তোমার দেওর ত বটে।'

'দেওর!' ভ্রূরেখা বিদ্রুপ-শাণিত হয় পিতিমার, দুলালের চোখে যেন সুতীক্ষ্ণ তীরের ফলক, 'কে যে কী, সে আমি ভাল করে জানি। সবাইকে আমার চেনা আছে।'

বিব্রত দুলাল, 'তাহলে তুমি কী চাইছ বল ত? রাগ রোষের কথা নয়, আমার কাছে সবাই সমান,' বলে জিজ্ঞাসু চোখে তাকায়।

'আমি ভেন্ন থাকব। আমার ভাগ ফেলে দিক।'

নিমু টের পায় দুলাল বউদিরা পক্ষে। কোথায় বটুকের সঙ্গে কেলেঙ্কারি বিশদ বর্ণনা চাইবে, তা নয়। সে বলে, 'বাঃ ভাগ নিয়ে যা খুশি করবে গাঁয়ে। আমাদের মান নাই।'

'ভিন্ন সংসার হলে কিছু বলার এক্তিয়ার থাকে না। আমি ভাগের ব্যবস্থা করছি।' দুলাল উঠে দাঁড়ায়, 'তাহলে তোমরা ঝগড়াঝাটি আর করো না।'

মা বলল, 'আমার কী হবে। দু'ভাগ হলে ত —।'

'দুই নয়, তিন। তুমি যতদিন বেঁচে থাকবে তোমার থাকবে। তারপর এরা আধাআধি পাবে। আমি আসব সময় করে।' দুলাল ব্যস্ত হয়ে বেরিয়ে আসে, 'আমার কাছে অবিচার পাবে না।' নিমুর দিকে চোখ রেখে শক্ত গলাতে শেষ কথা বলে, ' যা বলে গেলাম নিমু। গাঁয়ে বাস করতে হলে কথা মানতে হবে। নিজের মেজাজে চললে হবে না।'

দুলালের মা পিতিমাকে ঘরে ডেকে পাঠায়। নির্দেশ অবশ্য দুলালেরই। সে নিজে আড়ালে থাকে। দুলালের মা প্রস্তাব দেয় পিতিমাকে তাদের ঘরে থাকার জন্য। শাশুড়ি দেওরের সঙ্গে যখন বনছে না, তখন তার কাছেই থাকুক। এ ঘরে ঢের কাজ। বউমা অসুস্থ। খুকার মা করে বটে, তবে তার বয়স হয়েছে। তাকে ছাড়ানো হচ্ছে না। ঝিয়ের কাজ করবে। পিতিমা ঘরের মেয়ের মত থাকবে সারাদিন। দুলালের মা বলে, 'ভাবিস না বউ, তোকে আমি কাজে লাগাচ্ছি। তোর অভাব কিছু নাই যে খেটে খেতে হবে। ত মেয়েমানুষ সারাদিন করবি কী। কাজে থাকলে মন ভাল থাকবে। আমারও সুসার হবে — না করিস না।'

পিতিমা এ প্রস্তাবে বিস্মিত হয় না। দুলালের চোখে ক্ষুধা এবং তাকে করায়ত্ত করার পরিকল্পনা যে গড়ে চলেছে, চলবে, এ ত তার অজ্ঞাত নয়। পরিষ্কার 'না' করে সে দেয় না। বলে, 'ভেবে দেখি।' বস্তুত দুলালকে এখন প্রয়োজন। ভাগাভাগিতে তার পক্ষ টানছে। অধিকার বর্তে না গেলে ওই মানুষ শত্রুতা করতে পারে।

বটুকের সঙ্গে দেখা হতে পিতিমা বলল, 'কী খুব ভয় ধরেছে। আমার দিকেই আর আসছো না তুমি!'

'ভয় কিসের লেগে হবে।'

'গাঁয়ের লোকে ছিঃ ছিঃ করছে না?'

'করছে নাকি? কৈ? ছিঃ ছিঃ কেনে করবে? কী দোষ করেছি!'

'তোমার মনে হয় না বুড়োশিবের ওখানে দোষ করেছ!'

'না।' বটুক মাথা নাড়া দেয়, 'তুমি কাঁদছিলে। আমার কষ্ট হচ্ছিল।'

'শুধু আমার কষ্ট দেখেছ — আর কিছু দেখ নাই।' এই আমাকে —। যখন জড়িয়ে

ধরলে। দেখ, এই বুকে।'

বটুক চোখ নামায়। বলে, 'তোমার জন্যে আমার শরীরে কেমন যেন হয় এখন। কাছে যেতে মন টানে। আর জানো, কাল রাতে আমি দেখলাম, তুমি আর তিলডাঙা এক।'

পিতিমা হাসল, 'তোমার মাথা থেকে এখনো তিলডাঙা যায় নাই।'

'উহুঁ। যাবে কী করে। কেউ যে চষে না।'

'তোমার ঘরের লোক কী বলছে, ওই বুড়োশিবতলার জন্যে। আমার সঙ্গে তোমার — ।'

'বউদি বলছিল,' ঠাকুরপো, তুমি পিতিমা ডাকলেও যাবে না। দাদা কিছু বলে নাই। তবে মা বলছিল, বিয়ে দে বটুকের। জানো, তোমাকে ওরা বলছিল, খুব খারাপ বট।'

'তুমি বিয়ে করবে?'

'না। যেই বলুক, তুমি খারাপ লও। আমি জানি। বুঝতে পারি।'

'কেনে বটুকবাবু? কেনে বিয়ে করবে না? কার জন্যে! আমার জন্য?' পিতিমা যেন বিয়ের প্রসঙ্গেই আটকে থাকে। বটুকের কথা শুনতে চায়।

'ঠিক বলেছ। তোমার জন্যে!'

পিতিমা পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। তারপর গাঢ় স্বরে বলে, 'আমি তোমার কে বটুকবাবু। উহুঁ, তুমি জানো না। আমি বলে দি—ভালবাসা। ভালবাসা।'

বৃষ্টি হয়। বৃষ্টির চেয়ে ঝড় বেশি। দু-একদিন অবশ্য প্রবল বর্ষণ। তবে বর্ষা না। তার গন্ধ কিন্তু এই বৃষ্টিপাতের মধ্যে ছড়ায়। বৃষ্টি নির্ভর চাষযোগ্য এ ভূমি। অবহেলা একেবারে সয় না। ঢালের জল তরতর করে নেমে যায়। গ্রীষ্মের দীর্ঘ পিপাসার্ত চঞ্চু শুষতে থাকে শেষ রসটুকু। ফলে মানুষের প্রচণ্ড তাড়া চাষের ব্যাপারে। ধুলোমাটিতে বীজ বপন করা হয়। কাদা জলের অপেক্ষায় থাকলে আফড় অর্থাৎ বীজ গাছ বড়সড় রোপণযোগ্য হয় না। সময়ও থাকে না। চারিদিকে বীজতলায় তাই ব্যস্ত হয়েছে মানুষ।

পিতিমার ভিন্ন সংসার। দুলাল ভাগ করে দিয়েছে জমি। সে দরখাস্ত সইও করিয়েছে। সেলাইয়ের ট্রেনিং। দুলালের ঘরে পিতিমা এখন যায়। ওর মায়ের দু-একটা কাজ করে দিয়ে আসে। তবে কিনা সম্পূর্ণ দায়িত্ব সে নেবে না। দুলাল বড়ই উৎফুল্ল। সে ধৈর্যকে শক্ত হতে বলে। জালে ধরা পড়বেই মেয়েমানুষ। বুনুনি যদি ঠিকঠাক হয়, সুতো শক্ত হয়। ফেঁসে যাওয়া দুষ্কর। দুলাল জানে, মায়েরও আগ্রহ আছে পিতিমার উপর। কেন? সে কী দুলালের জন্যে? মায়ের চোখে ধরা পড়েছে সে! নাকি ঘরের, সংসারের কাজে বীতশ্রদ্ধ মা, নিতান্তই একজন সাহায্যকারিণী পেয়েছে, সেটাই যথেষ্ট মনে করেছে।

তবে বন্দনা বুঝি টের পেয়েছে। মেয়েমানুষের এটা অতিরিক্ত একটা ইন্দ্রিয়ের সচেতনা। তাতে টুং টাং বাজনা বাজে। আপন পুরুষের শরীর থেকে সে অন্য নারীর গন্ধ পায়। কাছাকাছি না হলেও বন্দনার সঙ্গে ত শরীর সম্পর্ক নেই তবু সে পেয়েছে। তার মানে বাতাসে বয়ে এনে দেয়। এতই উগ্র সেই ইন্দ্রিয় শক্তি। না মুখে বলে নি। তবে চুল বাঁধতে পিতিমা যেতে বন্দনা বলেছে, তার যত্ন করার চেয়ে নিজের যত্ন করলে ভাল হয়। তার আর কী আছে! দুলাল তার ঘরে ঢুকতে বলেছে, পিতিমা, আসে নি। জিজ্ঞাসার আগেই। ত তাতে দুলালের কোনো যন্ত্রণা

নেই।

বটুককে এখন দাদা রাম চাষের কাজে ব্যস্ত রেখেছে। অন্যত্র নজর দেবার অবসরই নেই। ত সে নজর না দিক, পিতিমা দেবে। সে সামনে দাঁড়াবেই, হাসবে, এমন কী পুরনো পুকুরের মাঠে সার ফেলার সময় এসে বলবেই, ওমা, সারাদিন কী কর। তারপর বটুকের যে যন্ত্রণা, তিলডাঙা সংক্রান্ত নিষ্ফলতা, চাষ হল না, মা জননী মাটির কান্না মুছল না, আবার সে সামনে দাঁড়িয়ে যদি বলে, কী হল বটুক, তুমি কথা রাখলে না — সে কথাটাও তুলবেই। আর ওমনি বটুকের বুক হু হু করে উঠবেই। সে পিতিমাকে দেখবে। বুকের আঁচল ঢাকা অমন স্তনশীর্ষ অমন চিবুক, অমন মসৃণ পেলব গলা, নরম লতার বাহু, দুটি নিবিড় চোখ তাকে আবার ধাবিত করবেই। কোনো নিষেধ কোনো ভয় কোনো সঙ্কোচ এসে আড়াল করবে না ওই দৃশ্য। তখন বটুককে ত বলতেই হবে, 'পিতিমা আমি কী করি।'

'তুমি শুধু আমার পাশে থাকবে। আমি করাব—তুমি করবে। বটুকবাবু কেউ তোমার কথা শোনে নি। কেউ তোমার মনের আশা পূরণ করে নি। আমি করব। তিলডাঙায় চাষ হবে। পাঁচকাঠা ভুঁই আমার ভাগে। একেবারে গোঁসাইদহের পাড়ের নিচে। আমি দেখেছি। আলের রেখা আছে। কোদাল নিয়ে তুমি আল টানার ব্যবস্থা করবে। তুমি মাটি কাটবে—ঝুড়ি মাথায় নিয়ে মাটি আমি ফেলব। তারপর চাষ হবে।'

'সত্যি। সত্যি। কিন্তু আমরা পারব!'

পিতিমা চোখ উজ্জ্বল করে বলল, 'খুব পারব। আমি রয়েছি না। বুঝলে আর ত কেউ চষবে না। আমাদের ফসল গরু ছাগলে নষ্ট করতে পারে। আমরা বেড়া দিয়ে দেব।'

'পিতিমা তুমি কত ভাল।'

রাগ করা মুখ পিতিমার, 'সে ত তুমি বুঝলে না!'

'ইস, বুঝি নাই। কে বলেছে!' বটুকের দু-চোখ নেচে ওঠে উল্লাসে। মাথা ঝাঁকায় সে। বালকের মত সরলতা তারপরই,' কিছু বোঝে না। একদম বোকা! কী বোকা!'

পিতিমা হেসে ফেলে, 'তাহলে ঠিক হল। কবে কোদাল নিয়ে যাবে?'

'আজই। এখনই। আনব কোদাল?'

পিতিমা মুখে আঁচল চাপা দেয়, 'পাগল কোথাকার। কাল—কাল আমরা মাটি কাটব।'

বটুক মাটি কাটছে, পিতিমা কোমরে কাপড় বেঁধে সেই মাটি ফেলে আল টানছে এমন দৃশ্য, একজন দেখে, বাউরিপাড়ার ভোলা, কোমরে হাত দিয়ে তার জিজ্ঞাসা, তারপর আর একজনের চোখে পড়া, সামনে এসে দাঁড়ানো, পেহ্লাদ, সেই থেকে অভয়, জগা, ধনা—সংবাদ দ্রুত গ্রামের এক কোণ থেকে অন্য কোণ বরাবর ছোটাছুটি করতে বেশি সময় নেয় না। প্রতিক্রিয়া শুধু বিস্ময়ে কিংবা পাগলের পাগলামি বোধে সীমাবদ্ধ থাকে না। কার জমিতে আল টানছে! তার অংশ নয় ত। আন্দাজে আল বাঁধে কোন অধিকারে। নিমু সে যে মিথ্যে বলে নি, দেখ সম্পর্ক, কেমন পিরীত, এটা ঘোষণা করে বটে, তবে জনমানসে পাত্তা পায় না। শুধু সদুজেঠী গালে হাত দেয়, 'কালে কালে কত দেখব, তু ঠিক বলেছিলিস বাবা। মাগী মাটি ফেলছে। যেন মাগ ভাতার। তাই দেখতে ছুটছে সবাই। কলিকাল ইকেই বলে।' যা হোক ভিড় জমে যেতে দেরি হয় না। জমিটা সে সমুর তাতে কোনো সন্দেহ থাকে না। আকাশ পরিষ্কার। মেঘ বাদলা নেই। রোদ উঠেছে তুখোড় ঝলকে, প্রচণ্ড তাপ নিয়ে। মাটি পরশুর

বর্ষণে যথেষ্ট ভেজা। জায়গায় জায়গায় জলও জমে আছে। ওদিকে মানুষ তবু গ্রাহ্য নেই পুরুষরমণীর। আল-টানুনির কাজে বিরতি দিচ্ছে না।

ধনা ভিড় থেকে সরে এসে নিজের জমিটার কাছে দাঁড়ায়। হুঁ, এটাই। আলের চিহ্ন রয়েছে বটে। সে টেনে নেবে। আপত্তি যে করবে, সে আমিন আনুক। তার বয়ে গিয়েছে। সে লাঙল মারবেই। আজ আর হবে না, কাল কিংবা পরশু। জগা পাশে এসে 'কি দেখছ' জিজ্ঞাসা করতেই মনের কথাটা ধনা বলে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে নদী স্রোতের মত জগাও যেন ভাসে, তারও ত জমি আছে, ওই দিকটায়, সে-ও লাঙল দিয়ে রাখবে, আল টানবে। ঠিক কথা, যার গরজ সে মাপজোক করুক। কারো জমি ঢুকে গেলে সে ছেড়ে দেবে। ঝগড়াঝাটি করবে না। ওদিক থেকে বিশু প্রহ্লাদ এসে দাঁড়ায়। জলতরঙ্গ তাকেও সমভাবে ভাসায়। তার ধর্মই ত এই। ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়া। বস্তু বিচার করে না। স্রোতমুখে পড়েছ কী তার এক্তিয়ারে। এবং এই স্রোত দিব্যি গাঁমুখী হয়ে যায়, তেতুঁলতলায়, ঘরের উঠোনে, রাস্তায়, ভুষণ মুদির দোকানের সামনে তিলডাঙার জমির অধিকারী, চাষীবর্গ সকলেই ভাসে। তখন আধপাগলা বটুক এবং পিতিমার কাণ্ডটায় কোনো বিস্ময় নয়, মজা নয়, অংশভাগী হয়ে মিশ্রিত হওয়ার কলরোলে বিচ্ছিন্নতা নামে না, কেনো শব্দ থাকে না।

সংবাদ, দুলাল নন্দীকে চমকিত করে। তিলডাঙায় চাষে সবাই নেমে পড়ছে। পাকা সিদ্ধান্ত। তাতে ফসল হোক আর না হোক, জলাভাব ঘটুক আর নাই ঘটুক। পিতিমা এবংবটুকের পাগলামি সংক্রামিত সব চাষীমনে। এ সংক্রমণ অপ্রতিরোধ্য। সমষ্টি অসম্ভবকে সম্ভব করে। সমুদ্রকে শোষণ করে। মরুভূমিকে হরিৎক্ষেত্র বানায়। দুলাল রুষ্ট হতে গিয়েও পারে না। তার মধ্যে শিবুর বক্তব্য তাকে মোহিত করে। ছেলেটা বুদ্ধিমান! কী সুদূরপ্রসারী ভাবনা-চিন্তা। মানুষের অজস্র জটিলতার মধ্যে থেকে কেমন নির্মিতি ঘটে এ ধরণের সহজ স্বচ্ছ পথের। যার উপর হাঁটলে পায়ের তালুতে নরম ঘাসের স্পর্শ জোটে, বাতাস সুগন্ধ দেয়। তিলডাঙাকে ঘিরে তার উত্তরণ, খ্যাতিবর্ধন, প্রচার, মহত্ত্ব পরিচায়ক এক কাণ্ডকারখানার সৃজন হতে পারে, উহুঁ, সে ত ভাবতেও পারত না। পেরেছে শিবু। না, ছেলেটার জন্যে কিছু করে দিতে হবে। ত সে পারে। শিবুর এইমাত্র উজ্জ্বল চোখ করে বলা কথাগুলো আবার শুনতে ইচ্ছে করছে।

'কত বড় সুযোগ বোঝ দুলালদা। তুমি গাঁয়ের মাটিতে মন্ত্রী আনতে পারছ। অরবিন্দদাকে সভাপতি করতে পারছ! মাটিতে চোট দিয়ে মন্ত্রী উদ্বোধন করবেন। মিটিং হবে। মাইক বসবে। পার্টির জেলান্তরের সকলের নিমন্ত্রণ। মাংস, না খাওয়া-দাওয়াটা জম্পেশ চাই। প্যাণ্ডেলও করতে হবে তিলডাঙায়। অচাষ জমিকে তুমি চাষযোগ্য করছ। জমি চাই। মাটি কম। মানুষ বেশি। কিন্তু পড়ে রয়েছে অজস্র মাটি। তার যথার্থ ব্যবহার দেখানোর দরকার। তুমি তাই করছ। ফলবতী করছ জমি। উৎপাদন বাড়াচ্ছ দেশের। সরকার এটাই চাইছে। অধিক ফসল, কৃষিবিপ্লব সবুজ বিপ্লব। তুমি এটাকে ধর দুলালদা। সেই চাষ হবে, মাঝখানে তুমি থাকবে দূরে। এতে তোমার ক্ষতি। তুমি লিডারশিপ নিয়ে নাও। প্রচার হবে তিলডাঙার চাষব্যবস্থা কায়েম করলে তুমি। তোমার একটা বিরাট ইমেজ তৈরি হবে। পার্টি এবং পাবলিকের কাছে।'

চমকিত দুলাল শিবুর বুদ্ধি চাতুর্যে। কী চমৎকার ভেবেছে। অথচ সে রুষ্ট হচ্ছিল সংবাদ পাওয়া মাত্র। হাতের মুঠোয় সন্দেশকে সে পাথরভ্রম করেছিল। ব্রেন কী ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে তার। তবে নিজের অবস্থাটা শিবুকে বুঝতে দেওয়া অনুচিত। প্রবল আলোড়ন অভ্যন্তরে

থাকুক। চিন্তান্বিতের ভঙ্গি করে ক্ষণকাল শিবু মুখ পর্যবেক্ষণই বিধেয়।

'কী ভাবছ তুমি আবার।'

'ভাবছি, আমার ভাবনাটার সঙ্গে তোর ভাবনা কী করে মিলে গেল। অবিকল ওরকম মতলব আমারও মাথায় ঝট্ করে এসেছিল'।

শিবু হজম করে, হাসে, বলে, 'তোমার সঙ্গে ঘুরছি। প্রভাবিত ত হবই।'

'কাজটা বিরাট। পরিশ্রম সাপেক্ষ। অর্থব্যয়ও আছে।'

'ছিপে মাছ ধরতে গেলে টোপ দিতে হয়। যেমন মাছ তেমন টোপ। টোপের খরচটা ধরলে মাছ ধরা হয় না। শোন দুলালদা, পাবলিককে বুঝিয়ে দিতে হবে, তিলডাঙাকে চাষের ভূমি করার চিন্তা তোমার দীর্ঘদিনের। সুযোগ পাচ্ছিলে না। বোঝাতে হবে গাঁয়ের মানুষকে তুমিই আগ্রহী করেছ। তোমার মাথাতেই প্রথম এসেছে। পঞ্চায়েতের মিটিং ডাক। সব মেম্বারদের বোঝাও। বোঝাও কী, কাজে নামাও।

'মোটামুটি কত খরচা হবে, তার একটা এস্টিমেট কর ত। আমি এ দিকটা দেখছি।'

'কিছু ভেব না তুমি। সে আমি করে ফেলছি। তোমার বক্তৃতাটা আমিই লিখব।'

দুলাল নন্দী হাসল, 'ওটা ত তোকেই করতে হবে। হ্যাঁরে, লেখালেখি চালিয়ে যাচ্ছিস ত। কবিতা লিখিস ত এখনো।'

'হ্যাঁ। বক্তৃতাটা শুনবে, কিরকম হবে।' শিবু গলা খাঁকরি দেয় দুবার। তারপর শুরু করে, 'বন্ধুগণ, আমার প্রিয় গ্রামবাসী, উপস্থিত জননেতাবৃন্দ, মাননীয় মন্ত্রীমহোদয়, আজ আমরা এক মহান কর্মের উদ্বোধনে ব্রতী হয়েছি। পৃথিবীতে অসম্ভব বলে কিছু নেই। মানুষের দ্বারা সব কিছুই সম্ভব। না, একক মানুষে নয়। সমবেত মানুষে। সংহতিতে। এক মন এক প্রাণ হতে হবে। তবেই নিজের মঙ্গল গ্রামের মঙ্গল দেশের মঙ্গল। বিবাদ-বিসংবাদ ভুলে হাতে হাত মিলিয়ে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে প্রগতির পথে। দেশের দরিদ্র ভাইবোনেরা, ক্ষুদ্র প্রান্তিক চাষী, খেতমজুর, মধ্যবিত্ত — সবাই শিক্ষার আলোর সঙ্গে অন্নের সুখ ভোগ করুক— এই আমাদের কাম্য আমাদের সাধনা আমাদের কর্তব্য। বন্ধুগণ, তিলডাঙা বন্ধ্যা হয়ে পড়ে আছে বছরের পর বছর। পাষাণী অহল্যাভূমিকে জাগাতে হবে। প্রাণপ্রতিষ্ঠা চাই। বন্ধুগণ, তাই আমরা সমবেত হয়েছি। আমার কতদিনের ইচ্ছে আজ পূরণ হচ্ছে আপনাদের আশীর্বাদে। তিলডাঙাকে দেখে আমার চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠত বেদনায়। না, কাউকে বলি নি। ভেবেছিলাম এ জমিকে সুফলা করার সুযোগ যেদিন আসবে — হ্যাঁ এসেছে সেই সুযোগ। আজ —।'

দুলাল হেসে ফেলে, 'শিবু থাম। ঢের হয়েছে।'

'মুখে বললাম। লিখলে অনেক ভাল ভাল শব্দ বসবে।'

'কিন্তু এসব করতে ত সময় লাগবে।'

'বেশি সময় নিও না। বড় জোর এক সপ্তাহ।'

ছয়

শিবুর চমৎকৃত করা বুদ্ধিতে দুলাল মাথায় মুকুট করে পরে নেবার কর্মটি বুদ্ধিমানের মত শুরু করে দেয়। তিলডাঙায় চাষ কায়েম উদ্যোগপর্বে পঞ্চায়েতের ভূমিকা নেওয়া উচিত এমন বক্তব্যে অন্য সদস্যদের জরুরী মিটিং ডেকে অবহিত করে অনুমোদনও পেয়ে য়ায়। অনুষ্ঠানের সভায় পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে বিগত কর্মগুলির সাফল্য এবং গ্রাম উন্নয়নে পঞ্চায়েত সদস্যরা যে একনিষ্ঠ সেবায় নিবেদিত তার প্রচারও থাকবে। জেলান্তর শুধু নয় পারলে জেলার মন্ত্রীটিকেও আনা হবে। তিনিই লাঙলের বোঁটা ধরে কয়েক হাত হাল দিয়ে সূচনা করবেন। তারপরই এ পাড়া ওপাড়া ঘুরে সমর্থক পেতেও তার দেরী হয় না।

গ্রামীণ জনমানসে বিষয়টির প্রচারে বিস্ময় নেই। পঞ্চায়েতের বহু উদ্যোগ অধিকারই এতকাল অজ্ঞাত ছিল। ইউনিয়ন বোর্ড ভেঙে পঞ্চায়েত ঠিক কথা, কিন্তু তার দায়িত্ব এবং দাপট, অনুদান এবং ঋণদান, শ্রমদিবস সৃজনা এবং সাংস্কৃতিক প্রেরণা, সাক্ষরতা অভিযান এবং ক্রীড়ানুষ্ঠান ইত্যাদির বহুবিধ শাখাপ্রশাখা চর্তুদিকে ছড়াতে পারে কে জানত। তিলডাঙায় একটা অনুষ্ঠান হবে, গাড়ি করে নেতৃবৃন্দ আসবেন, সভাধিপতি, মন্ত্রী, মান্যগণ্যজন, বক্তৃতা হবে—এতে উৎসাহ না থাক ভিড় করতে পারার মধ্যে আনন্দ যাপন তো হবে। তারপর তিলডাঙা শস্যশালিনী হলে গাঁয়ের মানুষেরই তো লাভ। লাভ বোঝার জন্য অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন কিংবা তেমন বুদ্ধিমান না হলেও চলে যায়।

দুলাল হঠাৎ কেন তিলডাঙা নিয়ে পড়ল, পাগলা বটুকের কথাটা গুরুত্ব পেল এ সম্পর্কে কেউ কেউ ভাবল, উদ্দেশ্য একটা আছে। তিলডাঙার নামে বরাদ্দ অর্থ থেকে লাভ করবে। কাজটা সম্পূর্ণ হবে কী না সে সন্দেহও থাকল।

ধনা বউ লক্ষীকে বলল, 'বুঝছ কিছু?'

'কী বুঝব?'

'গাঁয়ে এখন বোঝার মত একটাই। তিলডাঙাতে মিটিং।'

'হ্যাঁ। তুমি ত চাষ হবে না শুনে কেঁদে ফেলিন ছিলে। দেখ পঞ্চায়েত ত মাতল উরাই সব খরচা দিবে। পঞ্চায়েতের [illegible] ঢেক ক্ষমতা—বুঝেছ।'

ধনা বলে ,'আমার [illegible]'

'কাজ হছে — আবার সন্দ।'

'জগা শুধুছিল। রামও বলল, মিটিং হবে, মন্ত্রী আসবে। কিন্তু জমির—'

লক্ষী বলে, 'বুদ্ধি কী ঘটে নাই? উরা এসে দেখবে তবে ত ব্যবস্থা হবে। পেধান সে জন্যই একেবারে টেনে আনছে উদের। বুদ্ধি আছে।'

ধনার ঠোঁটে কোন উত্তর আসে না।

বটুক ক'দিন চরম ব্যস্ত। যেন তিলডাঙ্গায় চাষ উদ্বোধন প্রচার তারই দায়—'শুন, শুন, সবাই যাবে তিলডাঙাতে, মিটিং হবে, চাষ হবে, পটল মুলো আলু বেগুন ফলবে, তিলডাঙা খলখলিয়ে হাসবে, কুনু কাজ সেদিন রাখবে না।' হাঁক দিয়ে ফেরে এপাড়া ওপাড়া। দুলালের পায়ের ধুলো নিয়ে বলে, 'তুমি রাজা বট গো। তুমি রাজা বট গো। তুমি কথা রেখেছ গো।'

দুলালের মৃদু হাসি ওষ্ঠে। বটুকের মাথায় আর্শিবাদের হাত রাখে, 'আঃ পাগলামি করিস না—আমি কে! তোরা করাচ্ছিস। তুই তো তিলডাঙা কন্যার কান্না শুনেছিলিস।'

'কিন্তু কান্না মুছার খেমতা ছিল না আমার। তুমি মুছুলে-।

'কাউকে না কাউকে তো মুছতে হবেই। কী বল তোমরা? ওরে আমি চাই গাঁয়ের সব মানুষ হাসুক, সবার দুঃখ ঘুচে যাক। সীমিত ক্ষমতায় কতটুকু পারছি বল। পাশেই গোপাল, শঙ্কর, ভজুর বউ দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ঘাড় ঘুরিয়ে তাদের দিকে বলা। নইলে পাগলাকে কেউ লাই দেয়। এমন সময় সাইকেলে অবনী। ব্যস্ততা নিয়ে বলে, 'আরে অবনী—দাঁড়া। তোকে তো দেখতেও পাই না, শুনেছিস তো সব।'

অবনী দাঁড়ায়। বলে, 'শুনব না। এমন অভিনব ব্যাপার।'

'একটা মহৎ উদ্যোগ!'

'মহৎ তো নিশ্চয়ই। তবে আমার ধারণা ছিল, একটা নতুন কিছু করলে তার আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়। পুরোন বাড়ি সারানোর মত পুরোন চাষ ব্যবস্থাকে ফেরাতে যে এমনটি হয় তা জানতাম না।'

'ত্রুটি বের করাটা তোদের স্বভাব হয়ে গিয়েছে। তুই আসবি না?'

'আসব বৈ কী। তোমার একটা কীর্তির আনুষ্ঠানিকতার দৃশ্যটা তো দেখতে হবে।'

'তুই না হলেও গাঁয়ের সবাই খুশি।'

'কাজ হলে আমিও খুশি হব দাদা।'

দুলাল আটকাতে চায় না। অযথা খোঁচা দেবে। মুরোদ নেই। বড় মায়া হয়। বেচারা। বলে, 'আসবি। আমি সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চাই। যা—কোথা যাচ্ছিস!'

'এই তো—।' উত্তর দেয় না অবনী। সাইকেলে চাপে।

বটুকের এই কথোপকথন শোনায় কেমন যেন সন্দেহ হয়। অবনী অখুশি। গাঁয়ের ভাগনে। ওই ষষ্ঠী চাটুজ্জের। তো বলতে কী ছেলেবেলা থেকে এ গাঁয়েই মানুষ। মামার ঘরই ঘর। লেখাপড়া শিখেছে। লোকের উপকার করে। পঞ্চায়েতের দোষ ত্রুটি নিয়ে কথা বলে, মিটিং করে। কিন্তু ওর দিকে লোক কোথা? ডোম পাড়ার ব্যাঙ, মুচিপাড়ার দাশুরা আর ভুমনা মাঝিরা, আর—। ভোটে হেরো। তা হোক। তিলডাঙায় চাষ হবে শুনে আহ্লাদ কেন নেই? অমন গোমড়া মুখ কেন?

সেই দিনই অবনীকে ধরতে বটুক পিছু নেয়। লাল শাড়িপরা ননী বানুজ্জের ভাগনিই বটে। কী যেন নাম! মনেও থাকে না ছাই। দিব্যি দু'টি—ঘোরে। ত বিয়ে করবে নিশ্চয়ই। আহা, অবনীর একটা কাজ হোক। বটুকের স্নেহে কিংবা আগামী বিয়ের সুরভিত শব্দময় আনন্দ হল্লোড়িত বিয়েবাড়ির রোশনাইয়ের কল্পনায় যেন দু চোখ ভরে যায়। মাটি ভেজা, চারিদিকে বর্ষার ঘ্রাণ। গ্রীষ্ম তপ্ততায় আকাশ হুড়হুড়িয়ে নেমে যেন ধরিত্রীকে স্নান করিয়েও তৃপ্ত হচ্ছে না। এখন অবশ্য ফটফটে। রক্তিম বিকেলের আলো সোনারঙা হয়ে শুয়ে আছে।

বটুক ওদের চেয়ে একটু এগিয়ে আবার পেছনে।
অবনীকে বলতে হয় না। সেই প্রশ্ন করে, 'কিছু বলবে বটুকদা?'
'হ্যাঁ। তিলডাঙায় অমন কাণ্ড হবে। তোমার রাগ কেন?'
অবনী হেসে ফেলে, 'আরে রাগ তো হয়নি!'
'তবে দুলালরাজাকে অমন করে বললে কেনে?'
শিপ্রা বেশ ঝাঁঝালো বিরক্তি দেখায়, 'তুমি আবার দুলালমামার সঙ্গে ঝগড়া করেছ? কতবার বলব বলো ত। এখানে তুমি কিছু করতে পারবে না। মাঝখান থেকে নিজের ক্ষতি হবে। বলেছি না, স্কুলে ক্লার্কের পোস্টটার জন্যে—।'
'দেবে না। নিশ্চিন্ত থাক। আমি করবও না।'
শিপ্রার চোখে যেন আগুন জ্বলে, 'তুমি কত জ্বালাবে অবনী!'
'অনেক। সারাজীবন।' অবনী হেসে বলে, 'বটুকদা তুমি ভুল বুঝেছ। তিলডাঙায় চাষ হোক আমি চাই। এই যে তুমি জোৎস্নারাতে তিলডাঙা কন্যাকে কাঁদতে দেখেছ আমি বিশ্বাস করেছি। শিপ্রাও। বল শিপ্রা, এ নিয়ে আমরা কথা বলি না।'
শিপ্রা বলল, 'বটুকদা, দুলালদাকে ও কী বলছিল?'
'তা বলতে পারব না। কিন্তু রাগ ছিল। দপ দপ করছিল আগুন।'
'ওতেই তো মরেছে।'
'ওতেই বেঁচে আছি এও তো হতে পারে। যাক্‌গে, আমি চলে যাব—আজ কিংবা কাল। পারলাম না কিছু করতে এ গাঁয়ে।'
বটুক প্রশ্ন করে, 'কোথা যাবে?'
'বাঃ গাঁয়ে বসে থাকলে হবে। কাজ কর্ম করতে হবে না। দেখি কোথায় পোস্টিং হয়? তবে রাইটার্সেই হবে।'
শিপ্রা দ্রুত ঘাড় ফেরায়, 'তার মানে!'
'পি. এস. সি'র চিঠি এসেছে।'
'ওমা, এতবড় খবরটা আমাকে বলনি। জান না, আমি ওর জন্যে কত উন্মুখ হয়ে আছি।'
'ওর জন্যে উন্মুখ। আমার জন্যে নয়?'
'তোমার জন্যেও।'
'তোমাকে বলতাম। তার জন্যেই তো ডেকে আনা।'
'তোমার মধ্যে আনন্দ নেই কেন অবনী!'
'জানি না।'
'গাঁয়ে বসে রাজনীতি করা হবে না—তাই।'
'আসলে কী যে করছি। এমন একটা দল যার—। যাক্ গে, ছাড়তেও পারি না— কিছু করার মুরোদও নেই।'
'তোমাদের পার্টি ভাঙার পর পক্ষ নেওয়ার অঙ্কটা ভুল করেছ।'
অবনী নিরুত্তর থাকে। তারপর বটুকের অস্তিত্ব সম্পর্কে সজাগ হয়ে যায় যেন সহসা, 'আরে বটুকদা, আমি মিটিংয়ে থাকব। সত্যি আমার আনন্দ হয়েছে।'
শিপ্রা বলল, 'আমারও। দুলালদার সঙ্গে আর ও ঝগড়া করবে না। ভেবো না।

বটুকের যুবক যুবতীর সংলাপ, তাদের ভাবভঙ্গী, কথা, তিলডাঙা সম্পর্কে উষ্মা, হর্ষ, অবনীর গাঁ ছাড়া, বিষণ্ণতা, শিপ্রার মুখের আলোময়তা কেমন যেন মাথায় গোলগাসে একটা পাক নিয়ে আবর্ত্তিত হয়। সে থমকে দেখে। ভারী ভাবনা হয়। তবে মুহূর্তের জন্যে। পশ্চিমে বিশাল আকৃতির সূর্য ক্রমে দিগন্তলীন হচ্ছে। অনেক দূর পর্যন্ত এই ভূখণ্ডের মৃত্তিকার যে চড়াই উতরাইয়ের ঢেউ, তাতে বসান বৃক্ষ, ধানক্ষেত, ডাঙা, দিঘি, টুকরো বনভূমি কী গ্রাম চিহ্ন, যতটুকু ধরা পড়েছে চোখে, সকলই প্লাবিত, যেন তাকে বিহ্বল করে রাখে। সব ভুলে বটুক শুধু দেখে—দেখে।

আকাশ বড়ই সদয়। তিলডাঙা চাষযোগ্য করার আনুষ্ঠানিকতায় যেন তারও সম্পূর্ণ সায়। সে পরিচ্ছন্ন করে রেখেছে নিজেকে গভীর নীলিমায়। চমৎকার আলো ঝলমলে দিবস। সূর্যের প্রদীপ্ততা সহনীয় পর্যায়ে। দু'দিনের বৃষ্টিপাত ধরিত্রীকে গ্রীষ্ম মুখরতায় নিবৃত্ত করেছে। এখন তিলডাঙায় বাঁশের খুঁটিতে ত্রিপল, তক্তা উঁচু করে মঞ্চ, মাইক চারটে, বসার জন্যে মান্যগণ্যদের সারিবদ্ধ চেয়ার, লাইন দিয়ে স্কুল থেকে বয়ে আসা বেঞ্চি। প্রচার আশেপাশের সব গাঁয়ের মানুষকে টেনেছে। ভিড় এবং কথার ঝড় বইছে। সংগঠনে পোক্ত দুলাল কাজের দায়িত্ব বিন্যস্ত করে দিয়েছে। জেলান্তরের নেতারা আসছেন, মন্ত্রী আসছেন, তাদের আপ্যায়ন, মালা চন্দন শঙ্খধ্বনি কোনটারই বাদ নেই। এমন কী মন্ত্রীমহোদয় যে হল কর্ষণ করবেন, তার জন্য মসৃণ লোমের স্বাস্থ্যবান বলদজোড়া, নতুন লাঙল, হালের ব্যবস্থাও হয়েছে। সব ঠিকঠাক না হওয়া পর্যন্ত দুলালের ব্যস্ততা এবং নির্দেশ সমানে চলছে। মূল ব্যক্তি যে সে এটা নির্দিষ্ট করাই মূল কাজ।

কিন্তু তার বক্তব্যেই, শিবুর অমন অলঙ্কার সমৃদ্ধ ভাষণের বয়ানে, তিলডাঙা কন্যার কান্না সে নিজে শুনেছে, মাটি মা ক্রন্দনরত দেখেই তার এ উদ্যোগ এ ঘোষণায় বটুক প্রতিবাদ না করে পারে না। বটুক দাঁড়িয়ে চেঁচায়, 'মিথ্যে কথা। মিথ্যে কথা। দুলাল রাজা তিলডাঙা কন্যে দেখে নাই। বিশ্বেসও করে নাই।'

ওমনি শামু বসিয়ে দেয়, 'বস। বস।'

বটুক বসবে না। ভাগ্যিস্ দূরে, তাই মঞ্চ বরাবর শব্দ পৌঁছায় না। মাইকের শব্দও ধামাচাপা দেওয়াতে সহায়তা করে।

রাম লোক ঠেলে এসে ভাইকে ধরে, 'আয়। বেরিয়ে আয়।'

'না। মিথ্যে বলছে। মিথ্যে বলছে। কিছু জানে না।'

'আঃ বটুক। খিপামি করিস্ না। ঘর চল।'

'না।'

'টেনে নিয়ে যাও। খিপাকে নিয়ে আস কেন?' মন্তব্য করে কে যেন।

রাম টেনেই আনে ভাইকে। বটুক যেতে চায় না। চেঁচাতে থাকে সমানে, 'না, আমি চাষ দেখব। না, চাষ দেখব।'

বটুককে ঘরে ঢুকিয়ে রাম বলে, 'একে নিয়ে কী করি বল দেখি।'

বটুক বড় বউয়ের কাছে হাউমাউ করে সব শোনায়।

বড়বউ বলে, 'জানি, ঠাকুরপো—সব জানি। তুমি শান্ত হয়ে বস।'

বটুকের কথা বন্ধ হয়ে যায়। বুকে ব্যথা জাগে। সে মিটিংয়ে থাকতে পেল না। তার কান্না আসে। ক' দিন কম খাটনি তো তার যায় নি। খুশিতে নৃত্যরত মন এতদিন তাকে কোনো কাজ করতে দেয় নি। সে তিলডাঙা কন্যার কথা রাখতে পারল, এ কী কম আহ্লাদ! কিন্তু দুলালরাজা কেন মিথ্যে বলল। কেন বলে, গাঁয়ে সবাই সুখে শান্তিতে থাকে। ঝগড়া বিবাদ নেই। কেন বলে সবার ঘরে অন্ন। কেন বলে, পঞ্চায়েত সবাইকে টাকা দিয়েছে। কেন বলল না, তিলডাঙাকে সে দেখেছে, সে বটুক! মাইকের শব্দ কানে তার বেজেও যায়। যেন তা বটুকের মর্মমূলে গিয়ে তীক্ষ্ণ সূচিকা মুখে রক্তক্ষরণ ঘটাচ্ছে। কোথা যাবে সে। গাঁ ছেড়ে কোথায় চলে যাবে।

না মিটিংয়ে যাবে না। ঘরে দম আটকে আসছে। বিপরীতে ধূমলভাঙালে সে যাবে। একা বসে থাকবে। বড়বউ ও ঘরে। রাম আবার মিটিংয়ে। সে বেরিয়ে পড়ল।

'ও বটুকবাবু, চলেছ কোথায় হনহনিয়ে! দাঁড়াও। দাঁড়াও। আমি কী ছুটতে পারি!'

পিতিমা! আশ্চর্য! অত মানুষে তাকেই নজর রেখেছিল। তার জন্যে বেরিয়ে এল। সে থমকায় ঘাড় ফিরিয়ে। পিতিমার মুখ দেখে। মমতার বিকিরণ যুবতী মুখে। আয়তচোখে বেদনার ঘনত্ব। দেখামাত্র যেন জলে ভেজা গামছাকে কেউ নিঙড়ে দেয়। কান্নার স্রোত নেমে আসে। সে বালকের মত ফোঁপায়। সর্দি টানে, বুক ওঠানামা করে, মুখের মেঘে চোখে বর্ষা নামায়। ভেতরের দুঃখ যেন অশ্রু ধুয়ে নামে।

'এত বড় মানুষ, কাঁদে নাকি? চল। চল। আমার ঘরে চল।'

বটুক না করে না। নির্জন পথ গাঁয়ের।

'তুমি কী মানুষ বল ত! তুমি ত জান সবাই বোকা। বোকা বলেই মিথ্যে কথা বসে বসে শুনছে। শুনুক, তোমার কী। তোমার নাম করল না। তিলডাঙা-কন্যা তোমাকে বলেছিল বলল না। ত কী। তুমি যা চেয়েছিলে, তা হতে চলেছে। ঠিক কি না। তিলডাঙার কান্না মুছল। আর জানো তিলডাঙা জানে, এ সব হল বটুকবাবুর জন্যে। জানে, তোমার ওই দুলালরাজা মিথ্যে কথা বলছে।'

'জানে তিলডাঙা? বুঝতে পারছে?'

'পারছে বৈকী। আর হাসছে। এমনি হাসি। দেখ।' পিতিমা থমকে দাঁড়ায় রাস্তার উপর। কালো পাড় শাদা শাড়ি, শাদা ব্লাউজ, কানে শুধু একটা গোল রিঙ। স্বচ্ছ মুখ। কোনো আভরণ নেই, কোনো প্রসাধন নেই। জুঁইয়ের মত শুভ্রতার অমলিন হাসি এঁকে নেয়।

বটুক মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকে। বলে, 'তিলডাঙার হাসি আমি দেখতে পাব?'

'পাবে বৈকী। ওই যে আমরা মাটি কাটলাম, ওতে ফসল বুনব। তখন দেখবে হাসছে। সবুজ হাসি। হাসির ত নানারঙ। তুমি জান না?'

'জানি। জানি। লাল গোলাপ, হলুদ। সরষে ফুল, হাসে।'

'ঠিক। ঠিক।' পিতিমা মাথা নাচায়।

আচমকা বটুক জিজ্ঞাসা করে বসে, 'কবে জোৎস্না ফুটবে? আজ ফুটবে?'

ভ্রু কুঁচকে পিতিমা জিজ্ঞাসা করে, 'কেন বল দেখি।'

'বাঃ তাহলে তিলডাঙাতে যেতাম। কাজ হয়েছে। ইবার ত দেখা দেবার কথা।'

'দেবে বৈকী।'

'জ্যোৎস্না হোক। আমি তোমাকে বলে দেব।'

'তুমি কেমন করে জানবে।'

পরম বিশ্বাসের সঙ্গে পিতিমা বলে, 'আমিই ত জানব বটুকবাবু।'

দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ কালো হয়ে উঠেছিল। জমাট কৃষ্ণকায় অসুরবাহিনী ধেয়ে আসছিল দুপুরের আলো নিবিয়ে দিতে। মধ্যে মধ্যে বিদ্যুতের চেরা জিভের চকিত ঝলকানি। বটুক মেঘ দেখেই দ্রুত পা চালিয়ে হীড়ের ধারের আফড়ে ভুঁইটা দেখেই ফিরে আসত। কিছুটা হেঁটে উঁচু পিঠ ডাঙা, তারপর শরবন, পাঁচটা তালগাছ পাশাপাশি, নতুন পুকুরের পাড়, গাঁয়ের শুরু ছেলেদের একটা খেলার মাঠ ডিঙিয়ে। পাশে বাঁশবন, মুচিপাড়া। ত খেজুরগাছের কাছে যেতেই আকাশ অণুমাত্র আশ্রয় সুযোগ না-দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। প্রবল বর্ষণের সঙ্গে বজ্রপাত। আকাশের দেবতা যেন তার শাণিত উজ্জ্বল তরবারি ফলকে মেঘকে দু'খান করেই নামিয়ে দিল তীব্র আঘাত। যা কী না খেজুর শীর্ষের সবুজ পাতায়, শুষ্ক ডাঁটিকে, খাঁজকে মুহূর্তে জ্বালিয়ে দিল। তুমুল বর্ষণেও লকলকে অগ্নিশিখা। এদিকে প্রচণ্ড শব্দ এবং অত্যুজ্জ্বল আলোর ঝাপটায় দিশাহীন বটুক অনুভব করল এক প্রবল আঘাত। মাটিতে আছড়ে পড়ল সে। তারপর সংজ্ঞা লুপ্ত। আকাশ তখন সমানতালে ধারাল ধারায় নেমে আসছে মাটি ভেদ করতে। বিদ্যুতের ঝলকানি এবং কাছে দূরে পরপর বজ্রপাতের শব্দ।

বটুকের জ্ঞান হতে সে দেখে, কাদায় জলে পড়ে আছে। আঘাত হানছে অস্ত্রের মত বৃষ্টিধারা। সে ভেবে পেল না, এখানে কেন, আর কী হয়েছিল, এই মাঠেই-বা পড়ে আছে কী করে! নিজেকে অচেনা, দীর্ঘ ঘুমকালের পরবর্তী জাগরণবোধের মধ্যে তার মনে পড়ল সে আফড়ে ভুঁই দেখতে গিয়েছিল। ওই ত গাঁ। বৃষ্টি ধোঁয়ার মধ্যে টলমান পায়ে ঘরের দিকে সে হাঁটতে থাকল। পরে নিজেকে সে আবিষ্কার করল বিছানায়। ঝুঁকে আছে মায়ের উদ্বিগ্ন মুখ, ওদিকে বউদি, দাদা, ভাই ভরত, ভাইপো কুশ।

'কী রে বটুক, ভাল লাগছে এখন।'

বটুক ফ্যালফ্যাল চোখে তাকায়।'

'যা ভয় ধরিন দিয়েছিলিস।'

মা বলে, 'অ বাবা, আমাদের চিনতে পারছিস নাই।'

'মা।'

বটুক আরও কিছু বলতে চায়। ঠোঁট কাঁপে। চোখে জল আসে।

মায়ের শীর্ণ হাত কপালে লাগতেই সে চোখ বোজে আবার। মাথাটা ভারী মনে হয়। কিন্তু কী হয়েছিল তার? ভাবনা জিজ্ঞাসামাত্র দানা বাঁধে না। যেন টুকরো টুকরো আলোককণা জোনাক-ডানা পায়। তারপরই ধোঁয়ার নিবিড় আস্তরণ। সে দু'হাতের সাপটায় সরিয়ে যায়। খুদে পানার সবুজ ছাউনি তোলামাত্র আবৃত করে জলবক্ষ। সে চোখ খোলে।

'মা। আমি উঠে বসব।'

পনের দিন বিছানায়। অসম্ভব দুর্বলতা সুস্থ হওয়ার পরও। বটুক এরপর বড়ই কম কথা বলে। তার চাউনিও পরিবর্তিত হয়েছে। সে গাঁয়ের রাস্তায় অযথা ঘোরে না। চঞ্চলতা বিসর্জিত তার বসে থাকার ভঙ্গি। সে ফেলে আসা দিনগুলিকে নিয়ে ভাবতে গেলেই একই শুভ্র ধোঁয়াচ্ছন্নতা

টের পায়। সে অনুভব করে কিছু হারিয়েছে। কবে যেন। কিন্তু সেটা যে কী মনে করতে পারে না। পুঞ্জ পুঞ্জ সাদা ধোঁয়ার তরঙ্গাঘাত তাকে সে ভাবনায় বড়ই বিব্রত করে। ভাসমানতায় বহু দূরবর্তী করে দেয় অতীত দৃশ্যপট।

ভাইপো কৃশ গুলি খেলে কাকার সঙ্গে। বলে, 'তুমি খেলতে পারছ না আগের পারা।'

বড়বৌ বলে, 'ঠাকুরপো তোমার হল কী! দিব্যি ভালমানুষের পারা চান করছ, খেছ। আমাকে জ্বালাছ না। ঘর থেকে বেরুছ না।'

পড়শীরা বলে, 'আরে বটুক, কোথা গেইছিলি? দেখতে পাই না।'

বটুক সকলের সব কথার উত্তর খুঁজে পায় না। সে ঠোঁটে সামান্য হাসি রাখে শুধু।

মাটি থেকে হাতটেক ভাসন্ত কেঠো লাঙলের ইস্পাতফলক চকচকানি নিয়ে দুলে দুলে যাচ্ছে। দড়িতে কষে বাঁধা জোয়ালের সঙ্গে। জোয়ালখানা আড়াআড়ি দু'বলদের কাঁধে। বলদজোড়ার বর্ণ সাদা, মাঝারি স্বাস্থ্য, গড়নে বাঁ-আলির পেট ভারী, শিং বাঁকা, ডান-আলি ছোট খাড়া শিং, শক্ত পেশীর কাঠামো। জোড়ে ডানই শক্ত হয়। জোয়ালে এমন লাঙল ঝুলিয়ে নিয়ে যাওয়াই দস্তুর। আপন ক্ষেতে তারপর নামান হয়। বটুকের চষবার ক্ষেত যেতে এখনও খানিকটা পথ। দত্তদের তিনটে বাকুড়ি ডিঙোতে হবে।

হাতটেক পরিসরের আলপথের দু'ধারে কাদাটে চষা জমি। হাঁটুনিতে দু'বলদ আলপথটাতেই নিজের পায়ের খুর রাখতে চায়। ফলে টানাটানি। দু'দিকে ক্ষেতের কাদাজলে এ পড়ে ও পড়ে। কষ্ট এড়াতে সব জীবই চায়। সমঝোতায় না গিয়ে লড়াই করে উভয়েই কষ্ট পায়। উঁচু নিচুতে গলা টান দড়িতে, ওঠা নামায় পায়ে লাঙলের ধাক্কা, শ্রম। হাঁটার গতি এতে কমে। পিছনে হেট্ হেট্ করা বটুক যে কী করে। কোমরে তার মালকোঁচা মারা খাটো ধুতি, উদোম গা, মাথায় উসকো খুসকো চুল, হাতে বেঁটে একটা লাঠি, তার মাথার চারপাশে বর্ষার মাছিদের একটা ঝাঁকের ভনভনানি। এমন বিরক্ত করে মাছিগুলো আলপথে, যেন মানুষ তাদের খাদ্যবস্তু — মুরোদ নেই খাওয়ার চোখে মুখে ঝাপটা দেওয়া কেবল। নরম আলে বটুকের পা'ও বসে যায়, তাকেও ক্ষেতের কাদাজলে নামতে হয়। একটা ঢোঁড়াসাপের উপর পা পড়ে যাচ্ছিল। ব্যাঙ, কাঁকড়া, নানাজাতের ফড়িং, মাছ, শামুক, পোকামাকড় বিস্তর এখন আলের ঘাসে, ক্ষেতে বাস করে।

পূবের আকাশের প্রান্তসীমায় সূর্য নিজেকে এঁকে নিয়েছে তকতকে করে। মেঘ নেই। বর্ষার সরসতা ছড়ান সবুজের অজস্রতা। রুক্ষ শুখো অঞ্চলের মৃত্তিকা এখন মাখন নরম, পাথুরে নয়, জলাভূমি যেন সকলই। ছড়ান ক্ষেতে দু'চারটি কেজো মানুষ, লাঙলে কিংবা আফড় মারানিতে, দূরে দূরে। বাঁ দিকে পড়ে আছে তিলডাঙা। বিশাল পিঠ নিয়ে এক অহল্যাভূমি। যাকে ঘিরে বিস্তর কাণ্ড ঘটে গিয়েছে মাসটেক আগে।

এখন বটুকের গ্রাহ্যের মধ্যে নেই তিলডাঙা। ঘুরেও দেখে না। কিন্তু এটা তো ঠিক ধবধবে জ্যোৎস্না ধোয়া নিশিতে সেই তো তিলডাঙাকে দেখে রুপোলী আলোর যুবতী কন্যারূপে। যে কী না তাকেই বলেছে, 'বটুক বড় কষ্ট বাবা, আমি অফলা হয়ে আছি কত কাল। চাষ কর—সবাইকে চাষ করতে বল।' সে বৃত্তান্ত জনে জনে সেই তো শোনায়।

তিলডাঙায় একরের পর একর তো অজন্মা ডাঙা, গোঁসাইদহ পাশে থেকেও জল দিতে পারে না, একজনের নয় অনেকেরই ভাগের জমি — শুনে একটা প্রস্তুতি গড়ে ওঠে। এবং তিলডাঙার জমিতে চাষ হবে বলে অমন চমকদার মিটিংয়ের আয়োজন করে দুলাল নন্দী, গোড়ায় পাগলের কাণ্ড বললেও। প্যাণ্ডেল তৈরী হয়, উদ্বোধনী সংগীত গায় চক্রবর্তীদের শিপ্রা, মাইক বাজে, জেলা পরিষদের সভাধিপতি আসেন, রাষ্ট্রমন্ত্রী শম্ভু চাটুজ্জে ঘুম ভাঙানোর প্রতীকতায় লাঙলের তীক্ষ্ণফলার আঁচড় টানেন। শুকো ডাঙা আগের দিন থেকে ভিজিয়ে নরম করে রাখা জায়গাটায়, বক্তৃতা হয়, গোঁসাইদহ খোঁড়া হবে, জলাভাব থাকবে না, তাহলেই তো শস্যশালিনী হবে এই জমি তার কথা দান করা হয় পঞ্চায়েত থেকে। সব চাষীকে এ ব্যাপারে প্রতিজ্ঞা করানও হয়। সগর্জনে মাইক বাক্যচ্ছটা মুখরিত করে। বটুককে অবশ্য পাগলামি করার জন্য সেই সভা থেকে রাম সরিয়ে দেয়। তারপর একটা বর্ষণেই সেই মিথ্যে স্তোকের আস্পর্ধা মুছে দিয়েছে। সবুজ ঘাস তিলডাঙার উপর নরম গালিচার ঢাকনি বসিয়ে তার যন্ত্রণাকে শীতল করেছে। মানুষ জানে মানুষ কথা রাখে না। নেতারা ভাষণ দেন, স্বপ্ন দেখান। স্বপ্ন কখনও সত্যি হয় না। হয়ত প্রকৃতিও জানে, তাই অপেক্ষায় না থেকে সে তার ধর্ম পালন করে রৌদ্র, বৃষ্টি আর কালের সহায়তায়। কিন্তু বটুক তো জানে না বটুক তো ভিন্ন মানুষ, বটুক তো উদোমাদা ক্ষ্যাপা মানুষ, বটুক তো নিজের চারপাশে স্বার্থ ঘূর্ণনে ব্যস্ত থাকে না, বটুক তো তিলডাঙার জমি নারীরূপে দর্শন করে, বটুক তো সকল ইতর প্রাণী এবং জড়ের ভাষা টের পায়। যার জন্য সে বলতে পারে যখন তখন যাকে তাকে দুহাত ডানার মত নাচিয়ে, ' এমা কিছু বোঝে না, কী বোকা, কী বোকা, কিছু বোঝে না।'

বটুকের যে তিলডাঙা বিস্মরণে, তার জন্য তাকে দোষ দেবার আগে ভাবতে হবে বেচারা ঝড়বৃষ্টিতে ফাঁকামাঠে সারারাত ধ্বস্ত হয়। অসুস্থতা কাটতে পনের দিন লাগে। তার সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে এখনকার অবস্থা। এখন চাষ-টাইম। ব্যস্ততা বোঝাতে হাত নেড়ে সকলেই বলে, ' এখন কিছু করতে বলো না বাবু- চাষ টাইম বটে, বুঝ ত।'

আকাশ নির্ভরতায় চাষের কাজ ব্যস্ত, তন্নিষ্ঠ হয়ে পড়তে হয় গাঁ মানুষদের। আকাশ মেঘ ডেকে, ' নামিয়ে দাও হে,' চাষীর অবস্থার তোয়াক্কা না করে নিজস্ব মর্জিমাফিক যে আদেশ দেয়, তার ফল এই রুখু অসেচ এলাকার চাষী মানুষকে সুকৌশলে তুলে নিতে হয়। ঢালে দ্রুত জল নেমে যায় এই মালভূমির জমিতে। হা-জল পরিস্থিতি গড়ে বিপত্তি আসতেই পারে। চাষ তোলা, বীজ বপন থেকে রোয়া বরাবর তাই বিশ্রামবিহীনতা। নেহাতই উপায় নেই নিশি অন্ধকার তাই যেন ঘরে ঢোকা। বটুকদের জোল জমির সঙ্গে ডাঙ্গা জমিও রয়েছে। রাম ভরতের সঙ্গে বটুককেও মাঠে নেমে পড়তে হয়েছে। জল কাদার ঘ্রাণ, কাঁকড়ার হাঁটা, মেঠো মাছের ছটফটানি, গঙ্গাফড়িংয়ের লম্ফঝম্প, আকাশের ডাক, বিদ্যুতের চাবুক, মেঘদলের যে বিচিত্র কালো রূপরূপান্তর এবং ধান শিশুটির হিল্লোলিত দ্রুত বর্ধন, তার মধ্যে সে কিছু ভাবার অবসরই পায় না। এসবের বৃত্তবদ্ধতায় ভাঙা ভাবনা আবর্তিত হয়।

বড় বউ বড় স্নেহময়ী। অন্নপূর্ণার মত রেঁধে বেড়ে ভাতের থালা বাড়িয়ে দিতে না পারলে বড় কষ্ট বটে। বলে, ' ও ঠাকুরপো তুমি কী—বলি মাঠে কাদা জল খেয়েছ। খিদেও

লাগে না । সেই সাতসকালে গেলে, ভাবি এই আস এই আস। তোমার দাদা এল, বলে আসছে, আবার মাঠে গেল, বললাম ডেকে দিও, বিনুকে বললাম, ডেকে দিস বাবা ঠাকুরপোকে। কেউ যদি ডাকে । দাদাটিও হয়েছে তোমার তেমনি।'

'দাদাকে দোষ দিও না। আমি যে আল টানছিলাম। কিন্তু বৌদি তুমি কী বললে গো, মানুষ কাদাজল খেয়ে থাকে- আহা কাদাজল যদি খেত- দিব্যি হত গো।'

'হ্যাঁ, দিব্যি হত—চাষও করত না, সংসারও করত না।'

বটুক অপছন্দের মাথা দুলুনিতে মত্ত হয়, 'সেটি তাহলে ভাল হত না। মানুষ করত কী তখন। চাষে কত আমোদ । আহারে অমন আমোদটি পেতে হত না আর।'

'আমোদ বলছ কী ঠাকুরপো কত খাটনি কত দুর্ভাবনা চাষ নিয়ে।'

'কী বোকা কী বোকা, কিছু বোঝেনা ওটাই তো আনন্দ।' বটুক দুলে দুলে হাসে।

মা বলে, 'খোকারে তুই বড্ড খাটিস । একা দুনোর কাজ করিস। শরীরের কী হাল হচ্ছে দেখিস না।'

'কার শরীর মা? কার শরীরের হাল?'

'তোর আবার কার?'

বটুক চোখ পিটির পিটির করে, মায়ের কথায় ভেতরে ভুর ভুর করে মজার উদ্রেক হয় তার মধ্যে । সে বলে, 'বারে নিজের শরীর মানুষ দেখবে কি করে? মানুষ লোকের দেখে। আমি দাদার দেখি, বউদির দেখি, কুশের দেখি, পাঁচুর দেখি, বলদটর দেখি, পিসির ছাগলটর দেখি চণ্ডীব—।'

'থাম, থাম দেখি—তুই কী যে বকিস উল্টোপাল্টা ।'

'উল্টোপাল্টা কথা? সোজা! কী বোকা, কী বোকা, কিছু বোঝ না মা ।'

মা বড়ই খুশী বটুকের পাগলামিহীন ব্যবহারে, ওই কথাটুকু বলা ছাড়া। দিব্যি চাষ মত্ত। জাত ব্যবসা মাটির হাঁড়ি কলসি গড়তেও সে মাতবে। মায়ের মস্তিষ্ক সম্ভাবনা আতুর হয় যদি বিয়ে দেওয়া যেত- যদি দিতে পারে! তিলডাঙায় চাষ করা নিয়ে উন্মাদনা তো বিস্মরণে, মা কালী খুব বাঁচান বাঁচিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর ওর মাথাতে ও কথা এনে দিও না। ওকে মুক্তি দাও লোকের ভাবনা থেকে। ও মাথা থেকে যেমন পিতিমা নেমেছে তেমন নেমেই যেন থাকে।

পিতিমা সংক্রান্ত নানান কথাবার্তা পড়শী মুখে, ত পুত্র দোষহীন মা ভাবে। বটুক তেমন ছেলেই নয় । মেয়ে পুরুষ ভেদ জানে না। এখনও শিশুটি। যখন বুকের দুধ টানত কোলে শুয়ে শুয়ে চুকুর চুকুর, যেমন চোখ তাকাত এখনও সেই চাউনি। বিধবা মেয়েমানুষ যদি ঘাড়ে পড়ে। পাড়ার সবাই তো বলেছে, 'দোষ মাগীর, বটুক খিপা হতে পারে কিন্তু ছোট ছেলের পারা।' লোকে বলুক, মন জানুক, তবু মায়ের ভয় যায় না। কে জানে মেয়েমানুষ জাগিয়ে তুলবে কিনা ওর মধ্যে পুরুষ প্রবৃত্তি! যুবতী শরীর তো অনেক বাঁধই ভাঙতে পারে, অনেক নতুন নির্মাণ করতে পারে, অনেক অবিশ্বাস্য ঘটাতে পারে। মায়াবিনীর জাত। বউ সেই জাতের হলেও ভালবাসা আর মায়াতে টিকিয়ে রাখে, ছেলের বাপ বলে টিকিয়ে রাখে। ক্ষীরোদ পিসি বলত, বুঝলি মেয়েমানুষ বেটাছেলের রক্ত চোষে, বউ কিন্তু বাঁচিয়ে রেখে চুষে। বউয়ের সঙ্গে ভিনু মেয়েমানুষের এই তফাত বটে।

'এই যে বটুক চললে কোথা?'

বলদ জোড়া নিয়ে চোখেই পড়েনি ব্যস্ত বিব্রত বটুকের। ডাইনে একটা খেজুর তলায় দাঁড়িয়ে লবন। মুনিষ খেটে খায়। রোগা কালো ঢাঙা পুরুষ। পাঁচটা ছেলে মেয়ে বিইয়েছে বউ। স্বল্পায়ু সন্তান দল রোগ দুর্ভাবনা শোকের ঝাপট মেরে গিয়েছে। একটি টিকে আছে পাঁচের মধ্যে। তার বয়স এখন সাত। লবন এবং তার স্ত্রী ডিগডিগে পেট হাঁড়ি, মাথা ভারী দুবলা, রোগগ্রস্ত সন্তানটিকে গলায় কোমরে তাবিজ কবচ ঝাড় ফুঁকের অবিরত বন্ধন দিয়ে রাখে। আহা বড় দুঃখী মানুষ গো লবন। বটুকের দেখামাত্র লবনের দুখী চেহারা এবং ওদের শিশুটি আবর্ত সৃজন করে।

'তুমি দাঁড়িয়ে আছ এখানে?'

'আর বলিস না। ধনা একদিন চষে দেবে বলেছিল পনের টাকায়।' বলতে বলতে ক্ষোভ হতাশার তরঙ্গ বটুক বরাবর ছুঁড়ে এগিয়ে আসে লবন, 'আজ এলই না। এদিকে জল টান মাটি উগলুতে না পারলে গেল। শালা মানুষ না হয়ে বলদ হতে পারলে ভাল হত। নিজেই জমি চষতাম।'

বটুক থমকেছে। লবনদা বলদ হতে চাইছে। তার অনুভবে কৌতুক নেই। হাসি উদ্রেককারী নয়। মায়াবৃষ্টির ঝমঝমানি তার উপর। ভিজে একেবারে সে চুবুড়ি, মাথা গা বেয়ে জল ঝরে। সমব্যথার গ্লানি নিয়ে বলে, 'তাহলে ত ভারি ভাবনার কথা। আমাদের জমি কাল হাল টানলেও হবে। আগে তোমারটই দরকার বটে। ঠিক। ঠিক।' নজরে পড়ে বলদ জোড়া আগে থমকেছে। বলে, 'যাস না দাঁড়া। শুন কী বলছে লবন দা।'

লবন বলে, 'বলদে কী শুনবে মানুষই শুনে না।'

'বলদও শুনে মানুষের কথা। যাকগো তাহলে আমিই চষি আজকে।'

'সে কী! তোমার দাদা শুনলে কি বলবে? বকাবকি করবে নাই।'

'ঘরে নাই সিউড়ি গেইছে। আহা জমিটার কথা তো ভাবতে হবে। দাঁড়াও, বলদ দুটো ধরে আনি।' আল ধরে ছুটে হেট্ হেট্ করে বলদ জোড়াকে ঘুরিয়ে আনে। তারপর লবনের মাঠে লাঙল আলগা করে ফলা নামায়।

'ও বটুক এ কী করছ।'

'চষছি, আবার কী। দাঁড়িন দেখ।'

'তোমার নিজের জমির কি হবে? রাম শুনলে আমাকে-।'

'হবে কাল হবে। একদিনে ও মাটির ক্ষতি নাই, তোমার ক্ষতি আছে লবনদা।' বটুক তাকায় না। গরু ডাকায়। মাটিতে লাঙলের ফলা কাদাজল তোলে।

লবন দাঁড়িয়ে থাকে। জমিটা চষা হয়ে যাচ্ছে হর্ষের কথা বটে, কিন্তু ভয়ও করে তার। পাঁচ কাঠা এই ভুঁইটা বাপুতি, কী কষ্টে যে তাকে চাষ তুলতে হয়। একে ধরে তাকে ধরে আফড় জোগাড়। তবে পোঁতা, দেখভাল সে নিজে করে।

বটুক বলল, 'তুমি দাঁড়িয়ে থেকে কী করবে! ভিনু কাজ দেখ গা।'

'তোমাকে কিন্তু চষতে বলি নাই বটুক। রাম যখন বলবে—।'

বটুক বলে, 'কী বোকা, কিছু বোঝে না, সব কথা বলাতে হয় নাকি!'

লবন দাঁড়ায় না। আধক্ষ্যাপা মানুষ নিজের খেয়ালে লাঙল টানছে সে থাকলে এখানে মনে হবে সেই চষিয়ে নিচ্ছে। কেটে পড়াই সঙ্গত।

পূবের আকাশ থেকে মেঘ উঠে দ্রুত সূর্যকে খাঁচায় বন্দী করে ফেলে। হু হু বর্ষালি হাওয়ার পরই বৃষ্টির একটা ঝাঁক তাড়া মারতে ছুটে আসে। বটুকের গ্রাহ্য নেই। ছাতা মাথায় সহদেব থমকাল, 'আরে বটুক তুই! এটা তোদের জমি নয়, করছিস কী! ওঠ, ওঠ।'

'আমি জানি গো লবনদার জমি বটে।'

'তাহলে করছিস কেনে?'

'মুনে হল।'

সহদেব চুপ করে থাকল। ক্ষ্যাপা মানুষের সঙ্গে সে কী কথা বলবে। কে যেন বলছিল বটুক ভাল হয়ে গিয়েছে। ভাল হবে। আরে মাথা একবার খারাপ হলে আর ভাল হয় না। এখনই ভাল দেখছ আবার দেখবে ক্ষেপেছে। মরুকগে হারামজাদা। সে হাঁটা দেয়। বৃষ্টিটা কমে গেল। বর্ষার এই বড় দস্তুর। কখন যে আবার নেমে পড়বে। সকালে রোদ দেখে মনে হয়েছিল সারাদিন তকতকে থাকবে, এ তো কালি মেখে বসল।

ঘাড় ঘোরাতেই এক সময় বটুকের চোখে পড়ে ঘাটের পথ ধরে মেয়েমানুষ যাচ্ছে। আরে এ যে পিতিমা। সঙ্গে সঙ্গে ডাক, 'এই যে চললে কোথা?'

পিতিমার চোখ এদিকেই ছিল। সে আশপাশে কোন চাষী মানুষ না দেখতে পেয়ে সাহস করে এখানে এসেছে। বটুককে বড় পুকুরে চান করতে এসে চোখে পড়ে। যাব কী যাব না কয়েক মুহূর্তের দ্বন্দ্ব। পথে ঘাটে বটুক তার দিকে ঘুরেও দেখে না। সম্পূর্ণ বিস্মরণে যেন সে। তার সঙ্গে নিবিড়তার মুহূর্তগুলো কোন রেখার টান দেয়নি। জলের দাগের মত ভেসে গিয়েছে। যাক্ ভেসে যাক সে ভেবেছিল। তবু কোথায় যে আকর্ষণের আঠাল সূত্রের খিঁচুনি। অসুস্থ হয়ে পড়তে ছোট বউ মালতীকে জিজ্ঞাসা করেছিল। নিজে দেখতে যাবার চোখে দেখার প্রবল ইচ্ছা সত্ত্বেও যেতে পারেনি। কিন্তু পুকুরঘাটে মালতীকে জিজ্ঞাসামাত্রই যেন দেশলাই কাঠির বারুদে লাফ মারা—'ছি ছি! লাজ লাগে না তোমার। ভাসুর আমার ছোট ছেলের বাড়া। তার সর্বনাশ করতে লেগেছিলে, আবার শুধুছ কেমন আছে!' পিতিমা বলেছিল, 'একটা লোককে সবাই মিলে ঘা মারল, তারপর শুনলাম জলে ভিজে বাড়াবাড়ি, শুধনোও দোষের বটে। ছোট বউ তুমিও আমাকে ভুল বুঝছ।' ছোট বউ বলেছে, 'ভুল ঠিকের কি আছে। তোমার নজর আমার ভাসুরে, কে না জানে। লোক ত আর চোখ ঢেকে বসে নাই। তবে বলে রাখি, ছাড় এবার। ভিনু বেটাছেলে ধর। তোমাকেও বলিহারি যাই, ধরলে শক্ত দেখে পুরুষ ধরবে, অমন আলগা পলকা ক্ষ্যাপাকে কেনে! নিজের দেওর ঘরেই ছিল তার সঙ্গেই থাকলে পারতে।' কান ঝাঁ ঝাঁ করে গিয়েছিল ছোট বউয়ের কথাগুলোয়। জ্বালা কিন্তু স্থায়ী হয়নি! সে একটিও কথা বলেনি, তবে ও ঘরের খবর এনে দেয় বাগাল শম্ভু। তারপর যেদিন রাস্তায় বেরুল, সামনে পড়ল সে, ঘুরেও দেখল না বটুকবাবু, সেদিন ঘরে এসে সে শুধু কেঁদেছিল।

পিতিমা আলে দাঁড়িয়ে কাঁপল, 'আমাকে চিনতে পারলে?'

'কেনে পারব না। তুমি তো পিতিমা, সমুর বউ বট। আহা সমুট মরে গেল।'

শ্বাস বন্ধ করে যেন পিতিমা বলল, 'আর কেউ নই ?'

'আবার কে বট ?'

'ভেবে দেখ'।

পিতিমার ফিকে হলুদ ছাপা শাড়ি, সাদা ব্লাউস, মাথার চুল খোলা। পৃথিবী বৃষ্টিস্নানের পর যে পরিচ্ছন্নতায় নীল আকাশে, অমিত রৌদ্র প্লাবনে এসেছে, যেন পিতিমা তার শরীরে সবটুকু তুলে নিয়েছে। বটুকের 'ভেবে দেখ' শুনে মনে হয়ে যায়। সে আহ্লাদিত হয় সেই সৌন্দর্যে। নিবিড় করে দেখে। তারপর বলে, 'ভেবে দেখলাম। তুমি খুব ভাল। তুমি খুব সুন্দর।

পিতিমা চোখে রহস্য আঁকে। মাথা দোলায়। বলে, 'আমি যে মরছি। এত বর্ষণ তবু আমার খরা যায় না।'

'কী বোকা কী বোকা! মরলে তুমি কথা বলছ কী করে।'

পিতিমা বলে, 'তা বটে, কিন্তু আমার তো খবর করতে পারতে!'

বটুক খুশি হয়েছে তার কথার মান্যে, এখন খবর না করার অনুযোগে সে বিচলিত সরল চোখে তাকায়, বালকের মত, লজ্জা পেয়ে বলে, ভুলে গেইছিলাম, চাষ টাইম কিনা।'

'এখন মনে পড়েছে ?'

'কী বল দেখিনি।'

পিতিমার দীর্ঘশ্বাস পড়ে। সে ভাবে, তিলডাঙায় সেই সভার পর কোন কাজ হয়নি। কারও আগ্রহ নেই, মাইকে ঘোষিত শব্দগুচ্ছ তা যেন বাতাসে ভাসানোর জন্য। লোকের যে আনন্দ এবং সম্ভাবনার উচ্ছ্বাস তা যেন সেই মূহূর্তটি নন্দিত করার জন্য। বলদ দিয়ে খানিকটা লাঙল টানা তা যেন ছেলেদের খেলা। খেলা ভেঙে সবাই চলে গিয়েছে। পিতিমারও বটুকবাবুকে ঘিরে যে নির্মাণ তা তো খেলারই একটা অনুষঙ্গ। ভেজা বালি দিয়ে যেন গড়েছিল ঘর দুয়ার। রৌদ্র জলে ঝরে গিয়েছে। বটুকবাবু তিলডাঙা কন্যেকে দেখেছিল জ্যোৎস্নায়, দিনের আলোয় দেখেছে তাকে। তিলডাঙা কন্যের কান্না মুছতে চেয়েছিল, তার কান্নাও তো ধুয়ে দিয়েছিল। অসুস্হতা বটুকবাবুকে সব ভুলিয়ে দিয়েছে। তিলডাঙা কন্যা দর্শন, তার কান্না, তার কর্ষিত হবার আকাঙ্খা। কিন্তু সকলই তো স্থির হয়ে আছে অপেক্ষায় আশার প্রদীপ্তি নিয়ে, সম্ভাবনার উন্মুখতায়। পিতিমার মনকে এসব বিচরণশীলতায় ধাক্কা দেয়। আবার সে কী মনে করিয়ে দেবে? ক্রমে যে স্বাভাবিক সাধারণ তাকে আবার অস্বাভাবিক অসাধারণত্বে প্রতিষ্ঠা দেবে? কোনটা স্বাভাবিক ? এই যা না বটুকবাবু যা ছিল! তার কাছে পূর্ণ পুরুষ হয়ে যে এসেছিল। ধাক্কার দোদুল্যমানতা শুধু।

'মন পড়ছে না-বল।'

'ঠিক ধরেছ। চলেছ কোথায়?'

বুকের মধ্যে তোলপাড় করে, বটুকবাবু বারবার আমার কাছে ছুটে যেতে, বটুকবাবু তোমার বুকে আমি আশ্রয় নিয়েছিলাম, বটুকবাবু তুমি—। কিন্তু বলা হয় না। বলে, 'তোমার কাছে।'

'এই তো আমি। কী করতে হবে?'

'কিছু না। তোমাকে দেখতে ইচ্ছে করছিল। খারাপ মানুষ দেখতে দেখতে চোখ হেজে

গেল। ভালমানুষ দেখলে চোখ ভরে— চলি বটুক বাবু।' আলপথে প্রতিমা টাল খায় বুঝি। টাল নিয়েই পায়ের পাতা চলে ঘাসে, জলে, কাদায় মাটি রাঙা হয়ে হয়ে।

'হ্যাঁ যাও। মনে পড়লে তোমাকে বলব এখুন।'

বেলা যায়। লবন আসে না, বটুক অপেক্ষাও করে না, আশাও করে না। কাজ করে দিয়েছে ব্যস। ঘরে ফিরে সে বলদ জোড়াকে খইল ছানি দেয়। বড় বউ তাগাদা দেয়। ডুবে এসেই সে ভাতে বসে। রাম সিউড়ি থেকে ফেরে। ভরত ঘরে নেই। মালতীর বাবার অসুখ দেখতে গিয়েছে নলহাটি। কাকার পাশে আছে ভাইপো কুশ। তার হাতে কাগজ। কাকাকে নৌকা বানাতে হবে খেয়ে উঠে। আসা মাত্র পিছু নিয়েছে। চাষ টাইমে কাকাকে সে একেবারেই পায় না খেলার সঙ্গী হিসেবে। কাকা কেবলই বলে, টাইম নাই, টাইম নাই। আজ কাকা টাইম নাই বলেনি তাকে। রাম খবর করে, 'চষে এলি বটুক।'

'হ্যাঁ, চষে এলম। দেখ কেনে, ধনা কথা দিয়ে কথা রাখে নাই। লবনদার ত হাল নাই— এদিকে জমির বতর চলে যায়—আমাদের একদিন পরে হলে হয়—।'

'তাই লবনের মাঠে লাঙল মেরে এলি।'

বটুক একগাল হাসে, 'ঠিক ধরেছ তুমি।'

রাম বিরক্ত, উষ্ণ। বটুকের ফের খ্যাপামি অনুভবে কষ্ট আক্রান্তি। বলে, 'নিজের জমি রইল পড়ে লুকের জমি চষলি। বলি আবার তুর খাপামি শুরু হলো। দিব্যি ত ছিলি। আর লবনকে বলিহারি যাই, বোকা সোকা পেয়ে বাগিয়ে চাষ করিয়ে নিলে। দেখছি এবার ওকে।'

'লবন ত না বলেছিল। কিন্তু মাঠের মাটি বলল, চষ। চষে দিলাম।'

বড়বউ বলল, 'বেশ করেছ ঠাকুরপো। তুমি কেমন যেন হয়ে যাচ্ছিলে। আগের মত ছিলে না। সব মানুষের পারা নিজের নিজের করছিলে। আজ কিন্তু সেই তেমনটি!'

রামের রাগ স্ফীতি উপাদান পায়। সে স্ত্রীকে দাবড়ে ওঠে, 'ওর খিপামিটা ভাল ছিল? ঐ যে মাটি চষতে বলেছে, মাটি কি কথা বলে? তুমিও কি খেপলে নাকি?'

বটুক বলে, 'কী বোকা কী বোকা কিছু বোঝে না। বউদিকে বকে দেখ। বউদি খেপা কেনে হবে, তুমিই খেপা বট। সিউড়ি ঘুরে এসে চান নাই খাওয়া নাই চিঁচাছ।'

মাও ঘরে ছিল। বলল, 'ও রাম কী হল?'

'আবার কী। তোমার মেজ বেটার কীর্তি আবার শুরু হল।'

কুশ জিজ্ঞাসা করল 'কাকা মেজবেটা কে বটে?'

বুক ফুলিয়ে বটুক বলল, 'আমি বটি।'

কীর্তি ই বটে। কাগজের নৌকা বানাতে বানাতে কুশ বলে উঠল, 'ও কাকা এ নৌকাতে আমি চাপতে পারব না যে। জলে ভিজে যাবে।'

বটুক বলল, 'ঠিক কথা বটে।'

'তাহলে।'

কাকা ভাইপো গালে হাত দিয়ে বসে থাকল। নিতান্তই বালক কুশের রোগা চেহারার চোখ দুটিও বড় জ্বলন্ত। মাথায় কোঁকড়ানো চুল। কাকার ভাবুক ভঙ্গী সে নকল করে, ঘুরে ঘুরে দেখে। এখন আড়চোখে দেখছে আর তেমনটি করছে।

'বুঝলি কাঠের নৌকা হয়। আমি '.ওকে কাঠ দিয়ে নৌকা করে দেব।'

কুশ বলল, 'এখুনি কর।'

ঘরে করাত আছে, হাতুড়ি আছে, বাটালি আছে, কুড়ুল তো আছেই, পুরানো পেরেকেও আছে। আর কাঠ? আম কাঠের তক্তা তো কয়েকটা তোলা আছে গোয়ালের মাচায়। বটুক সে সব নামিয়ে যন্ত্রপাতি নিয়ে বসল। তারপরই শব্দ শুনে রামের বকাবকি, লাফঝোপ, বড়বউকে কথা শোনান, জিনিষগুলো কেড়ে নেবার চেষ্টা। কাকা ভাইপোর প্রবল বাধা এবং সঙ্গে তাদের চেঁচানি। বড়বউ এসে সামাল দিল। বলল 'ঠাকুরপো তুমি কী নৌকা করতে পার। আর ধরে নিলাম পার, কিন্তু চালাবে কোথা?'

'আমি খুব পারি, খুব সোজা, মোচার ঢাকার মত। বল কুশ পারি না?'

কুশ বলল, 'পারই তো। বড়পুকুরে আমরা নৌকা চালাব।'

বড়বউ বলল, 'ঠিক আছে কেমন পার তা দেখব। আজই দেখতাম, তোমার দাদা যাই বলুক ওই তক্তাতেই দেখাতে বলতাম। কিন্তু আমের কাঠে নৌকা হয না। অন্য কাঠ লাগে।'

বটুক জিজ্ঞাসা করে সরল গলায়, 'কী কাঠ?'

বড়বউ মুহূর্তকাল থতমত, তারপর বলে, 'বট, ডুমুর, না মনে পড়ছে না। দাঁড়াও দ্বিজুকে ডাকি। ছুতোর মিস্ত্রি বটে। জেনে নিয়ে আসতে বলি, তা-পর দেখব। এখন তোমরা কাকা ভাইপো বরঞ্চ শ্লেটে ছবি আঁক। নৌকার ছবিও আঁকতে র—যেমনটি করবে আর কী।'

বটুক বলল, 'তাই করি কুশ! দেখ আমার বউদির কত বুদ্ধি।'

কুশ উত্তর দেয় না। সন্দিগ্ধ চোখে মাকে দেখে। কাকা না বুঝলেও সে মায়ের চালাকি বোঝে। কিন্তু কাকার ছবি আঁকার তাড়াতে সে মুহূর্তে ভুলে যায়।

রাম বটুককে সর্বক্ষণ ঘিরে রাখে। সে কিংবা ভরত। চাষ শ্রাবণের দ্বিতীয় দিনেই তোলা হয়েছে। এখন কাজ নিড়ানি। মেঘ বৃষ্টির দিনের রৌদ্রখর বেলাও মাটির পৃথিবীতে নামে। এবারের ভাবনাও আক্রান্ত করেনি। চাষ প্রায় সকলেরই আড়াআড়ি। কারও বা রামের আগেই শেষ। এখন অনন্ত অবসর। কর্মহীনতা এবং অন্নহীনতাও। তবে দুলাল নন্দী জয়পুরের রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ করায়। কিছু শ্রমদিবসের সৃস্টি হয়। বিশুর বোন ভারতী শ্বশুর ঘর থেকে এসে বিষ খায়। গাঁয়ে এ নিয়ে খুবই হৈ চৈ হয়। বেঁচে যায়। শাশুড়ির সঙ্গে বিবাদই বিষপানের কারণ। এদিকে অবনী সিংহের রান্নাঘরের থালাবাসন চুরি হয়। দাশুকে ধরা হয়। মাল পাওয়া যায় না। দাশু স্বীকার করে না। গতরাতে সে নাকি জ্বরে ভুগছিল। বটুক এসবে থাকে না। শ্রাবণের মাঝ থেকেই মাটির হাঁড়ি কলসি বানান হবে। ঘরের লাগোয়া চালাঘরে তখন আটকে থাকবে বটুক সর্বক্ষণ। ব্যস্ততায় পাগলামি কমে। তবে এত চোখে চোখে রেখেও শুনতে হয় সহদেবের আফড় মেরেছে, ধান পুতেছে গগন মোড়লের। আগের মতো আর কিন্তু তার কিংবা ভরতের লুঙ্গি গেঞ্জি পরে নিচ্ছে না, হুটহাট ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ছে না, কুশকে নিয়ে বালকোচিত ক্রীড়ায় মাতছে। তবু রামের মনে হয় খুব ধীরে ধীরে যেন আগের অবস্থা ফিরে আসছে। পাগল কী কখনও ভালো হয়। তারপর ভাবে, কিন্তু তার মেজভাই কী সত্যিই পাগল? বুকে হাত দিয়ে সে এমন কথা কী স্পষ্ট গলায় উচ্চারণ করতে পারবে?

পারবে না।

বটুককে ধরার জন্য পিতিমা বাঘিনীর মত ওৎ পেতে থাকে। সুযোগ খোঁজে। একা পাওয়া তেমন হয় না। হতে, 'মনে পড়ছে বটুকবাবু' জিজ্ঞাসমাত্র দেখে গাঁয়ের কেউ না কেউ আসছে, একবার তো দুলাল নন্দী ধরে ফেলল। তার শরীরে লোভের তীব্র কামের লকলকে সর্পিল জিব বুলিয়ে বলে বসল, 'পাগলটাকে ভুলতে পারছ না, আরে ভুলবে কিসের জন্যে, বুঝতে পারছি ছোঁড়া পাগল হলেও সুখ ঢালতে পারে, আমিও পারি, একদিন নিয়ে দেখ না— পাগলাও থাক, আমি বাধা দেব না। বুঝলে যৌবন গেলে কেঁদে মরতে হবে। গুছিয়ে নাও আমার কাছে থেকে। বোকামি কর না।'

পিতিমার প্রতিবাদ রোষভরা চোখে, সরে যাওয়ায়, তাচ্ছিল্যে। যেন বটুকবাবুকে পেলে সে তুচ্ছ করে দিতে পারে। কিন্তু বটুকবাবু যে তার ডাক শুনতেই পায় না।

সন্ধের মুখে বটুক কুশের জন্য দোকান থেকে লজেন্স কিনে আনছে। পিতিমা দুর্গামন্দির পাশে কলকে আর জবা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো কেউ নেই দেখে। বলল, 'মনে পড়ছে বটুকবাবু? মনে পড়ছে? তুমি মনে করার চেষ্টা করেছ?' .

'কী বল দেখিনি।'

'আমি বলব না।' পিতিমা রহস্যময়ীর মত মাথা দোলায়, 'তোমাকেই ভাবতে হবে।'

বটুক কিছু বলার আগেই ভরত। সে খবর রেখেছে। সে বাঘিনীকে শিকারের মতলবে দোকান থেকে মেজদার পিছন নিয়েছে দেখেছে। পিতিমার দেওর নিমে তো রোজ বলে তাকে, 'বলি আধখিপা পেয়ে বটুককে মাগী এখনও কব্জা করার তালে। একটু নজর রেখো।'

হাতে নাতে ধরে ফেলার উল্লসিত ক্রোধ-ভরতের ঝলকে গর্জে ওঠে, ভেব না আমরা মরে গেইছি। গাঁয়ের বাস তোমায় তুলে দেব। সেইদিন থেকে বলব বলব ভাবছি- মান অপমান জ্ঞান থাকলে এগুবে না- বুঝেছ! গাঁয়ে কী বেটাছেলের অভাব ধরলেই পার।'

বটুক চেঁচায়, 'সমুর বউ বটে, আহা সমুট মরে গেল! এই, ভরত অমন করে বকিস্ না।'

কী হয়েছে জিজ্ঞাসায় দাঁড়ায় মানুষ।'

'আবার কী । আমার ভাইয়ের সর্বনাশ করছে বেশ্যামাগী। দেখেও তো সব দেখ না।'

'কী হল! আবার কী হল।' বলে বদনের খামারের ওপাশ থেকে শম্ভু আসে।

পরাণ চক্রবর্তী লাঠি হাতে এল, তারপর নিমু, বিশু, গগন মোড়ল। সকলের কথা, পিতিমার আঁচল চাপা দিয়ে কান্না, বটুক চেঁচাতে থাকে, 'কী বোকা, কী বোকা, কিছু বোঝে না, ও পিতিমা সমুর বেধবা—সমুট মরে গেল আহা গো—পিতিমার কত কষ্ট—আহা গো।'

ভরত ঘাড় ধরে নিয়ে যায় মেজভাইকে। চেঁচিয়েই চলে বটুক।

রাতে বটুকের ঘুম আসে না। সারা ঘর অন্ধকার। গুমোট করে আছে বাতাসহীনতায়। সন্ধ্যার ঘটনা তার পেট থেকে বুকে, যেন কোন খাদ্য বস্তু হজম হয়নি, পাক দিয়ে ফিরছে তার গ্যাসীয় চাপের বমন রুদ্ধতায় অসহ অস্বস্তি। এক সময় সীমাহারা তার মস্তিষ্ক টের পায়, প্রতিক্রিয়ায় অন্ধকারে সাঁতার কাটছে তার হালকা শরীর। ঘর থেকে বাইরে চলে যাচ্ছে রুদ্ধ দরজার সামান্য ফোঁকর দিয়ে। কিন্তু কোথায় যাবে; তখনই সে দেখতে পায় জোৎস্নায় শিশিরের শরীর নিয়ে এক নারী। যেন শুভ্রতার বসন, উজ্জ্বল চন্দ্রখণ্ডসম নয়নযুগল, স্ফুরিত ওষ্ঠভেদী

দন্তরাশির আলো বিচ্ছুরণ, মাথার এক ঢাল চুলের আলো রেখা সুউন্নত বুকের উপর ঘাড় বেঁকে পড়ে আছে। অন্যদিক থেকে আর এক নারী আসে আবছায়া, কিংবা ছায়াই একখানা। তারপর দুটি শরীর এক হয়। বটুক তীক্ষ্ণ করে দৃষ্টিকে চিনতে চায়—চেনে না—অথচ চেনে। যেন গত কোন এক জন্মের পরিচয়, যেন রক্তমাংসের অনুভবে পরিচয়, যেন অশ্রুনদীর কূলে পরিচয়। অথচ স্মৃতির কী গভীর শূন্যতা, কূপ গর্ভ থেকে নেমে গিয়েছে পাতালপুরীতে। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় একযোগে বজ্রনাদের মত জিজ্ঞাসায় আসে, 'কে তুমি।' শব্দ প্রকম্পিত হয় সুউচ্চ মন্দির মধ্যে যেন। এক থেকে অজস্র ভিন্ন স্বর হয়ে ফিরে ফিরে আসে।

'বটুকবাবু আমি- আমি গো।'

বটুক উঠে পড়ে দরজা খুলে বেরিয়ে আসে। ঝড়বৃষ্টিতে আহত এবং অসুস্থ হয়ে পড়ার আগের মত, চাষের কাজে নিমজ্জিত হওয়ার আগের মত, ইতর প্রাণী এবং জড়ের ভাষা অনুভব করা আগের মত সে ঘর বাইরে আবার যায় নিশি পরিক্রমায়। বাইরে পা রেখে দেখে জোৎস্নায় চরাচর ব্যাপ্ত। আকাশ মেঘহীন। গ্রহ নক্ষত্র আলোচক্ষে পৃথিবী দেখেছে। মায়াময় রহস্যজালে আকাশ মাটি একাকার। সকলেই গভীর ব্যগ্রতায় অসুস্থের উদ্বিগ্ন আত্মীয়কুলের মত ঝুঁকে পড়ে যেন, তারপর সরব হয়, স্বস্তিময় হয়। তাদের বটুকবাবু ফিরে এসেছে। সে হাঁটে। মানুষ নিজেকে হারিয়ে আবার যদি ফিরে পায় তার হাঁটা এমনটি হয।

বটুক জোৎস্নাকে রাত্রিকে ফিসফিস করে বলে, 'আমার সব মনে পড়েছে। পিতিমা আমার সব মনে পড়েছে।'

সাত

তালপাতাব মাথালি চাপিয়ে সুদুর মা জল ছপছপে উঠোন ডিঙিয়ে গা আধভেজা করে আসে। দরজায় কড়া বাজিয়ে ডাকে, 'অ বৌ দুয়োর খুল। আমি বটি। মাগো মা, মানুষ যায় কোথা, বাদলা বটে বাবু, ভাসিন দিবে, সব পচে হেজে যাবে।'

সকাল অনেক আগেই, মুখ ধুয়ে চা খেয়ে পিতিমা খিল আঁটা ঘরে জানলার সামনে দাঁড়িয়ে। বাইরে বর্ষার প্রকৃতি তুমুল হট্টগোলে, আকাশ মাটি রুপোলি ধারায় একাকার করে দিয়েছে। বিদ্যুতের ফলকে সর্বস্ব ভাসানোর বজ্র হুমকি, বাতাস ঝাপটে বৃষ্টির ময়দা গুঁড়োর তরঙ্গ সারা ঘর বরাবর। বর্ষা ক্রীড়ায় ক্ষণ রেহাই দু-দিনে জুটছে বটে, কিন্তু তার মেয়াদ বড়ই কম। ভয়তরাস সূর্য মুখ বের করে কী করে না, টের পায় না মানুষ। সব ঘরবন্দী। 'শনির সাত মঙ্গলের তিন, আর সব দিন দিন,' খনার বচন প্রকৃতিগ্রাহ্য হলে আজ নিয়ে আরও পাঁচটা দিন ভাদ্র আকাশ উপর জলভরা কলস হয়ে থাকবে। বৃষ্টির আকাল যে ভূমিতে, তারই অতিরিক্ত বদহজমি কষ্ট। এখানে বান বন্যার ভয় নেই। মালভূমি অঞ্চলে বহমান কুশকর্নিকা নদীটি গাঁ থেকে অনেক নীচে। বর্ষা নামক পুরুষসঙ্গের প্রমত্ততায় সে ভাসে। তার সখীবৃন্দ হয়ে ওঠে ঢালে দ্রুত জল নামার অজস্র কাঁদর। এদিকে মানুষের বাসস্থানের মাটির দেওয়াল জল ঝাপটায় নরম মাখন হয়ে খসে, ছাদন ঠিক না থাকলে দেওয়াল ধ্বসে, তেমনটি হবার ঘর তিলডাঙায় বিস্তর। বৃষ্টি থামলে , সূর্য উঠলে, তেমন খবর শুনতে পারলেই হল। এখন রাস্তা ভাসছে, ক্ষেত্র ভাসছে , পুকুর ডোবা ভাসছে। জলে সবুজ ধান পচবে, খড় পচবে, শুকো পাত পচবে এরপর।

'খুলছি' বলে পিতিমা খিল সরাতে এগিয়ে যেতে সময় নেয়।

সে একা থাকা মেয়েমানুষ। ভেন্ন হওয়া তক্ শাশুড়ি কথা বলে না, গাল পাড়ে, অভিশাপ দেয়, সর্বনাশ ডাকে, 'আমার বেটা খেয়েচিস- তুর কুট হবে, অমন যৌবন তোর শিয়েল কুকুরে খাবে,' ইত্যাদি। দেওর নিমে, মাতাল, সাপের চোখে তাকায়, হিসহিসানিতে ছোবল মারার ক্রুর প্রবৃত্তি তার এখনও। কামক্ষুধার প্রবলতায় পাথুরে প্রাচীরের ধাক্কা তাকে ভ্রাতৃবধূটির ত্রুটি বের করার জন্য অবিরত তীক্ষ্ণ নজর রাখায়। কিছু করতে না পারার অক্ষমতায় নিজের গায়ে নিজেই বিষ ঢালে। পিতিমার যৌবনতনু আকর্ষণের সুগন্ধ পাঠায় দুর্বল চিত্ত পুরুষ বরাবর। শরীর বৈরিতা পিতিমার জীবনযাপনের ধারায় তাই অহর্নিশি কিছু না কিছু সমস্যা গড়ে তোলে। এদিকে পিতিমা স্বামীর সম্পত্তির ভাগ নিয়েছে, দুলাল নন্দীর রক্ষিতা বানানোর কামকাঙ্খাকে কাঁচের পাত্রের মত দূরে ছুঁড়ে দিয়েছে শাশুড়ি দেওরকে তুচ্ছ করেছে, বটুককে ঘিরে স্বপ্নময় হয়েছে। বটুক তো আধখ্যাপা মানুষ। দু'হাত ডানার মত নাচিয়ে বলে, 'এ মা কী

বোকা, কিছু বোঝে না।' বটুক তো গাছ, পাথর, মানুষ ভিন্ন অন্য প্রাণীকুলের কথা শুনতে পায়, বটুক তো নিজের কথা বিস্মরণে পাঠিয়ে অন্যেব কথা ভেবে কাতর হয়, বটুক তো আপন পর বোঝে না। এমন মানুষ নিয়ে তো ঘর বাঁধা অসম্ভব। তবু তাকে ঘিরেই তার নির্মাণ। যেন বৈধব্য জীবনে সে এক পূর্ণ পুরুষকে দেখতে পেয়েছে। তার যৌনস্বাদের জন্যে রক্ত ডাক পড়ে, জীবন স্বাদের জন্যে দু'চোখ উজ্জ্বল হয়। বটুক কেমন হয়ে গিয়েছে। কাছে এসে আবার দূরে। ওকে সরিয়ে নিয়ে চায়। ওর ছোটভাই তো ক'দিন আগে শাসিয়ে গেল, অপমান করে বসল। পিতিমার কাছে এই বর্ষা যেন অজস্র দুঃখের ধারা নিয়ে তাই আকাশ গলে পড়ছে।

বর্ষা মাঝে থামে, প্রচণ্ড তাপের দিন দেয়, আবার নামে। যেমন এই দু'দিন কেবলই জলের ঝুনুনি চতুর্দিকে, তোলপাড় আকাশে বাতাসে মাটিতে, তেমনি তো পিতিমার তোলপাড়। যেন সেও বর্ষা ধ্বস্ত ধরিত্রী। পালে পালে ছুটে আসা মেঘদলের মতো, তার ডাকের মত, আলোর জিভ দেখানোর মত, ঘরে তারও দুরন্ত ক্রিয়াময়তা। বটুক তার বটুকবাবু আধখেপা মানুষটা ভুলে গিয়েছে তাকে, মনে করাতে হবে, তারই তাড়না, কামকেন্দ্রে ক্ষুধা বিবশ করে দিচ্ছে। উসকে দিতে ইচ্ছে করছে, বটুকবাবুর উপর শরীরের সব ভার চাপিয়ে, ঝাঁকুনি দিয়ে পুরুষক্ষুধার বারুদে অগ্নি অর্পণ করে, 'বটুকবাবু গো, আমি পিতিমা। মনে করে দেখ আমাকে না দেখে তুমি থাকতে পার না, আমাকে দেখে কাঁদ, আমার জন্য ঘর থেকে ছুটে আস। বটুকবাবু গো মনে করে দেখ, ওই তিলডাঙা, চাষ হয় না, তুমি জোৎস্নারাত দেখেছ, সেই জমি যুবতী কন্যে হয়ে কী জননী হয়ে তোমাকে বলেছে, বুকে বড় ব্যথা, বুকের দুধ টানছে না সন্তান, সবাই চাষ করুক। বটুকবাবু গো, দুলাল মিথ্যে স্তোক দিয়েছে, ও জমিতে কেউ চাষ করেনি। গোঁসাইদহ খোঁড়া হয়নি। তিলডাঙার কন্যের কান্না ঘোচেনি।' কিন্তু কেবলি তো তোলপাড়। পিতিমা ঘর বাইরে পা রাখতে পারে না।

দরজা খুলতে সুদুর মা বাইরে দাওয়ায় মাথালি রেখে ঘরে ঢোকে। শ্যামলা পা জল ধোয়ায় রক্ত শূন্যতার মত সাদাটে। ইঞ্চি পাড় সাদা জমি কাপড় ন্যাতানো, আধময়লা, ব্লাউজ নেই, কণ্ঠার হাড় উঁচু, শুকনো স্তন পাঁজরার সমতল থেকে চুপসে সামান্য ঝোলা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, মুখে মধ্য পঞ্চাশ ছাপের চেয়েও অভাব ছাপের আঁকাজোকা। বসা নাক, গোল ধরণের খসখসে কালচে মুখ, বসা গাল। রোগা চেহারার মতই তার কণ্ঠস্বর ক্ষীণ, জোর শব্দপাতে পাছে কেউ আহত হয় এত ভয় সন্ত্রস্ততা যেন। মেয়েকে নিয়ে থাকে। স্বামীর চাকরি ছিল আসানসোলে। দুর্ঘটনায় মারা যেতে বারো বছরের মেয়ে নিয়ে গাঁয়ে শ্বশুরের ভিটেতে আসা। ঘরখানা ছিল, জমিও ঘুচে যায়নি। শহুরে জীবন আর্থিক স্বচ্ছলতা, স্বামী সৌভাগ্য থেকে গ্রাম জীবনে ঠিকঠাক পায়ের পাতা বসানোর বিবিধ অন্তরায়কে বাঁচানর প্রবৃত্তি দিব্যি সহজ করে নিয়েছে। ভাগ্য ভালো, এখনও গ্রামীণ নীতিজ্ঞান এবং মেশামিশিতে পড়শির সঙ্গে শিক্ষা তার নিয়ত হচ্ছে। জমা টাকার সুদ, জমির ধান থেকে মা মেয়ের কোনক্রমে চলে। পিতিমার সঙ্গে ভাবসাব বেশী দিনের নয়। এই বর্ষার গোড়াতেই। সে কারণ অবশ্য সদু। সদুর জ্বরের সময় পিতিমা ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ে। সিউড়িতে ডাক্তার দেখানোর সঙ্গী হয়, রাতে সদুর মায়ের কাছে থাকে। সদুর মা ছাড়া পিতিমার যেটুকু ঘনিষ্ঠতা তা চাঁপার সঙ্গে। শেখর মোড়লের মেয়ে চাঁপা। পাড়ার নিতাইয়েব সঙ্গে প্রেম করে। এক সন্ধেতে পিতিমা

ওদের ঘনিষ্ঠতা দেখতে পায় মোড়লদের খোলা খামারের খড়ের স্তূপে। চাঁপা তারপরই কাছে আসে। বোধকরি ঘটনাটা কাউকে না বলে দেওয়ায় পিতিমাকে বিশ্বাস হয়েছে। বাকি বৌ ঝি সব বাঁকাচোখ, বাঁকা কথা।

সদুর মা কাপড়ের জল ঝেড়ে নিয়ে বলে, 'কী করছিস বউ, ভয়েছিল নাকি?'

'না।'

'পুকুরে গেইছিলি?'

'একেবার চান করতে যাব। যা জল। সারারাতও থামে নাই। থামবেও না বোধহয়।'

সদুর মা বলে, ' চারিদিক ভাসান। পুরোনো পুকুর, ঘামডোবা, চৌধুরী পুকুর, গোঁসাইদহ, বড়পুকুর সব ভাসছে। নদীতে বান। ভাসানে মাছের ছড়াছড়ি। কেনার লোক নাই। সদু আমতলার মাঠ থেকে চারটে রাইখরা ধরে নিয়ে এল। বলে, মাগো সবাই ধরছে। আবার যাব। মেয়েকে কী আটকাতে পারি—ছুটল। মাছ পেলেই তো হল না, তেল চাই। একা খাবেটই বা কত বল দেখিনি?'

পিতিমা নীরবে শোনে, যেন সে গাঁয়ের ঘটনার মধ্যে থেকেও নেই। সদুর মা না এলে একা জানলায় বাইরে বৃষ্টিই তার সঙ্গী হয়ে থাকত। সদুর মায়ের সঙ্গে তার শাশুড়ি কথা বলে না। পাড়ার অনেকেই তার সঙ্গে মিশতে নিষেধ করে। সদুর মা শোনে না।

'রাঁধাবাড়া তোর হবে না? জল হোক ঝড় হোক পেট ত শুনবে নাই।'

'করব। কাঠ ভিজে, ঘুঁটেও নাই, উনুন যে কিসে ধরাব?'

'আমার ঘরে খাবি। চাল আলু দে বউ।'

চাল আলু কী তেল মশলা কী অন্য আনাজ চাওয়ায় কোন সঙ্কোচ নেই। সদুর মা বলেছে একদিন, 'বউ খেতে দেবার মুরোদ নাই। সদুকে খেতে দিস্ তুই টুকটাক এই সেই। শোধ নয়, বলি কী, ভাল মন্দ হলে রাঁধতে কষ্ট হলে আমাকে চাল ডাল দিবি, আমি রেঁধে দেব আমার সঙ্গে।'

পিতিমা বলল, 'তাই করি গামছা নিয়ে তোমার ঘরে কুলুপ এঁটে যাই কাকীমা।'

'সেই ভাল।'

সদুদের ঘর চারিদিক মাটির পাঁচিলে ঘেরা, আয়তাকার জমি, খড়ো চাল। সামনে মস্ত উঠোন। জমিটার কোন ব্যবহার নেই। চারটে পেঁপেগাছ দাঁড়িয়ে আছে। আঙুলের মত সরু ক'টা ইউক্যালিপটাসের ছায়া ঝিলমিল করে। ঘরে গরু নেই, তবে ছাগল আছে। সব বাঁধা এখন চালাঘরে। বর্ষায় মানুষের একার কষ্ট নয়, জীবজন্তুরও ঢের কষ্ট। সদু পাকুড় আর বট পাতা এনেছিল কাল, তাই চিবিয়ে পড়ে আছে চারটে ছা নিয়ে দুটো ছাগলী।

পিতিমা এসে বসার মধ্যে বৃষ্টি ছেড়ে যায়। ঘোলাটে মেঘের আবর্তন বন্ধ হয়নি।

সদু ফিরে আসে। ফরসা রোগাটে চেহারা। ফ্রক ভিজেছে। কিশোরীর চেহারার নারীত্বের স্ফুটন তেমন তীব্র নয়। কানে মাকড়ি, হাতে রুপোর চুড়ি। চোখ মুখ চকচকে। গামছা বাঁধা মাছ [illegible] গেল, পুঁটি, মৌরলা, চারাপোনা, কই।

মা বলল, 'বাঃ, [illegible] হয়ে যাবে।'

সদু [illegible] গামছা বাঁধে। বলে, 'ও বৌদি, তুমিও চল। কী মাছ! সবাই ধরছে। লোকে

লোকাকাণ্ড।' বলতে বলতে হাত ধরে টানে।

মা বলে, 'এত মাছ কে খাবে তার ঠিক নাই, আবার মাছ ধরতে যাবে।'

কিশোরী সদুর মধ্যে এখন ক্রীড়ামত্ততা। যেন এক্কাদোক্কা কিংবা লুকোচুরি খেলায় সে। মায়ের কথায় মাথা ঝাঁকিয়ে দ্রুত বলে যায়, 'খাবার জন্যে কে মাছ ধরবে! বল বৌদি, আমরা তো এমনি এমনি মাছ ধরব। মজা করতে! চল - চল। সবাই ধরে নিবে, তখুন পাবে না।'

পিতিমা হেসে ফেলে সদুর হর্ষ আলোকবন্যা ভাসা মুখ দেখে। বলে, 'ছাড়, ছাড়। আমি মাছ ধরব কী রে - পাগল হলি।'

সদু ছাড়লে তো। টেনে নিয়ে যায় পিতিমাকে।

সদুর মা বলে, 'যা বউ, তাড়াতাড়ি আসবি। জল বেশি ঘাঁটতে দিস না।'

শনির সাত মঙ্গলের তিন—খনার বচন ফলে না। সময়ে সবই বদলায়। এককালের সত্য অন্যকালে থাকে না। পিতিমা চারুপিসির কথা ভাবে। চারুপিসির শিরদাঁড়া বাঁকা চোপসানো গাল। গাঁয়ের সবার পিসি ছিল বালবিধবা মেয়েমানুষ। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব পরিক্রমান্তে বার্ধক্য এবং মৃত্যু এ গাঁয়ের সেই বাপের ভিটেতেই। পুরুষের জীবনে এমন ঘটতে পারে বটে কিন্তু মেয়ে তো ধানের জাত, এক মাটিতে পুষ্ট হয় না, ফল দেয় না, ফলে আঁতুড় ঘর মৃত্যুঘর এক বাড়িতে হয় না। চারুপিসি বলত, 'কাল ফল মা কাল ফল। এখন কলির দশা। কত কি হবে। নিয়মকানুন সব পাল্টে যাবে।' চারুপিসি প্রায়ই তার কাছে আসত। কত কথা, 'অ বউ, মা মানে না, মাগ মানে এখন বেটা ছেলে, গাছ ফল দিবার কথা, দেয় না, যাব কোথা, মেয়েমানুষ বেটাছেলের ব্যাভার করে, দেখবে মেয়েমানুষের দাড়িগোঁফ বেরুবে। সব চারিত্তিরই উলটপালট।' পিতিমা ভাবে, তো নইলে বটুকবাবু কেন ভুলে যায়।

বৃষ্টি থামার পর প্রখর রৌদ্রে শ্রাবণের গন্ধাভূমি বাষ্প সৃজন করে। চর্তুদিক থেকে উঠে আসা কাদা জলসরস উদ্ভিদ বাতাসে এক অদ্ভুত গন্ধে টালটমাল হয়ে ফেরে। চাষের কাজ কবেই শেষ সবার। অখণ্ড অবসর গ্রামজীবনে।

সদুর মা একদিন শোনায, তিলডাঙায় চাষ হয়নি, গোঁসাইদহর বর্ষায় সব জল বেরিয়ে গেল, বাঁধা হলো না বলে গাঁয়ে খুব কথার্বাতা হচ্ছে। অবনী তো দুলাল নন্দীর বিরুদ্ধে পাটি করে লোককে বোঝাচ্ছে, স্রেফ নিজের প্রচার। বলছে, চাষটা ভাঁওতা। এদিকে দুলাল নন্দী লোককে বোঝাচ্ছে সরকার দিল না— কী করব।

পিতিমা সদুর মাকে জিজ্ঞাসা করে 'বটুকবাবুর মনে পড়েছে তিলডাঙার কথা? বটুকবাবু বলে বেড়াচ্ছে?'

সদুর মা অবাক হয়, 'বউ তোকে ভাল বলছি, ক্যাপাটার ধার মাড়াস না। ওর আবার বলা, ওর আবার ঘুরে বেড়ানো।'

পিতিমা চুপ করে থেকেছে। সদুর মা কেমন করে বুঝবে ওই ক্যাপাই তো তিলডাঙা নিয়ে একদিন মেতেছিল। ওই ক্যাপার জন্যই তো জমিটা নিয়ে গোঁসাইদহ দিয়ে ভুঁইকে ফলসী করার চেষ্টা। নইলে শূন্যডাঙা তো কতকাল ধরেই রয়েছে। পিতিমা বটুকবাবুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাই করেনি। বর্ষা যাপনের [illegible] তার দিনগুলি একভাবে হেঁটে যাচ্ছিল। শ্রাবণ পেরিয়ে ভাদ্র। মাঝে দু'একদিন বৃষ্টি গুমোট, তাপের দিন, আবার হয়তো

মেঘ গর্জনের পর স্নিগ্ধতা।

সিংহবাড়ির গাঁয়ে বাসকারী একমাত্র শরিক মদ্যপ বেশ্যাসক্ত অবনী সিংহ মারা গেল সন্ধ্যায়। প্রবল বৃষ্টিতে তখন গাঁ ভাসছে। একদা প্রতাপ, আজ নিঃশেষিত। বক্রেশ্বরে দাহ করতে নিয়ে যাবার লোক জোটে না। পাঁচমাইল রাস্তা তো বর্ষা নিশিতে কম কথা নয়। কুশকর্নিকা তীরে দাহ করা হত। তবে দাহ সম্পূর্ণ হয় না। কুশকর্নিকাতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় অর্ধদগ্ধ দেহ। এ নিয়ে আবু চক্রবর্তী বড়ই ব্যথিত হন। ওর মেজ মেয়ে প্রাথমিক শিক্ষিকা অজন্তা। বড় ছোটর বিয়ে হয়েছে। একা পড়েছিল বৃদ্ধ বাপকে নিয়ে। বাবা অসুস্থ হতে পিতিমাকে ডাকে, বলে, 'বউদি এস ননদভাজে থাকব। একা ভয় করছে। দুলালদা বলল. তোমার কথা।' শোনামাত্র পিতিমার সর্পাঘাত। সে 'না' করে। দুলাল নন্দী না থাকলে সে রাত্রি বাস করতে যেত।

দুলাল নন্দীর বউ বন্দনা ডেকে পাঠায়। পিতিমা অবাক হয়। কোনদিনই ভাবসাব ছিল না। থাকার কথাও নয়। অর্থনৈতিক শ্রেণীতে সে ঢের নিম্নপর্যায়ের, আত্মীয়ও নয়। ও বাড়িতে তার যাতায়াতও নেই। বন্দনার অস্তিত্ব দুলালের পত্নী হিশেবে, দুলালের কামান্ধতায় পর্যন্ত ভাসেনি। হুঁ, ভাসলেও শুধু এটুকুই শয্যাশায়ী বউ ঘরে, উপোসী পুরুষ ছটফটিয়ে মরছে। সেই বন্দনার ডাক। ভাবে, কী বলবে তাকে। দুলালের তাকে করায়ত্ত করার চাল কী?

দুলালের মা উঠোনে পিতিমাকে দেখে দাওয়ায় তরকারি কুটতে কুটতে বঁটি থেকে হাত ছেড়ে দেয়। বলে, 'এস বউ! আমাদের ঘর আসা বন্ধ করে দিলে। কী হল, কিছু বলছিলে?'

প্রশ্ন শুনেই মনে হয় ভজনকে দিয়ে শাশুড়িকে না বলেই ডাকতে পাঠিয়েছে। সামনে গিয়ে বলে, 'দিদি ডেকেছে। দুলালদার বউ!'

দুলালের মায়ের অবাক ভঙ্গী ক্ষণকাল স্থায়ী হয়। তারপর বলে, 'দেখ ঘরেই রয়েছে। সকাল থেকে উঠে নাই। কাল দুলালের সঙ্গে খুব কথা কাটাকাটি।'

বিছানায় শীর্ণা নারী। কতদিন পর দেখছে পিতিমা স্থির চোখে সে দেখে চামড়া ঢাকা করোটি কুঞ্চিত হাসি ছড়াচ্ছে। স্বরেও নাকি টান, 'এস। কাছে এস।'

পিতিমার ভয় করে। কে বলবে মেয়েমানুষ। এ যেন প্রেতিনী। কোটরে চোখ, চুলওঠা দীর্ঘ কপাল, শাঁখা চুড়ি যেন বাবলার শীর্ণ ডালে, আঙুল কাঠির উপর জড়িয়ে আছে। শাড়ি জড়ান ঢলঢলে ব্লাউসে কালিবর্ণের খসখসে চামড়া।

পিতিমা বলে, 'আমাকে ডেকেছিলে?'

'হ্যাঁ, তুমি আমার কাছে থাকবে?' বিছানায় বসে বন্দনা মুখে চোখে যন্ত্রণার চিহ্ন।

পিতিমা উত্তর দেয় না। দুলাল নন্দী কী বউকে প্রয়োগ করেছে তাকে কব্জা করার জন্য? মাথায় শব্দাঘাত 'থাকবে। থাকবে।

'কী কথা বলছ না।'

'থাকব মানে?'

'ওমা, থাকার মানেও বুঝছ না। আমার ঘরে থাকবে, খাবে দাবে, শোবে। না, না, রোগীর সেবা করতে হবে না। আমি তোমাকে আমার শাড়ি দেব গয়না দেব।' উত্তেজনায় হাঁপ ওঠে হাড় সর্বস্ব মেয়েমানুষের পাঁজরায়।

'কেন?'

'আমার স্বামীর সুখের জন্য।'

স্বামী এবং সুখ শব্দদ্বয় যেন অগ্নিবাণ হয়ে ছুটে আসছে। প্রতিরোধে যোজন করে সে অগ্নিকেই। নিজের অবস্থিত অগ্নিখণ্ডে বলে, 'তোমার স্বামীর সুখ দুঃখের আমি কে?'

'আমি জানি তুমিই সব।'

'না।' পিতিমা সেই এক অগ্নিময় ভূমিতে, তারপরই ঝলকিত হয় অগ্নি বমনে, 'স্বামীর সুখ চাইলে একটা মেয়েমানুষের ব্যবস্থা কর।'

'সেজন্যেই তোমাকে ডাকা।'

থরথর করে কাঁপে পিতিমা, 'তোমার লজ্জা করে না। ঘরে ডেকে অপমান করছ।'

অক্ষিগোলক যেন বেরিয়ে আসে বন্দনার কোটর থেকে, 'সতীপনা করো না। বিছানায় শুয়ে থাকলেও আমি সব জানি আমি সব খবর রাখি।'

'খবর যখন রাখ, তখন মেয়েমানুষও জোগাড় করে নিতে পারবে। অভাব নাই মেয়ের।'

'আমার স্বামী যে তোমাকে চায়।'

বন্দনা হাঁপায়। যেন সে শব্দ খোঁজে। কিংবা শেষ অস্ত্রের মতো প্রার্থনীয় হাত বাড়ায়।

পিতিমা চিৎকার করে বলে, 'তাহলে আমি মরলে বক্রেশ্বরে যেতে বলো।'

উন্মাদিনী অট্টহাসি তোলে। হাততালি দেয়, কঙ্কাল যেন খট্‌খট্ শব্দ তুলে ভৌতিক পরিবেশ করে তোলে। বিকৃত উল্লাসিতস্বর বেরিয়ে আসে, 'নে— নে আমার সায়া ব্লাউস- নে আমার হার চুড়ি, নে- সব নিয়ে নে। দাঁড়া সব দেব।' বন্দনা কাপড় খুলে ফেলে 'ঠিক হয়েছে'। ঠিক হয়েছে। তুই আমায় বাঁচালি। ও তোকে পাবে না কোনদিন—। আমি সব দেব তোকে—সব—নে।'

পিতিমা যেন ছিটকে বেরিয়ে আসে প্রেতিনীর ঘর থেকে। দু'কানে বাজে অট্টহাসি। কঙ্কালের প্রসারিত হাতে তাকে জাপটে ধরার ভয় আতঙ্কে সে উঠোন পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়। বুক যেন তার টুকরো টুকরো হয়ে যাবে এমনই প্রচণ্ডতা হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনে। ঘন ঘন শ্বাসপাত হয়। দিনের আলো, গাঁয়ের চেনা পথ, ওদিক থেকে ধনা ঠাকুরপো আসছে, ওই তো চাটুজ্জেদের ঘর, রাস্তার ধারে নিমগাছ, দু'টো ছাগল চরছে, তবু যেন বীভৎস রমণীর সেই নরক কক্ষটি থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না।

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে নিঝুম হয়ে বসে পড়ে। এত ভয় সে কখনও পায়নি। দুলালের জাল কাটার পরবর্তীতে আগে কখনও এমন ভীতি জাগেনি। তার চেতনায় স্পষ্ট বাজে, রক্ষা পেয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমন অবস্থা হতেই পারে, যাতে তাকে ধরা দিতে হবে। দুলাল নন্দীর কামনা পূরণে সাধ্যান বুদ্ধির কৌশলের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত শক্তির প্রয়োগ ঘটতে পারে। ধৈর্যেরও তো সীমা আছে। যেমন তার ধৈর্য। ক্রমশঃ ভেঙে যাচ্ছে। এভাবে যাবে না তার দিন। তাহলে কী ভাবে। এ ভাবনায় চোখের সামনে বটুকবাবুর মুখই এসে যায়।

বটুকবাবু ছাড়া তার কে আছে। বটুকবাবু যদি তাকে বিয়ে করে। জোৎস্না, ভিনপাড়ার কন্যা এ সবই তো পাগলামি। পাগলের পাল্লায় পড়ে সে ও তো পাগলই হয়েছে। কিংবা বলা যেতে পারে, পাগলাকে পাবার কামনায় ওর সব ব্যাপারে সায় দেবার প্রবণতা তাকেও ও মনটি করে

দিয়েছে। কিন্তু নিছকই কথার জাল বুনে জীবন যে যায় না, শরীরের ক্ষুধা যায় না। এটা ঠিক এ গাঁয়ে বাস করা যাবে না। ওর বাড়ির লোকও বাধা দেবে। মানুষটাকে যদি গাঁ ছাড়ায়, যদি তাকে নিয়ে অন্য কোথাও ঘর তৈরী করে! পরিশ্রমী বটে, কিছু না কিছু করে নিতে পারবেই। ভাবনাটা বটুকবাবুকে যে কোন ভাবেই হোক কুক্ষিগত করে পরিচালিত করার প্রবলতায় পিতিমাকে চঞ্চল করে। ঘরে বসে থাকতে পারে না। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। বটুকবাবু এখনও তার আকর্ষণে, মায়াজালে, তিলডাঙা কন্যার সেই দৃশ্য দেখার তন্ময়তায়। কিছু সময়ের চ্যুতি আবার তাকে পুরোন ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

'বউদি ঘরে রইছ?'

সদু। গোলাপি ফ্রক, মাথার চুল খোলা, হাত ভর্তি কাঁচের চুড়ি, কানে দুল, বয়ঃসন্ধির কাল মেয়ের। শরীর নতুন করে গড়ছে। সুন্দরতার সঙ্গে বক্ষচিহ্নের স্ফীতি।

'কী হয়েছে।'

'বামুনপাড়ার, শ্যামলীদি পালিয়েছে।'

'সে কী!'

'হ্যাঁ, একা নয়। ওই যে গো, বেনেদের ধীরুদার বউয়ের যে ভাইটা আসে কোঁকড়া চুল, সব্বাই বলছে ওর সঙ্গে, দেখ গা গোটা গাঁ টি টি। বামুনদের নন্দ বলছে, পেলে দু'টোকে খুন করে ফেলবে।

পিতিমা শ্যামলীকে চেনে। গাঁয়ের মেয়ে ওই পর্যন্ত।

মা বলছিল, 'আবার কেউ পালাবে। কাকীও বলছিল। দোলার মা ও।'

'কে পালাবে রে?' পিতিমা চমকে প্রশ্ন রাখে। ধরা পড়া তার মুখে চোখে আঁকা হয়।

'তা কেমন করে জানব। তিনমুড়ো গাঁ বটে। যা হবে তিনটে। মরলে, দেখবে তিনটে মরেছে। এ পাড়ার উ পাড়ার করে। বিয়ে হলেও তিনটে। তারপর—। দেখ. আর একটা পালাবে এমুন।'

সদুর বর্ণনা শোনার দরকার নেই। পিতিমা জানে। এটা যে মানে না, এমনটি নয়। কে কবে, এটা বলেছিল, ঈশ্বর জানেন। কিন্তু গাঁয়ে প্রচলিত হয়ে আছে। মাকে ভাত দেয় না, হেনস্থা করে এমন তিন পুত্র এ গাঁয়ে আছে। তিন বদমাস মেজ বউ রয়েছে। এমন তিন খুঁজে পেতে মানুষ ওই প্রচলিতের সত্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হবার চেষ্টা করে। হিশেব করলে এ সত্য অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যাবে না। এমন কী ঘটনার ক্ষেত্রে এক বা দু'টি দাঁড়াবে- তবু গ্রামের মানুষ এটা বলে, বলতে ভালবাসে, একটা মৃত্যুর ঘটনায় আরও দু'টি মৃত্যুর আশঙ্কায় মনে ভীত হবার জায়গা দেয় ক্ষণিক হলেও। সদুর কথাটা নিজের ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য গড়ার জন্য এ মুহূর্তে পিতিমা যেন সত্যের একটা জ্বলন্ত উদাহারণ দেখতে পায়। কিন্তু আর একটা মানে, সেটা হবে তৃতীয়। কিন্তু দ্বিতীয়টা—।

'আর কে পালিয়েছিল সদু।'

'কেনে বাউরিপাড়ায়। মাগো ছিঃ নিজের বউদি—।'

মনে পড়ে। তাহলে কী সেই তৃতীয়। বটুকবাবু আর সে। পিতিমা সারা মুখে আনন্দের ছ'টা এনে আলোকময় হয়। বলে, 'সদু একটা কাজ করবি।'

সদু প্রস্তুত, 'বল।'

'বটুকবাবুকে ডেকে দিতে পারবি। চুপি চুপি বলবি, পিতিমা বউদি ডেকেছে। পারবি না?'

'খুব পারব।'

'ওদের ঘরের কেউ যেন না জানতে পারে।'

সদু আশ্বস্ত করে, ' সে তুমি ভেবো না।'

'বলবি, সন্ধেবেলায় যেন দেখা করে।'

'আচ্ছা।'

শরৎ এসেছে পিসির বাড়ি। বটুকের মা হল তার পিসি। শরৎ ইন্দোরে থাকে। বছর সাল একবারও নিজের গাঁ পণ্ডিতপুরে আসা হয় না। মা বাবা বেঁচে নেই। শেষ বয়সের সন্তান সে। বাইশ তেইশ বছর বয়স হল। লেখাপড়া ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত। তারপর বাউন্ডুলের মত ঘোরা। কিছুদিন কাজও করেছিল দুবরাজপুরে পাইকারি মাল বিক্রি হয় এমন একটা মুদীর দোকান। বেকার হয়ে বসেছিল তারপর।

ইন্দোরের সঙ্গে যোগাযোগ সূত্রটি হল বিমল হাজরা। গাঁয়ের মানুষ। থাকত আসানসোলে। সেখান থেকে মধ্যপ্রদেশ গিয়েছে। সায়েন্স গ্রাজুয়েট। রি-ফ্যাককাটারির কাজে দক্ষ। পাথর গুঁড়ো করে ঢালাই করে এখন কারখানায় ব্যবহারের উপযোগী সামগ্রী ফার্নেসে পুড়িয়ে তৈরী করা হয়। নানান আকৃতির, ইঁটজাতীয় শুধু নয় বিবিধ ছাঁচে প্রস্তুত হয়। আসানসোলে তাঁর এ কাজ তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কুশলতায়, কেমিক্যাল এবং তাপমাত্রা সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে সুনাম ছড়িয়েছিল। সুদূর মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শহরের শিল্পাঞ্চলে একটা কারখানায় সেই সুনামের জোরেই জেনারেল ম্যানেজারের পদ প্রাপ্তি। ইন্দোর শহর ছাড়িয়ে গড়ে উঠেছে বিস্তৃত ইন্ডাস্ট্রিয়াল স্টেট। কত কারখানা। কাজ করছে কত মানুষ। বিমল হাজরা গাঁয়ে কাজ না পাওয়া ক্ষেতমজুর মুনিষশ্রেণী থেকে ওখানে কাজ করতে যাওয়ায় লোক জোগাড় করে। এতে কাজ দিচ্ছি, গাঁকে দেখছি, এ রকম একটা আত্মপ্রসাদও ছিল। কিন্তু বিভিন্ন সময় গ্রাম, আশপাশ অঞ্চল, আসানসোল রানীগঞ্জ, পরিচিত বর্ধমানেরও কিছু শ্রমিক নিয়ে যাওয়ার পর তাদের বেশির ভাগই এক দু'মাসের বেশি থাকেনি। ফিরে গিয়েছে আবার গাঁয়ে। পরিশ্রমেব কাজ আগুন আর পাথরের সঙ্গে। যন্ত্রের ব্যবহার আছে বটে, তবে দৈহিক শ্রমও কম লাগে না। মাইনে কম অনুযোগের সঙ্গে ফেরত কর্মীদের মধ্যে — দূরত্ব, অচেনা পরিবেশ, হিন্দীভাষী মানুষ সব, এরকম কারণ যুক্ত হয়েছে। তবে টিকে গিয়েছে অনেকেই। শরৎ তাদেরই একজন। বিমল হাজরার খুবই প্রিয় হয়ে উঠেছে।

বিমল হাজরা মধ্যপ্রদেশে একটা বাঙালি শ্রমিকপল্লী গড়ে তুলতে চায়। তার জেলার মানুষই তাতে বেশি যেন থাকে। জেলায় তেমন কোন শিল্প নেই —চাষ নির্ভরতা। ক্ষেতমজুরের আয় অতি নগণ্য। কর্মদিবসও তেমন জোটে না। এখানে মাইনে বাড়লে থাকবে, ফলে বাড়ার চেষ্টা সে করে যায়। মালিকপক্ষ লাভটা দেখে, ওই মজুরিতে স্থানীয় লোক যখন পাওয়া যায় তখন বেশি মজুরির লোক নেবে কেন! তবু গাঁ থেকে মানুষ আনার চেষ্টায় বিমলের খামতি নেই। শরৎকে এ ব্যাপারে বারবার বলে 'এই তো তুই রয়েছিস। বল, এখানে জিনিসপত্রের

দাম কম। ঘন ঘন বাড়ি যাবার চেষ্টা না করলে এ টাকাতে অসুবিধা হবার কথা নয়। হ্যাঁ, দূরত্ব বেশি, ট্রেন ভাড়া অনেক - আরে বাবা অত গাঁয়ে যাবার দরকার কী। আমি তো থাকার জায়গা দিচ্ছি। বউ ছেলে নিয়ে আসতেই পারে।'

এবার শরৎ পিসির বাড়ি এসেছে ওই জন্যে। যদি এ অঞ্চল থেকে শ্রমিক সংগ্রহ করা যায়। বেঁটেখাট চেহারা, তবে শক্ত কাঠামো। বয়সের তুলনায় ছোট দেখায়। বাইরে থেকে সে কথাবার্তায় খুব চোস্ত হয়ে গিয়েছে। কিছু হিন্দী শব্দ বেরিয়ে আসে ওর কথায়। চা খেয়ে বাঁশের মোড়ায় বসে সে কথা বলে যাচ্ছে। রাম, বড়বউ, কুশ, বটুক, মা ভরত সব মুগ্ধ শ্রোতা। ইন্দোর। কতদূরের সেই পথ। ট্রেন চলে দু'দিন ধরে। সারারাত সারাদিন। ভারত মানচিত্রটির জ্ঞান না থাক, দূরত্বের বিশালতা ডিঙিয়ে যাওয়া শরৎকে ঘিরে ভিন্ন পৃথিবীর বাসিন্দা হিসেবে কৌতূহল তো আছে। ফলে জিজ্ঞাসা, কথা শোনাতেই আবিষ্টতা।

'আরে কুঁড়েমি সব। সেবার দিতে হয়। তারপর ভয়। কেন রে বাবু, ইন্দোর কী এমন দূর। আমি রয়েছি না। আর হিন্দী, ও তো দু'চার রোজ বলনে শিখেগা। হাম কুছ নাহি জানতা। কই বাত নেহী, পুছ পুছ কে সব মালুম হো যায়েগা। আউর, বহুত বাঙালি ভি তো উঁহা হ্যায়। বল, তোমরা, ভুল ভাল থাকতে পারে—তাতে কী। কথা বোঝাতে পারলেই হল। হিন্দীতে তো পরীক্ষা দিতে হচ্ছে না। থাকার জায়গা দিচ্ছে, বহুত চিফ জিনিসপত্রের দাম।'

শরৎই বলল, 'বটুক তো বসে আছে গাঁয়ে। চলুক আমার সঙ্গে।'

বটুক শুনেই উল্লসিত, 'যাব। যাব।'

কুশ বলল, 'কাকা, আমিও যাব।'

বটুক যাক - এমনটি রামের মাথাতে আদপেই আসে নি। এখন শোনার পর মনে হল, মন্দ হয় না। মা রাজি হবে কী না কে জানে। হলে ভাল হয়। ক্রমশঃ বটুক যেভাবে পিতিমা নামের নষ্ট মেয়েমানুষটির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে তাতে কেলেঙ্কারি বাঁধতে পারে। কালই তো সন্ধেরাতে যাচ্ছিল। অসুস্থতার পর দিব্যি ভালমানুষ হয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে পুরোন রোগ। বরঞ্চ একটু বেশি করেই। সম্পূর্ণ পাগল হলে ভিন্ন কথা। কিন্তু ভাইটি তার এমন পর্যাযের যে তাকে পাগল বলেও চালান যায় না। কবরেজমশায় সেই কত আগে বলেছেন, 'আরে পাগল কী এক রকমের হয়। হাজার রকমের। মানুষের মাথা বাবা এক মস্ত কারখানা। কত যন্ত্রপাতি। কত কী তৈরী হচ্ছে।' তা হোক, কিন্তু পরিবারে ঝামেলা এনে ফেললে সকলকেই তো পাগল হতে হবে। তার মাথায় আসে নি, তবে বড় বউ একটা ভয় ধরানো কথা বলে দিয়েছে। পিতিমার সঙ্গে সংসর্গ করলে মেয়েমানুষের গর্ভবতী হবার সম্ভাবনা। এটা হতে পারেই। ওদের সম্পর্কের মধ্যে শরীর ব্যাপার থাকবে না, এটা কী করে হয়। বটুক তো পুরুষ বটে। ফলে সন্তান ধারণ করে মেয়ে এ সংসারে আসতে চাইবে। সমাজও চাইবে, বটুক বিয়ে করুক। লোকে ছিঃ ছিঃ করবে। পাগল না হয় কিছু ভাববে না, কিন্তু তারা —তারা তো পাগল নয়। বড় বউ বুদ্ধি ধরে। রামের ভয় এখন যেন প্রবল হয়।

রাম বলল, 'শরৎ তুমি লোক পেলে?'

'না। না। সব ভীতু। ঘরকুনো ব্যাঙ।'

বটুক বলল, 'ঠিক। ঠিক। আমি নই।'

'তুমি যাবে বটুক?'

'হ্যাঁ। যাব। নতুন দেশ বটে। আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে।'

বটুকের মা বলল, 'না বাবা, তুই পারবি না।'

বটুকের আগে শরৎ বলে উঠল, 'কেন পারবে না। আমি রয়েছি না। পিসি তুমি ভেবো না। ও আমার সঙ্গে চলুক।'

রাম বলল, 'মা এদিকে শোন। উঠোনের' একধারে নিয়ে গিয়ে বলল, 'বুঝলে বাইরে কাজে থাকলে ভাল হয়ে যেতেও পারে। জায়গা বদল হবে। তুমি আর বাধা দিও না। চিকিৎসা ঢের হয়েছে, এখন জায়গা বদলে যদি কাজ হয়।'

'তুই বলছিস!'

'হ্যাঁ। আর শরৎ তো রয়েছে। ভাল ছেলে, এমন সুযোগ পাবে না। তুমি না করতে যেও না। বোঝ সমুর বউটাকে নিয়ে তো কম করল না, এখন আবার—কালই তো রাতে যেছিল ওর ঘরে—কেলেঙ্কারি হলে ও মেয়ে এসে ঘরে ঢুকবে।'

মা রাজি হয়। পিতিমা আতঙ্কে একমত হতে দেরী করে না সকলে।

পরদিনই শরৎ বের হয় বটুককে নিয়ে। অঢেল স্ফূর্তি বটুকের এই যাত্রায়। সে যেন পুরোন ঘটনা, গাঁ, পিতিমা সব ভুলে গিয়েছে।

শরৎ বলে, 'না থাকতে চাইলে পৌঁছে দিয়ে যাব। চিঠি দেব তোমাদের। তবে হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি আসা হবে না। ঠিকানা তো রইল। জানলেই ও চলে আসবে। কিছু ভেবো না পিসি।'

আট

একখানা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ে মাটির সড়কে। পিতিমা সরে গিয়েছে পথপ্রান্তে। কিন্তু ঘাড় ফেরাতেই চোখে পড়ে ড্রাইভার আর দু'জন আরোহী। দুলাল নন্দী! আর ও কে? আশ্বিনের সকালে মেঘহীনতায় প্লাবিত রৌদ্রের উজাড় আলোক বহ্নি চিনিয়ে দেয় গোপালদা। বিবাহপূর্ব ভালবাসার যুবকটি। চেনার ভুল নয়, সেইই। বয়স, এতগুলো বছর বদলায়নি। ওই চোখ, ওই মুখ যে বুকের গভীরে এক বিশাল ক্ষত করে অশ্রুতে পূর্ণ করে রেখেছিল, চাপা ছিল, কখনও তরঙ্গ ওঠেনি, সেই জলে স্নান বাসনা ঘটেনি—এখন উন্মোচিত হয়ে পড়ে।

জিপগাড়ি থেকে নেমে পড়েছে, 'প্রতিমা তুমি।'

পিতিমা। পিতিমা নয় প্রতিমা। পিতিমার মনে হয় আকাশ আবার স্নিগ্ধ ধারায় তাকে স্নান করার জন্য বুঝি নেমে এল। সে টের পায় কিছুই হারায় না। এ পৃথিবীতেই থাকে - হয়ত অন্য ভাবে অন্য রূপে অনেক দূরে দৃষ্টির আড়ালে। ফিরে আসে—আসতেই পারে। আবার অন্য গল্প শুরু হওয়ার জন্য নেমে এল। অনেক গল্পের শুরু তো শেষ দিয়েই। পিতিমার ঠোঁটে হাসি ফোটে।

আর গোপাল সরকার। সে যেন বিশ্বাসও করতে পারে নি, পারছে না। যেন এমনটি হবার নয়—হয় না। বুঝি আকাঙ্খার সমাধির সম্পূর্ণ নির্মিতি তার দেখা হয়ে গিয়েছে। বিস্ময়ের অন্তহীন তরঙ্গমালায় ক্ষণিকও যেন অনন্ততা পায় তার কাছে। তারপরই বুকের মধ্যে প্রচন্ড বিস্ফোরণ, 'তোমাকে - তোমাকে কোনদিন দেখব ভাবিনি।'

'আমিও তো।'

শরীরে বাজনা বাজে। কে জানত, দেখার মধ্যে এত আনন্দ থাকতে পারে!

মনে হয় হ্যাচারি প্রতিষ্ঠার পরিকল্প রচনা নয়। সে পিতিমাকে দেখতে পাবে বলেই এখানে এসেছে। জিপগাড়ি থেকে বালকের মত লাফ দিয়ে তাই নেমে পড়েছে।

শরতের পড়ন্ত মধ্যাহ্ন রৌদ্রঘনতায় উষ্ণতা গায়ে মাখছে। সকাল থেকে শুরু, এখনও শেষ নেই। গুমোট ধরে আছে আবহমণ্ডলে। চতুর্দিকে যে গাছের ঝোপের সবুজপাতার সরসতা, লতাগুল্মের রসসিক্ততা এবং বর্ষাজলের অবস্থিতি পুকুর ডোবা খাল বিলে, খেতের পর খেতের সবুজ ধানগাছের পায়ের পাতা কী আর একটু উঁচু বরাবর ভিজিয়ে রাখার জন্য দাঁড়িয়ে আছে, [illegible] তারা, মাঠের [illegible] ভরপুর চতুর্দিক। জিপটার ইঞ্জিন বন্ধ, পেট্রোল গন্ধ এখনও আছে ওড়ান 'ধুলি'র ধুলোর সঙ্গে।

গাড়ির শব্দে আশেপাশে দাঁড়িয়ে পড়েছে কটা ছেলে মেয়ে। এদিকে ওদিকে কৌতূহলী

চোখ। দু'পাশে ঘর, খড়ো চাল, টিন, মাটির ইটের, শীর্ণ পথ বা কুল, জিপ গাড়িখানাই খেয়ে বসেছে। এগিয়ে আসছে এ দিকে দু'চার জন। দুলাল নন্দী নেমে এসেছে। কিন্তু গোপালের কাছে তো একক প্রতিমার দৃশ্য। তিলডাঙা তার শৈশব প্রেমকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

'তুমি এখানে!'

'বা, এটা তো আমার শ্বশুরবাড়ির গাঁ।'

দুলাল নন্দী বলল, 'আরে চেনেন নাকি?'

গোপাল বুঝি সেই কিশোর। হাসে, 'চিনব না? কোথা যাচ্ছ।'

'ঘরে।'

'আমি তোমার ঘরে যাব।'

'ঠিক আছে, এসো।' কতদিন পর দেখা হল।

পিতিমা হাসল। চোখের কোণায় এক রহস্য দাগ টেনে বলল, 'কাজ সেরে আমার ঘরে আসবে। আমি চলি।'

'হ্যাঁ, দুলালবাবুর সঙ্গে কথা সেরেই যাচ্ছি। কিন্তু ঘরটা কোথায়?'

দুলাল নন্দী অন্তরঙ্গতা টেনে ঠোঁটে হাসি, বলল, 'আরে কথাবার্তা বলে আমিই নিয়ে যাব ওর ঘরে। গাঁয়ের বউ। আমাদের সমুর বউ।'

গোপাল সরকার জয়পুর হ্যাচারিজের ফিড ডিপার্টমেন্ট দেখাশুনা করে। কলকাতার বেলঘরিয়ার পোলট্রি এণ্ড ক্যাটল ফিড কারখানা। তার বয়স চল্লিশও পূর্ণ হয়নি। ফরসার দিকে ঢলা বর্ণ, গোল ধরণের মুখমণ্ডল, শান্ত এবং বুদ্ধিময়তার ভাব তাতে। সাধারণ মাপের দীর্ঘ, মাংসের পরিমিতিতে স্বাস্থ্য সৌন্দর্য আছে। প্যাণ্ট শার্ট পরে, কিছুটা জেদি মানসিকতা এবং কর্মই জীবন কর্মহীনতাই মৃত্যু, এমন আপ্তবাক্যে গভীরতর বিশ্বাসী। মালিক হরিপ্রিয় সাহার অত্যন্ত স্নেহভাজন। বিশ্বস্ততা এবং কর্মকুশলতায় সে প্রমাণ দিয়েছে তার অনন্যতার। সাহা পরিবারের একজন হয়ে উঠেছে সে। ফিড ডিপার্টমেণ্টের ফুল চার্জ, ক্লার্ক টু লেবার ম্যানেজারি করলেও টোটাল হ্যাচারিজের সে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি। ওদের পারিবারিক আলোচনা অন্য ব্যবসা সংক্রান্ত ব্যাপারেও হরিপ্রিয় গোপাল সরকারকে নিয়ে বসেন।

হরিপ্রিয় সাহার বয়স ষাট পেরিয়েছে। ধুতির উপর ফিনফিনে খাদির পাঞ্জাবি সর্বদা। জৌলুস কমে না, ভাঁজে নষ্ট হয় না। চোখে গোল্ড ফ্রেমের চশমা, সামান্য টাক, ধপধপে ফরসা রঙ, মেদবহুল সামান্য ভারী দেহ। আর্থিক স্বচ্ছলতার লাবণ্য মানুষটার পায়ের জুতোর চমকানি থেকে মাথার কালো চুল পর্যন্ত ব্যাপ্ত। ব্যক্তিত্বময় চাউনি, বুদ্ধিমত্তা, সংযমী উচ্চারণ সফল রাজনৈতিক নেতা বানিয়ে দিতে পারত। ওদিকে যাননি। তবে সফল তো হয়েছেন ব্যবসায়। সফলতার নিজস্ব জ্যোতি বিম্বিত হয় চোখে, মুখে, শব্দপাতে এবং ঠোঁটের সিগারেট পর্যন্ত তার ধোঁয়ারেখায় স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে।

বর্ধমানের সুন্দরপুরে বাড়ি। বাবার জমিজায়গা ছিল, তার সঙ্গে ছিল ধানচাষের ব্যবসা। হরিপ্রিয় যৌবনেই সেটা হাতে নিয়ে ক্রম উন্নতির সিঁড়ি ঝট ঝট টপকে ধানকলে প্রতিষ্ঠা দেয়। বড়লোক শ্বশুরবাড়ির সুবাদে কিছু সম্পদ সঞ্চয় আসে। তারপর কোল্ড স্টোরেজ,

পেট্রোল পাম্প, সিনেমা হাউসে সম্পত্তিকে বহু গুন করে ফেলেন। একান্নবর্তী পরিবার। তিন ভাইয়েব সংসার। হরিপ্রিয় মেজ, সে ব্যবসায় আছে, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয় পরিবার পরিচালনায়। যৌথ সংসারটি চমৎকার এক দৃষ্টান্ত। এ পরিবারের সংবাদ ছবি সমেত খবরের কাগজে ছাপা হয়েছে। হরিপ্রিয়র দু ছেলে এক মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ইংল্যাণ্ডে ডাক্তার স্বামীর কাছে থাকে। দু'টি ছেলেই ব্যবসায়। বিষ্ণুপ্রিয়ের তিন মেয়ে। তাদের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। কৃষ্ণপ্রিয়ের এক ছেলে এক মেয়ে। ছেলেটি কলেজে পড়ে। মেয়ে স্কুলে। পরিবারে কারও ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট নেই। প্রয়োজনে তারা বিষ্ণুপ্রিয়র কাছ থেকে টাকা পায়। অঙ্ক বেশী হলে বড়বাবুর অনুমতি নিতে হয়। খবরের কাগজের সাক্ষাৎকারে আজকের দিনেও একান্নবর্তী পরিবার হরিপ্রিয় কী ভাবে টিকিয়ে রেখেছেন তার উত্তরে বলেন, 'বিশ্বাস। আস্থা। আমাকে ওরা শ্রদ্ধা করে। শ্রদ্ধা শব্দটার প্রকৃত অর্থের কথাই বলছি।' কতদিন টিকে থাকবে জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেন, 'আমার মৃত্যুর পরও থাকবে। পরিবারের কারোও কোন অভিযোগ নেই। ঝগড়া বাধানব পর মিটমাটের চেয়ে যাতে ঝগড়া না বাধে আমরা তেমন পরিস্থিতিকেই ধরে রাখি সকলে মিলে। মনে রাখবেন আমি কর্তা নই, এ পরিবারের একজন সদস্য, একজন কর্মী মাত্র। আমার অন্যায়ের বিচার করার অধিকার ওদের আছে।'

গোপাল সবকারকে হরিপ্রিয়ই পাঠিয়েছেন তিলডাঙায়। তিলডাঙায় একটা বিরাট প্রজেক্ট হবে। জয়পুর হ্যাচারিজের শাখা। মূলের চেয়ে বৃহত্তম হবে এই শাখাটি। তারই প্রাইমারি সার্ভে। তার দায়িত্ব এখন। পববর্তী কাজ হবে ধাপে ধাপে। ফিড ডিপার্টমেন্টের অন্য কাজকে ছেড়ে ব্লু প্রিন্ট তৈরী করতে হবে তাকেই। গোপাল সরকার বুঝেছে জয়পুর হ্যাচারিজের দু'টি প্রজেক্টই তার উপবে চাপবে। কেননা বর্তমান ম্যানেজার অনিল চক্রবর্তীর কাজকর্ম মোটেই সন্তোষজনক নয়। দত্ত পোলট্রি এণ্ড ডেয়ারিব সঙ্গে অনিল সম্পর্ক রেখে যাচ্ছে। ছেড়ে যাবে জয়পুরকে সম্পূর্ণ ফাঁসিয়ে। গোপাল সরকার সংবাদটা শুনেই ভেবেছে, মানুষ নিজেকে যে কেন সেরা বুদ্ধিমান ভাবে। হরিপ্রিয়র মত মানুষের সঙ্গে যুঝতে অতিমানুষিকতা থাকা দবকার। অনিল চক্রবর্তী একেবারে ছেলেমানুষ।

হরিপ্রিয়ের স্থান নির্বাচন বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। বীরভূমের এ অঞ্চলের আবহাওয়া মুবগীর দ্রুত বর্ধন সহায়ক। এখানে লেবার কস্ট কম। তেমন কোন ইন্ডাস্ট্রি নেই। মিনি স্টিল, সুগার মিল, পাঁচড়া ময়ূরাক্ষী কটন মিল। তো দীর্ঘকাল বন্ধের পর কটন মিল ধিকিধিকি চলছে। বক্রেশ্বর থার্মাল পাওয়ার কবে যে হবে, কে জানে। সিগাল ফার্ম কিংবা প্যাটেল নগরে খড়িমাটির কারখানা রয়েছে, তার সঙ্গে কিছু ধানকল। নারকেল চাষের উপযোগী জমি না হলেও নারকেল তেলের কারখানা ক'টি হয়েছে। জেলায় কিছু একটা করলে সরকারী মদত মিলবে। এ ব্যাপারে চ্যাটার্জী সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে। তিনি কেন্দ্রে আছেন। হরিপ্রিয়ের ক্লোজ কানেক্টেড় পার্সেন। রাজ্যমন্ত্রী, এম.এল.এ, এম. পির সঙ্গে তাঁকে সম্পর্ক রাখতেই হয়। তবে জায়গাটার হদিশ কে দেয় অর্থাৎ জমির, গোপাল সরকার জানে না। তার উপর নির্দেশ হরিপ্রিয়ের, 'তুমি যাও গোপাল, ট্রেন বাস নয় ডাইরেক্ট জিপে যাবে, সঙ্গে থাকবে কৃষ্ণপ্রিয়। ওর না গেলেও ক্ষতি নেই। আমি তো তোমাকে জানি। তুমিই হান্ড্রেড পার্সেন্ট। দেখা করবে দুলাল নন্দীর সঙ্গে। একেবারে গ্রাসরুটের পলিটিক্যাল লিডার। ও তোমাকে

হেল্প করবে। আমি তোমার ভরসাতেই নামছি। দেখে এস জমি, রাস্তাঘাট, জমির মালিকানার প্রবলেম, পাবলিক আটিটিউড, জল, এভরিথিং। তুমি এলেই একেবারে পাকা সিদ্ধান্ত নেব—ইয়েস অর নট। ভাল কথা, দুলাল নন্দীকে জয়পুর হ্যাচারিজ থেকে এসেছ বললেই বুঝে নেবে।'

হরিপ্রিয় পথ নির্দেশ দিয়েছেন। কী ভাবে তাঁর যোগাযোগ হল বীরভূমের এই তিলডাঙার সঙ্গে গোপাল জানে না। জানতেও চায়নি। বলার সময় হলে হরিপ্রিয়ই বলবেন। কাজ ভালোবাসেন মানুষটা, কৌতূহল নয়। যাহোক কৃষ্ণপ্রিয় শেষসময় আসতে পারেন নি। গোপাল ড্রাইভার শচীনকে নিয়ে এসেছে। শচীন সাহা পরিবারের পুরোন ড্রাইভার। মেমারির লোক। বয়স পঞ্চাশ পেরিয়ে গিয়েছে। সুন্দর স্বাস্থ্য। গোপালের পছন্দের একজন ব্যক্তি। মোটর ড্রাইভিং করতে গেলে মদ খেতে হয়, এমন কথা প্রচারিত আছে। শচীন কুন্ডুকে দেখলে বোঝা যাবে কথাটা কত বড় মিথ্যে। ভদ্রলোক আহারে সাত্ত্বিক। তবে দুধ নিয়মিত চাই। ঘি ছানাও। আনাজপত্র সবই খান। পরিমাণ সবেরই বেশি। দু'টি ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। একজন এম. এ। অন্যটি বি. এস. সি। বি. এস. সি সাহাদের কোল্ড স্টোরেজে আছে। বড় ইংরাজিতে এম. এ, বি. এড করে মেদিনীপুরে শিক্ষকতা করছে। গোপাল শচীন কুন্ডুকে শ্রদ্ধা করে তার কাজ এবং ব্যবহারের জন্য।

দুলাল নন্দীকে পঞ্চায়েত অফিসে সে পেয়ে যায়। তিলডাঙা এলাকাটা সে ঘুরেও এল। ফিরে যেতে দিল না ওপথেই দুলাল ভাগ্যিস্, তাই প্রতিমাকে দেখতে পেল।

তিলডাঙায় বিশাল এক পোলট্রি ফার্ম হবে তার থেকে সে লাভবান হবে, তার গ্রামীণ মন্ত্রীত্বের সিংহাসনটার গায়ে নতুন অলঙ্কার বসবে, এই গোপাল সরকারের প্রাথমিক রিপোর্ট যাতে ভাল হয়, সেই তোয়াজেই তাই দুলাল নন্দীর ব্যস্ততা ছিল। একবার মনে হয়েছে, তিলডাঙাকে নিয়ে কান্ড দেখ। জমি যে সরব হতে পারে তা এসব না ঘটলে বিশ্বাস হত না। আধপাগলা বটুক দেখল, তিলডাঙা কন্যে চাষের কামনায় কাঁদছে, চাষ হবে অফলা ভুঁইয়ে তার জন্যে সে বটুককে উড়িয়ে নিজের পাবলিসিটি করে নিল হবে না জেনেও, স্রেফ পলিটিক্যাল ফয়দা কর্ম, তারপর আবার কী না পোলট্রি ফার্ম। লোকে ভাববে না তো আবার টোপ দিচ্ছে। না, পাবলিক যেহেতু এককাট্টা হতে পারে না, সব বিভক্ত, ফলে শোনে, ভোলে, আবার শোনে। তবে ফার্মই হবে। এ জমিতে চাষ হবে না। উহুঁ, একদা হত। আর কোন জমিই বা জননী হতে পারে না। মায়ের সঙ্গে, 'টি' যোগ হয়ে মাটি। যেন মাটি নির্দিষ্ট করা। তবে খাটতে হত। ওই ভাবনা থেকেই গাঁয়ের জমিটার বিভিন্ন মালিকের চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়া হবে থেকে নানান সুযোগ তার হাতে উঠবে, এতেই মশগুল ছিল মস্তিষ্ক।

এখন সে অন্য ভাবনায় আক্রান্ত। পিতিমা —উহুঁ, গাঁয়ে প্রতিমার চালু বিকৃতি পিতিমা নয়, প্রতিমা বলতে হবে। প্রতিমা যে জয়পুর হ্যাচারিজের পরিচিত। এই মানুষটির চেনাজানা প্রত্যক্ষ করা সার্পিল রেখায় নানারকমের নির্মাণ করে চলল। সমুর সন্তানহীনা বিধবা। উহুঁ এখন তো কুমারী ঢঙে ঢাঙে রূপে চরিত্রে। তার কাছে তো আকর্ষণের অনন্যা কামিনী। দেখামাত্র রক্তধারা নাচে। কিন্তু ধরার জন্য যত কূৎ কৌশল তা ব্যর্থ। তবু ধরার চেষ্টা, তবু তৃষ্ণা। পোলট্রির এই সরকার ব্যক্তিটি প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে না তো! চোখে মুখে কী ফুটে উঠেছিল

উভয়ের? কথা যে সামান্য হল তাতে কিসের ইঙ্গিত? নিছকই চেনা জানা? অতীতের আঠালো সম্পর্ক নেই তো? প্রেম মরে না, পুরোন প্রেম ফিরে যদি আসে পাকাপোক্ত হয়ে। ভাবনা নির্মিতিতে ক্ষোভের বৃষ্টিও নামে, ও এত পুরুষ টানে কেন? ওর দেওর নিমু কামে পোড়ে, আধপাগলা বটুক ছুটে আসে, গা তাকে চাটতে দেয়। সে দেখা মাত্র কামজর্জর ভাদুরে কুকুর হয়ে পড়ে, অন্য পুরুষেরা তিলডাঙার যে যুবতী শরীরের দরজায় হামলায় না, তা না, তারপর এই সরকার। কেন যৌবনবতী কী অন্য কোন রমণী নেই। ভাবে এর দোষ নারীর শরীর। ঈশ্বর, ওর ভাগ্যলিপিতে একক পুরুষ হিসেবে আমার নাম কেন যে লেখেনি।

মা উঠোনে দাঁড়িয়ে। দুলাল নন্দী, 'আমার মা, ইনি বর্ধমান থেকে এসেছেন' বলে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। ওদিকে দরজা গোড়ায় বন্দনা। দুলাল স্বর বিষণ্ণ করে দ্রুত গলায়, 'আমার স্ত্রী অসুস্থ, ক্রিটিক্যাল ডিসিস স্ত্রীরোগ, চিকিৎসা চলছে এখন একটু সুস্থ। আসুন, সামনের ঘরে।' টেবিলের সামনের জোড়া চেয়ার দেখিয়ে বলল, 'বসুন। আমি আসছি, জানি খাওয়া দাওয়া করে এসেছেন, গাঁয়ে কিছুই তেমন পাওয়া যায় না, তবু আপনি তো গেষ্ট, কিছু না খাইয়ে ছাড়ি কী করে। ভাববেন না বিরাট আয়োজন করতে পারব। তারপর কথাবার্তা হবে। দাঁড়ান আসছি।' অল্পপরেই ফিরে আসে দুলাল নন্দী। যেন প্রসঙ্গ পিতিমা, হ্যাচারিজ নয়, ওটাই জরুরী বলে, 'প্রতিমা, মানে ঐ সমুর বউ। খুব দুঃখজনক ব্যাপার সমুটা অল্পবয়সে মারা গেল। তবে কী জানেন, গাঁ আমাকে খানিকটা মান্য করে, স্বামীর সম্পত্তির পূর্ণ ভাগ পাইয়ে দিয়েছি। নইলে কী দশা যে হত।'

'ওর স্বামী মারা গিয়েছে?'

'আপনি তাহলে কোন খবরই রাখেন না? দেখলেন না সিঁথিতে সিঁদুর নেই।'

'গাঁয়েই তো যাই না খবর রাখব কী!'

'ও আপনার গাঁয়ের মেয়ে। কিন্তু সমুর শ্বশুরবাড়ি তো সাঁইথের কাছে কি যেন গ্রাম!'

'গদাধরপুর। আমিও তো ওখানকার লোক।'

'বলেন কী, আপনি বীরভূমের। তাহলে তো ফেবার পাওয়া যাবে। রিপোর্ট ভালোই দেবেন, আমি ধরেই নিতে পারি, কাজটা হচ্ছে। আমাদের ডিস্ট্রিক্টে কোন ইণ্ডাস্ট্রি তেমন নেই, কোন মাইনও নেই। সেচ এলাকার চাষ তো রক্ত দিয়ে হয়। আপনারা যদি না করেন, বীরভূমের লোক হয়ে যদি না দেখেন।' একটু থেমে বলে, 'আমি কী হোপ করতে পারি আপনার কাছে।'

গোপাল বলল, 'কেমন করে বলি বলুন তো। বিবেচনা তো ওরা করবেন।'

'আমি ওই মৌজার জমির মালিকদের লিস্ট বানিয়ে ফেলছি। কোন ঝামেলা হবে না।'

'লিস্ট শুধু নয়, তাদের ঠিকানাও। সব শরিকদের চাই আমাদের।'

সিঙ্গারা, ভেজিটেবিল চপ, মিষ্টি চা খাওয়ার পর গোপাল সরকারের প্রতিমার ঘরে যাওয়া হল বটে, কিন্তু আলাদাভাবে কথা বলা সম্ভব হল না। দুলাল নন্দীর সব সময়ই চোখ। ফেরার পথে গোপাল বুঝতে পারছিল, প্রতিমা বড় কষ্টে আছে।

প্রতিমা তার দৃষ্টিতে ছুঁড়ে দিয়েছে তার কিশোর প্রেম। দু'চোখে এঁকেছিল তাকে ফিরেই আকাঙ্খার রঙিন আলোর মালা। আসার সময়ও তো বলেছে, 'আবার এসো।' অনুচ্চারিত ছিল, তোমার জন্য বসে থাকব গোপালদা।

একদিন তো বসে থাকতেই চেয়েছিল। কিন্তু তার সাহস ছিল না, সামর্থ ছিল না। কলেজ পড়ুয়া একটা ছেলে বলতে পারে নি স্কুলপড়ুয়া একটা মেয়েকে, 'আমি তোমাকে জায়গা দেব তুমি আমার বৌ হবে।' উপরন্তু বাড়ির প্রবল চাপে সে বাধ্য হয়েছিল কলকাতায় পালিয়ে আসতে। একবারের জন্য যদিও সেই পলায়ন পর্বে মনে হয়েছিল, প্রতিমার কাছ থেকে পালান নয়, প্রতিমাকে নিয়েই সে তো বাড়ি থেকে পালাতে পারত। উত্তরপাড়ার দাদার বাসাতে থাকা, তারপর হিন্দমোটরে বাড়ি, বাবার মৃত্যু, মায়ের চলে আসা, বি. এস. সি. পাশ করে চাকরির সন্ধান, হরিপ্রিয় সাহার সংস্পর্শ। বিয়ে করা হয়নি। শরীরে কামনারা কখন কীভাবে যে নিঝুম হয়ে গিয়েছে। জেগে উঠলেও লাই পায় না ব্যস্ত দায়িত্বপূর্ণ জীবনে! মুরগীর খাবার, গবাদি পশুর খাবারের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহ তারপর যন্ত্রে মিশ্রণ, সাপ্লাই, অতগুলো কর্মচারি, তার সঙ্গে সাহা পরিবারের অন্য ব্যবসায় জড়িয়ে থাকা, নিজের জন্য সময় কতটুকু! মা দাদা বৌদি কী অন্য আত্মীয়ের কতবারই তো বলা হয়ে গিয়েছে বিয়ের কথা, এখন বিয়ে করবে না জেনে সে কথা ওঠে না।

তিলডাঙা থেকে ফেরা সারা পথটাই গোপাল সরকারের মন আবৃত করে থাকে প্রতিমা। দূর নীরব মুহূর্তগুলি, গদাধরপুরের গাছ মানুষ পুকুর এবং প্রাক যৌবন কয়েক ঘণ্টা আগের সময়ের পোশাক পরে সামনে দাঁড়ায়। ফ্রক পরা প্রতিমার ঠোঁটে সলজ্জ হাসি, ঘনঘন শ্বাসপাত, ভয়কাতর চাউনি। সে বুকে ড্রামের শব্দ নিয়ে রক্তের শিরাপথে ঘোড়া ছোটানোয় ব্যস্ত। প্রতিমার বৈধব্য কোন প্রশ্ন না, এ গ্রামের মানুষেরা সুযোগ পাবে কী না উপার্জনের এমন কোন প্রশ্ন না, গোপালের ধাবমানতায় যে নারী দাঁড়িয়ে আছে অদূরবর্তী বৃত্তবিন্দুতে সে প্রতিমা। কিশোরী প্রতিমা। জয়পুর হ্যাচারিজের বৃহত্তম শাখাটি নির্মাণের জন্য কোন খসড়া প্রস্তুত হয় না। তার মনে হরিপ্রিয় সাহাকে কী বলবে তার ভাবনাও আসে না।

শচীন কুণ্ডু বলল, 'কী, মনে হচ্ছে, হবে?'

'হ্যাঁ, প্লেসটা একেবারে আইডিয়াল, দেখি গিয়ে বলি।'

'আপনার ইয়েস বড়বাবু কোনদিন নো করে না। মেয়েটা কে?'

'আমার পরিচিতা। গাঁয়ের মেয়ে।' কথা ঘোরাতেই বলে, 'দুবরাজপুরে চলুন।'

শচীন কুণ্ডু স্টিয়ারিং ধরে বসে। সামনে তাকিয়ে থাকে।

গোপাল সরকারের তিলডাঙা আসা এরপর একমাসের মধ্যে আরোও তিনবার। সঙ্গে লোকজন প্রত্যেকবারই। খসড়া প্রস্তুত হচ্ছে ওদিকে। এসে সেদিনই ফেরা হয় না। দুলাল নন্দীর অতিথি হতে হয় বটে, কিন্তু পিতিমার ঘরে সে খায়। স্থানীয় আবহাওয়া বোঝার জন্য একা সে ঘোরে, কথা বলে। দুলাল নন্দী পলিটিক্যাল লোক। অপজিসনে রয়েছেন অবনীবাবু। তারসঙ্গেও কথা হয়। ব্যবসায়ীর সব রাজনৈতিক দলকেই তোয়াজ করা কর্তব্য। তবে হরিপ্রিয় সাহার খুঁটি অনেক উঁচুতে বাঁধা। বিশ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা নিয়োগ তিলডাঙায় কোনভাবেই অবথা পর্যায়ে যেতে দেবেন না। গোপালের আসা যাওয়ার মধ্যে তিলডাঙা সংক্রান্ত জ্ঞানের সঙ্গে পিতিমাকেও জানা হয়ে গিয়েছে। এ জানা যেন তার মধ্যে এক নির্মাণ ঘটিয়ে চলেছে। জমির মালিকানায় শরিকদের নাম, ধাম, যোগাযোগ, ইট, রাজমিস্ত্রি, মাপজোপ

ওদিকে কলকাতায় মোশনপত্র, সিমেন্ট, লোহা ক্রয় প্রস্তুতির মধ্যে পিতিমার সঙ্গে কথা, হাসি পাশাপাশি বসে থাকা এক নব সৃজনের অধ্যায় রচনা করে চলেছে। কেমন করে ভুলেছিল সে প্রতিমাকে, কেমন করে ভুলেছিল সে রক্তের ডাক? নারীর প্রতি এত কামনা কেমন করে সংগুপ্ত ছিল? প্রেম কী মরে না? ফিরে এল এতই তীব্র হয়? আকাঙ্খাকায় কালের ছাপ বয়সের ছাপ কী ধূলিস্তরের মতো, সহজে যা সরে যায়? গোপাল শুধু টের পায়, বিচলিত হয়।

পিতিমা বলে, 'দুলাল নন্দীকে সঙ্গ ছাড়া করেছ খুব ভালো হয়েছে।'

'সঙ্গছাড়া করেছি কোথায়? ত্যাগ করলে চলবে কেন? ওই তো মেন পার্সেন।'

'জানি। আর ও নিজে না থাকলেও ওকে তোমার প্রতিটি কাজের খবর দেবার ঢের লোক। শিবু তো খুব পিছনে ঘুরছে তোমার। কে যে দুলাল নন্দীর লোক নয় জানি না।'

'হ্যাঁ শিবু কাজের ছেলে। বুদ্ধিও রাখে। ফার্মে ওর চাকরি যাতে হয় তারজন্যে—।'

'আর বলো না। গাঁয়ে তো এখন ঐ কথা। তোমাকে তো বলবে, তা নয় আমাকেও। তোমার দৌলতে দেখছি আমারও দাম বেড়ে গিয়েছে।'

গোপাল হেসে বললে, 'তোমার দাম আরোও বাড়বে প্রতিমা।'

যেন বিরক্তির রেখা ফোটে ভ্রূ'তে পিতিমার, 'বারবার কেন প্রতিমা বল পিতিমা বলবে।'

'আশ্চর্য! তোমার অমন সুন্দর নামটাকে লোকে কেমন বিকৃত করেছে।'

পিতিমা হেসে বলে, 'মানুষতো নাম বিকৃত করে—বিধাতা যে জীবনটাকেই। কিন্তু গোপালদা তুমি তোমার জীবনটাকে নষ্ট করলে কেন?'

'নষ্ট করেছি কোথায়? কাজের মধ্যে মানুষ বেঁচে থাকে। আমি কাজ করে যাচ্ছি।'

'বিয়ে করনি যে বড়।'

'বিয়ে না করলেই জীবন নষ্ট কে বলেছে। তোমার তো বিয়ে করে জীবন নষ্ট।'

'যা বলেছ! গোপালদা আর ছেলেবেলা ফিরে পাওয়া যায় না?'

'যায় বৈ কী।'

'যায়। ফিরে পাওয়া যায়?' বালিকার মত উল্লসিত স্বরে মাথা ঝাঁকিয়ে পিতিমা বলে, 'তুমি ফিরিয়ে দিতে পার। সত্যি ফিরিয়ে দিতে পার।'

গোপাল বিশ্বাস অটলতায় বলে, 'পারি—আমি পারি।'

পিতিমা মুহূর্তকাল নীরব। তারপরেই যেন ভেঙে যায় বালির প্রাসাদের মত, আলোকিত মঞ্চ অন্ধকার হয়ে পড়ে অকস্মাৎ, অবিশ্বাস মাথা নাড়ায়, 'যাঃ, ফেরানো যায় না।'

তিলডাঙায় বিশাল মুরগী উৎপাদন কেন্দ্র, এত মুরগী খাবে কে থেকে শুরু করে ঘরে লোকে মুরগী পোষে, লাভজনকও বটে, ইত্যাদির সঙ্গে জানতে চায় অনেককিছু, বিস্মিত হয়। গাঁয়ের মানুষদের কথাও তোলে। গদাধরপুরের কথা ওঠে, বাল্যস্মৃতি সেই মানুষগুলি, সেই জীবন।

গোপালই বলে, 'তিলডাঙায় চাষ হবার কথা হয়েছিল।?'

'ওই দেখ, তোমাকে কথাটা বলা হয়নি। হ্যাঁ চাষ হতে পারত। একদিন তো হত।'

'আধপাগলা বটুক [illegible] কী দেখেছিল।'

বটুকের নাম শোনামাত্র পিতিমার চোখের পাতা পড়ে না। সে কৈশোর প্রেমের নিবিড়তায় কখন যেন ডুবিয়ে দিয়েছিল বটুকবাবুকে। এক তীব্র বেগবান জলস্রোত বুঝি সহসা ধাক্কা খায় পাথরগাত্রে। তারপরই তীব্র বাঁক নেয় স্রোত। ঘোর নামে দু'চোখে। স্বর বদলায়, দৃষ্টি স্বপ্নিল হয়, মুখমণ্ডলে সারল্যের দীপ্তিময়তা লাবণ্য ঘষে দেয়। বলে, 'স্বপ্ন নয়। জোৎস্না রাতে স্পষ্ট দেখেছিল তিলডাঙা কন্যেকে। তুমি বিশ্বাস করো, মাটি মেয়েমানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারে, একবারে এই আমার মত? উঁহু, আমার মত কেন, সে মাটি মা জননী, বুকের দুধ টনটন করছে— কে টানে। যেন জোৎস্নায় দুধ ধোয়া সাদা শরীর, চাঁদের টুকরোর রুপালি গয়নার ঝালর, আলোর এত ঝিকির মিকির চোখে দেখা যায় না। আলো ধোঁয়ার তারপর ওড়াওড়ি চারপাশে।'

গোপাল, পিতিমা ক্ষণকালের জন্য থামতেও নীরব। দেখে অন্য নারীকে।

'তুমি হয়তো বিশ্বাস করবে না—আমি করি। ও নিশ্চয়ই দেখেছে।'

'বটুকবাবু!'

'হু। তোমার সঙ্গে ওর দেখা হল না। ইন্দোরে চলে গিয়েছে।'

পিতিমা আবার স্বাভাবিক। বলে, 'গাঁয়ের আসল মানুষটিকেই তুমি দেখলে না। তবে যদি শুনত তুমি এখানে ইঁট, পাথর, লোহার রডের খাঁচা বানাবে, মুরগীর চাষ হবে তাহলে কিন্তু তোমার কাজটায়, এ মা কী বোকা কী বোকা, কিছু বোঝে না বলতে বলতে ছুটে আসত। তুমি যত বড় পণ্ডিতই হও, শুনে মনে হত সত্যিই তুমি বোঝ না।'

গোপাল বলল, 'দুঃখ হচ্ছে আমার সঙ্গে দেখা হল না।'

'ইন্দোর, অনেকদূর বল গোপালদা।'

'হ্যাঁ।'

গোপাল টের পায় পিতিমার স্বর আর্দ্র হয়ে আসছে। গলায় ভেসে উঠছে ভালোবাসার শুভ্র পাখার সঞ্চালনের মৃদুমন্দতার সঙ্গে তাদের কাকলি, যাতে বন্দনাগীতির মত কোন মহিমা বর্ণন হয়ে উঠছে। বটুককে দেখার জন্য তার তীব্র পিপাসা জাগে। যেন সে যাচাই করে নিতে চায়। এই চাওয়াটার মধ্যে সঙ্গোপনে যা থেকে যেতে পারে, তার নাম ঈর্ষা।

কিন্তু গোপাল বটুকের দেখা পাবে কী করে। খবর নিয়ে জানল সত্যিই ও গিয়েছে ওর মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে ইন্দোরে। ওখানে বিমল হাজরা একটা রি ফ্যাক্টারির জেনারেল ম্যানেজার। মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর শিল্পাঞ্চলে কারখানা। অনেক বাঙালিকেই সে নিয়ে গিয়েছে কাজ দিয়ে। সবই অদক্ষ শ্রমিকের কাজ।

আর একদিন গোপাল আসতে পিতিমা বলল, 'তুমি মুরগীর কারখানা করছ কেন?'

'কী করতে হত।'

'কেন? তুমি তিলডাঙার চাষের ব্যবস্থা করতে পারতে। জান, তিলডাঙা সত্যিই কাঁদে।'

গোপাল বলল, 'চাষের ব্যবস্থা করাটা আমার কাজ নয়। তবে যা হচ্ছে তাতে গাঁয়ের মঙ্গল হবে।' ভাবল, বটুকবাবু [illegible]।

পিতিমা চুপ করে থাকে।

'তুমি কষ্ট পাচ্ছ। ফার্ম হওয়াটাই সমর্থন করতে পারছ না, সহ্য করতে পারছ না।'

পিতিমা স্বপ্নময়তার মধ্যে বলে, 'কেমন করে বলি সহ্য করতে পারছি না। এটা না হলে তুমি যে আস না তুমি না এলে— । 'কথা শেষ হয় না। রেশটুকুতে বাঁধা থাকে শোকগাঁথার শেষে শোকহীনতার আগামী।

জোৎস্নায় একদিন তিলডাঙার মাঠে দাঁড়ানোর সুযোগ করে নেয় পিতিমা। সন্ধ্যার পর বেরুতেই বলে, 'দেখছো জোৎস্না উঠছে। কাল পূর্ণিমা। চল আজই তোমাকে দেখাব।' তিলডাঙাকে তুমি জীবন্ত দেখতে পাবে।

'তুমি কী পাগল হয়েছ?'

'চল না গোপালদা!'

'গাঁয়ের লোকে কী ভাববে!'

পিতিমা হেসে বলল, 'তোমার সম্পর্কে কেউ কিছু ভাববে না। কোন কিছুতে দোষ হবে না। লোককে তুমি এখন চাকরি দিতে পার। ভয় কী তোমার।'

জোৎস্নায় মাটির ঘর, রাস্তা, পুকুর, গাছ, ঝোপ, সব কিছুই আলোছায়া চিত্রিত। যে আলোছায়ার চেহারা ভিন্ন মাত্র পায়, কোথাও কোন শব্দ নেই। ভাদ্রের তাপ দগ্ধ দিনের পর সন্ধ্যা তার আঁচল বিছিয়ে বাতাস দেয় খুবই মৃদু। তিলডাঙা শুয়ে আছে নিপাট। তার সবুজ ঘাসের শরীরে এখন শিশির পাতে জোৎস্না বিন্দুরা ধরা।

'গোপালদা তিলডাঙা কন্যে আসবে।'

গোপাল জোৎস্না জলে ভেজা যেন তার শরীরকে দেখে। আলোছায়াময় যুবতীর মুখ, গলা, স্তন, কোমর, নিতম্ব, শাড়ির ভাঁজ, পায়ের নগ্নতা, বাহুর নগ্নতায় রক্তের মধ্যে পুরুষ হরিণের ডাক শোনে। বলে, 'এসেছে। পিতিমা *এসেছে।*'

'কোথায়, কই গোপালদা!'

'এই তো তুমি।'

'কী বলছ!'

'পিতিমা আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি তোমকে বিয়ে করব।'

যেন চতুর্দিক চুরমার হয়ে ভেঙে পড়ে। পিতিমার পায়ের তলার মাটি সরে যায়। খাদ-গামী নয়, যেন অতি দানবীয় শক্তি তাকে তুলে নেয়। যে শূন্যে তার প্রার্থনার স্থিতি। টলমল হয়ে ওঠে অস্তিত্ব। তারপরই টের পায় পুরুষ স্পর্শ। মুহূর্তে সমর্পিতা নারী ঘনিষ্ঠতার তাপ সঞ্চার করতে পুরুষের শরীরে লতা হয়ে যায়। নরম, সুগন্ধি, পত্রময়।

গোপাল এই মাঠে ঘাসে, যেখানে ফলতে পারত ধান, গম, ফসল ঢলঢলে সবুজ প্লাবনে সেখানে গড়ে তুলবে ইঁট কাঠ পাথর লোহা সিমেন্টে কংক্রিটের বাড়ি, করগেট শিট ছাউনি, আমদানি করবে বিদেশী যন্ত্রপাতি, তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক আধুনিক কলাকৌশল, হাজার হাজার মুরগী জন্ম নেবে, ডিম দেবে, মাংস দেবে যান্ত্রিকতায় ক্ষুৎকাতর মানুষের জন্য, সেই সৃজন কর্মের আগে প্রকৃতি শেষবারের মত এই ভূমিতে পুরুষরমণীর ক্রীড়া দেখে। এও ত এক নির্মাণ। নিসর্গ নীরবে সকল নির্মাণের উপরেই শিশিরপাত করে।

নয়

থানার নাম রাজনগর। মৌজার প্রকাশ্য নাম তিলডাঙা। জেলা বীরভূম। মোটা বড়বড় কালো হরফে মুদ্রিত। তিলডাঙা মৌজার ম্যাপ। চিত্র-আয়তন দেওয়া স্কেল ১৬ - ১ মাইল। ১০০ কড়িতে এক জরীপ। ৮০ জরীপে এক মাইল। রেভিনিউ সার্ভে নং ৪২। আকৃতিটা মৌজার পেট মোটা গলা সরু। ছবিতে সরু রেখায় নানান আকৃতির ঘর মাকড়সার জালের ছড়ান। সাদা মাঝারি এবং বৃহৎ ঘরগুলি দিঘি এবং ডোবা। প্রত্যেকটি ঘরেই সংখ্যা বসান। সংখ্যাটিকে বলা হয়ে থাকে দাগ নম্বর। নিচে লেখা ইংরেজি হরফে 'মেড বাই দি অথরিটি গর্ভমেন্ট ইন্ডিয়া।' ১৯২৫-২৭ ব্রাকেটে। তার নিচে সেটেলমেন্ট অফিসার এন্ড সুপারিনটেনডেন্ট অব সার্ভের আঁকা বাঁকা স্বাক্ষর।

ম্যাপখানার বাদামী রঙ ধরা কাগজটার পিছনে কাপড় সেঁটে নেওয়া হয়েছে। এখন তিলডাঙার জমিতে পাতা। অনেক চোখ তার উপর। বসে এবং দাঁড়িয়ে। আমিন এসেছে তিনজন। চেন পড়েছে। তহশিলদার বিপিন, বর্তমান নাম ভূমি সহায়ক, তার পিয়ন, পঞ্চায়েত সেক্রেটারি, দুলাল নন্দী, গোপাল সরকার এরাই মুখ্য। ফিতে পড়েছে, মাপের শিকলি টান টান হচ্ছে। কোদালের দাগ মারা যাচ্ছে। মাপজোপের ব্যাপারটাই সারা গাঁয়ে একমাত্র আলোচ্য। তাহলে জয়পুর হ্যাচারিজ এখানে মস্ত একটা ব্যাপার ঘটাবে। মুরগীর চাষ হবে, ডিম উৎপাদিত হবে, কাজ পাবে অনেক মানুষ, রাস্তাটা পিচের হবে। মুরগী নিয়ে যে এতবড় একটা ব্যাপার হতে পারে তা তো ধারণার বাইরে। সম্ভাব্য ছবি সব মনে আঁকাজোকা যদিও তবে সেটা বড়ই অস্পষ্ট। যে যার ইচ্ছে মত সংযোগ করে যায়।

শরতের মেঘ শূন্যতায় নিত্য আকাশ পরিক্রমারত সূর্য অজস্র তেজদীপ্ততায় দীর্ঘ বিকেল এঁকে পশ্চিমে লীন হয়। চাষের কাজে নিড়ানি পর্ব চলছে। আচমকা মেঘ বাদলায় অসেচ এলাকার জমি প্রাণ সবুজতা ঠিকঠাক পেয়ে যাচ্ছে। ফলে এ বার লক্ষ্মী সদয়া হয়ে কার্তিক অগ্রহায়ণে ঘরে ঢুকবেন। চাষীর অধিক ক্ষেতমজুর, মুনিষ শ্রেণীটির জন্য হ্যাচারিজ মস্ত কাজের সুযোগের দরজা খুলে দেবে নির্মাণ পর্বে খুবই শীঘ্রি, সে ভরসায় এক ফসলী ভুঁইয়ের দুখী ভাদরের সঙ্গে যুঝতে পারা যাবে। এ ভেবে সুখ সুখ বাতাস বাগ্দী বাউরি হাড়ি মুচি ডোমপাড়ায়। দুলাল নন্দী শুনিয়ে দিয়েছে, এও এক প্রকারের চাষ। মুরগী চাষ। ধান চাষ হবে বলা হচ্ছিল, হচ্ছে মুরগী চাষ। কথা থাকল, এটা না হলে তিলডাঙাকে শস্যশালিনী করা হতই। গোঁসাইদহ কাটার খরচা পাশ হয়ে গিয়েছিল।

ভূষণ মালির নাতি নন্টু ফরসাপানা চেহারা, মুখে ব্রণের দাগ, চোখের কোণে কালি, পাজামার উপর শার্ট, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, মাধ্যমিক পাশ করেছে। হায়ার সেকেণ্ডারি মাধাইপুর থেকে।

কর্মাস নিয়ে। ইংরাজীতে ব্যাক। ফটিক সাধুর মেয়ে টিয়া। দশম শ্রেণীর ছাত্রী, তার সঙ্গে প্রেমের প্রাথমিক পর্ব চলছে। টিয়া হেঁটে আসছে দত্ত পুকুরের উত্তর পারের রাস্তা দিয়ে। হাতে একখানা বই, কোন বন্ধুর কাছ থেকে নিয়ে আসছে। কোন কেন শ্যামলীর কাছ থেকেই হবে। ওদিকে তো ওদেরই বাড়ি। টিয়ার পাতলা ঠোঁট, ছিপছিপে চেহারা, মাথার চুল, গোলাপী চুড়িদারে একট যেন গোলাপ। লক্ষ্য করেছে নন্টু দূর থেকেই। দেখা এবং গন্ধে রক্ত-রক্তে নাচন। এখন স্বপ্নে টিয়া, মস্তিষ্ক কোষের নাচনে টিয়া, বর্তমানে টিয়া, ভবিষ্যতে টিয়া, আলোয় টিয়া, অন্ধকারে টিয়া। সে ভিডিওতে শ্রীদেবী, মাধুরী দীক্ষিত, জুহি চাওলা, করিশমা, কাজলনয়না বরাবর টিয়াকে দেখে। নানান কাম উদ্রেগকারী বিভঙ্গে, নানান সাজে।

এখন সে দ্রুত চোখে পড়ে নেয় নির্জনতাকে। ঝকমকে রোদ। বর্ষা পেরোনো দত্তপুকুর টলমল। চারপাশে সবুজ গাছ, তেঁতুল থেকে খেজুর—কী নেই, শ্যাওড়া, আমড়া, একটু পাকুড় অর্জুন, চাবড়া ঘাস, ঝোপ, সবই উষ্ণ বাষ্পে মাটির সঙ্গে নিজেদের সেঁক্ খাওয়ার গন্ধ ছড়াচ্ছে। সে দ্রুত পায়ে ধরে ফেলে টিয়াকে।

কিশোরী দেখে। সামনে এসে 'কোথা গিয়েছিলে' জিজ্ঞাসায় যেন রুপোলী পাখনার নড়াচড়া, চক্চকে পিচ্ছিল মাছ। মুখ রাঙা হয়। না মাছ নয়, শ্বেত কবুতরী। ডানা ঝাপটায়, ওড়ে না, টলমলে হলেও নখে ধরে রাখে হাতের পাতা। চোখের পাতা ওঠায় নামায়, পাতলা ঠোঁটের বঙ্কিম রেখাপাতে বুঝিয়ে দেয় সলজ্জতার মোড়কে গোপনীয়তাকে সে ঢেকে রাখছে

'যেখানেই যাই তোমার কী!'

'জান তো জয়পুর হ্যাচারিজের কাজ হচ্ছে।'

'তাতে কী। নাচতে হবে?'

'তোমার যা ফিগার বটে, নাচলে যা দেখাবে।। কালকে চিত্রহার দেখছ। রেখা—'

'কী অসভ্য!'

নন্টু বোঝে তাকে নয় রেখাকে বলা হচ্ছে। হেসে বলে 'খারাপ কী।'

'তোমার তো ও সবই ভালো লাগে।'

'না।'

'মিথ্যে বল না। তুমি তো রোজ ভি ডি ও দেখ।'

নন্টু সুযোগ পেয়ে যায়, 'যাবে, বচ্চনের বই আছে আজ?''

শক্তগলায় টিয়া বলে, 'না।'

হতাশ হয় নন্টু। উজ্জ্বলতাকে আবার ধরতে বলে, 'হ্যাচারি হলে আমার চাকরি হবে। অবনীদা বলেছে। স্থানীয় বেকার যুবকদের অগ্রাধিকার চাই। আমরা দাবী করব।'

টিয়া বড় বড় চোখ করে দেখে। বিশ্বাস চোখের পাতায় আগামীর কাজল রেখা টানে।

'বিপ্লব কাকে বলে জান?'

'কেন জানব না। ফরাসি বিপ্লব, রুশ বিপ্লব—'

'আমরা বিপ্লব করব,' নন্টু রোগা বুক প্রশস্ত করে।

'চাকরির জন্য ধর্না দেবে। ওকে বিপ্লব বলে নাকি?'

'ওই হলো, বড়ো করে বলতে দোষ কী।'

'বাবা কিন্তু দুলালকাকুর লোক মনে রেখ। তুমি অবনীবাবুর দলে।'
'তাতে কী।'
'আমি জানি না।' টিয়া দ্রুত পায়ে চলল। তারসঙ্গে গলা ভারী করে বলল, 'সঙ্গে এস না। লোকে সন্দেহ করবে। বামুনদের ঘাটে কাকীমা বসে রয়েছে, দেখতে পাচ্ছ না। হাঁদা।'
'ভি ডি ও যাবে?'
'সত্যি, হ্যাচারিতে তোমার চাকরি হবে;' যেন হ্যাচারির চাকরি হলে সে যেতে পারে। সিঁথিতে সিঁদুর, হাতে শাঁখা নোয়া, মাথায় ঘোমটা টিয়া স্বপ্নিল হয়।
'সিওর। ওদের অনেক লোকের দরকার। তাহলে কী ভি ডি ও আসছ?'
'না।' তারপরই টিয়া পাতলা ঠোটে নন্টুর পক্ষে মারাত্মক একটা হাসি ছুঁড়ে দিয়ে গেল।
সদুজেঠীর কুচকুচে কালো বর্ণ, মাথায় খাটো কাঁচাপাকা চুল, মোটাসোটা চেহারার বিধবা মহিলা। ঠাকুর দেবতা জাতপাত, শুচি অশুচি, হিন্দুধর্মের সংস্কার জাত নিষ্ঠাবোধ বড়ই তীব্র। ঘরে পাঁজি আছে বহু বৎসরের। তিথি নক্ষত্র, পূর্ণিমা অমাবস্যা লাগাছাড়া পুজো-আচ্চা উপোস এসবের নির্দেশ পাড়ার মহিলামহল গ্রহণ করে থাকে। মুরগী নিয়ে এমন কাণ্ডকারখানায় মহিলা একটা বিষয়ে স্থির নিশ্চিত দেশ জহন্মামে যাচ্ছে দ্রুত; এবং 'কলি শেষে এক বর্ণ হইবে যবন, কলি অবতারে তাহা করিব নিধন' কল্কি পুরাণের শ্লোকটি সত্য হবার পথে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। কলির ফল যাবে কোথায! সত্য দ্বাপর ত্রেতার পর কলি এসেছেন। মাকে ভাত দেবে না, শাশুড়ি হবে মা, এ তো ফলছে। মিথ্যের জয়, সত্যের দুরবস্থা তো প্রত্যক্ষ হচ্ছে। সাধু অনাহারে অসাধু সিংহাসনে এ তো এ কালের ধর্ম। এটা হতে দেরী নেই, যখন মানুষ খর্ব্বকায় হয়ে যাবে, বেগুন পাড়তেও আঁকশি লাগবে।
আধপাগলা বটুক লক্ষ্মী ঠাকুরুনকে দেখেছিল তিলডাঙায়। চাষ হলে লক্ষ্মী হাসতেন। কোমরে কড়ির ঝাঁপি, হাতে ধানের শিষ, পায়ের কাছে পেঁচাটি নিয়ে সোনায় ভরিয়ে দিতেন। হতভাগা দেশ, হতভাগা কলির মানুষ। কলকল করে বেড়াবে মুরগী। হাজার হাজার মুরগী, যে মুরগী অচ্ছুৎ। যার ডিম কী মাংস অভক্ষ্য সংসারী মানুষের। পুরুষ মানুষেরা বাইরে খেতে পারে বটে, কিন্তু ঘরে ঢুকবে না ডিম কী মাংস। মুরগী ঢুকে গেলে তো প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। 'ভদ্দরলুক' পাড়ায় মুরগী পোষার রেওয়াজ নেই। ইদানীং ঢুকছে। সদুজেঠী বলে, 'তোদের জেঠাখেত, তবে ঘরের বাইরে। মাটির হোলায় রাঁধত। পাতে খেত। তারপর খেয়ে চান করে ঘর ঢোকা। সেই মুরগী, মাগো যাব কোথা!'
পুকুরঘাটে আদিত্যর বৌ দুর্গাপুরের মেয়ে অঞ্জনা বলল, 'ব্রয়লার আর পোল্ট্রির ডিমই তো দেশকে বাঁচিয়ে রেখেছে।'
সদুজেঠী স্নেহশীল অঞ্জনার উপর। মুখ বেঁকিয়ে বলল, 'এতদিন দেশ মরে ছিল।'
অঞ্জনার শ্যামলা বর্ণ, টলটলে মুখ। বি এ পাশ। আদিত্য রামপুরহাটে শিক্ষকতা করে। এম. এস. সি। গাঁয়ে মা, ছোটভাই, বাবা। শনি রবিবার আসে গাঁয়ে।
অঞ্জনা বলল, 'মরে থাকবে কেন। তবে লোক কম ছিল। এত খাদ্য টান ছিল না। জানেন তো হাঁসের ডিমের দাম কত হতো যদি পোলট্রির ডিম না আসত।'
'তা বলে নোংরাঘাঁটা মুরগী। হাঁস কত ভাল। মা সরস্বতীর বাহন। আজে বাজে খায় না!'

'কে বলেছে খায় না। তবে ব্রয়লার মুরগী তো বাজে কিছু খায় না। তৈরী ফিড খায়।'
'জানি না বৌমা। তোমাদের মত অত বিদ্যেবতী তো নই।'
অঞ্জনা সকৌতুক চোখ নাচানি নিয়ে বলল, 'আমাকে গাল দিলেন।'
সদুজেঠীর চোখ কপালে, 'যাব কোথা! গাল কোথায় দিলাম বৌমা?'
'ওই যে বিদ্যেবতী বললেন।'
'বলব না। তুমি বি. এ. পাশ বৌ।'
'তা হতে পারি, কিন্তু কোন কাজ আপনাকে পারব বলুন তো! বাড়িয়ে বলছি না, আপনার মন ভোলাতেও না। সত্যি কথা বটে, আপনার ছেলেও বলে, জেঠীমার সঙ্গে কোন ব্যাপারে আজকালকার মেয়ে পারবে না। রান্না থেকে বড়ি দেওয়া, এদিকে রামায়ণ মহাভারত, ভাগবতেও না। শুধু ইংরাজীতে। তা ইংরেজী কোন কাজে লাগে।'
সদুজেঠী বিগলিত হল প্রশংসায়, 'আদিত্য বড় ভাল ছেলে। তুমিও মা গুণের মেয়ে। তবে মুরগী পোষা যতই ভাল বল, আমি মানতে পারছি না।'
'মুরগী নিয়ে এত কাণ্ড না হলে, পাঁঠার মাংস, হাঁসের ডিম লোকে দেখতে পেত না। মাংস ডিমে ভিটামিন আছে। স্বাস্থ্যের জন্যে ও দু'টো দরকার।'
'ও কথা বলো না। মাছ, মাংস, ডিম না খেলে মানুষ বাঁচে না? খুব বাঁচে! মানুষ তো আর বাঘ শিয়েল নয়। কেন দুধ ঘি কী কম! হোক মা, যা হবার হোক। আমি মানে মানে চলে যেতে পারলে বাঁচি।'
ঘাটে এসে দাঁড়াল পঙ্কজের মা। ওদিকে বাসনের ডাঁই নিয়ে এলো দত্তদের ঝি। পিছনে কালো একটা কুকুর। একপাল হাঁস বাসন নামতে দেখে ঘাটের দিকে এগিয়ে এল। এঁটো বাসনে খাদ্যকণা থাকে।
সদুজেঠী উঠে পড়ল, 'দেখ দেখি কথা বলতে বলতে দেরী হয়ে গেল। একাদশীর দিন—সকাল থেকে মুরগীর কেচ্ছা। রাম। রাম।'
পঙ্কজের মা বলল, 'এখন তো গাঁয়ে ঐ একটাই কথা। আজ মাপজোক হচ্ছে।'
ঘরের মাঝ দিয়ে রাস্তা। নাম কুলি। এদিকের চারঘর বামুন থাকার ফলে বামুনপাড়া।
আবু চক্রবর্তী ফুলের সাজি হাতে নিয়ে নারায়ণ সেবায় যাচ্ছে। রাস্তার যা দশা মানুষ কী কুকুরের মল থাকতেই পারে। তার পদক্ষেপ তীক্ষ্ণ নজর দিয়ে, এখানে এক পা তো ওখানে। গু আর গোবর সব একাকার। মাটির রাস্তার রাজ্যের জঞ্জাল জায়গা করে নেয়, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, ছেঁড়া ন্যাকড়া, নোংরা কাগজ, এঁটো শালপাতা, চোষা চাটনির আমড়া আঁটি। স্নানের পর কালো বেঁটেখাটো শরীরে লালপাড় গেরুয়া রঙের ধুতি, কাঁধে ভেজা গামছা। চোখ নিচে। মনসাঘরের বাঁকটা নিতেই হ্যাংলার গলা থমকে দিল।
'ও ঠাকুর আমি এসে গেইছি। জামাইদাদা ভাত দিবে না— কিল মারবার গোঁসাই।'
হ্যাংলার খাকি রঙের টলটলে হাফপ্যান্ট, উদোম গা, মাথায় খয়েরী চুলের রাশ এলোমেলো। গায়ের বর্ণ কালো। বাউরিদের ছেলে। ওর বাপ শম্ভু তেঁতুলগাছ থেকে পড়ে আর ওঠেনি। মা কবেই সরে পড়েছে। দিদি ছিল একটা। তার বিয়ে হয়েছে রাজনগরে। সেই দিদির কাছে গিয়েছিল হ্যাংলা দিন পনের আগে। দিদির কাছে থাকবে অনেক দিনেরই মতলব। এখানে

পেট ভরে না। গরুবাগালি করে বেনে ঘরে। ওরা ভাত দেয়। কিন্তু খাই খাই মেটাতে পারে না। রোগা ডিগডিগে চেহারা, হেঁড়ে মাথা সিড়িঙ্গে, শুধু বিধাতা সৃজনের সময় রূপবান করাব মতলবটায় চোখ জোড়া স্থাপনের সময় বুঝি চিন্তা করেছিলেন। উজ্জ্বল, মায়াময়, সরল।

দিদির ঘরে জামাইবাবু বসিয়ে কতদিন ভাত দেবে। বকাঝকা একদিন পিটুনি দিতে আবার ফেরা। দিদি বলেছে, 'যা ভাইটি, বাগালি করছিস্ উখানে থাক গা। তবু তো দুবেলা ভাত খেতে পাবি।

রায়দের নারায়ণ। নিত্য সেবায় অন্নভোগের ব্যবস্থা আছে। একদার জমিদারী প্রতাপ কবেই তিরোহিত। শরিকরা সবাই রাঁচি এবং ডালটনগঞ্জে। নারায়ণের জমি চাষ করে বুধো মাঝি। ধান দেয় অজিত চাটুজ্জেকে। অজিত পত্নী বড়ই ধর্মপরায়ণা। নারায়ণ সেবার ভাতের সঙ্গে বিবিধ ব্যঞ্জন থাকে, দুধ থাকে, কখনও মিষ্টি। এগুলি পুরোহিত আবু চক্রবর্তীর ভোগে লাগে। নারায়ণ একটি কালো মসৃণ ক্ষুদ্র ডিম্বাকৃতি শিলা। সোনার একটা সরু তার তাকে ঘিরে। তার নয় ওটি পৈতা। নারায়ণ স্নানের পর ওটি কি ভাবে যেন খসে পড়ে। তারপর ফুল বেলপাতার সঙ্গে পুকুরঘাটে। সে নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড। ঘাটে ছিল পদ্মার দিদি শালুক। সে পেয়েছে অনুমান অজিত পত্নীর। এ নিয়ে ঝগড়াঝাটি। শেষ পর্যন্ত মেলেনি। নারায়ণ অবশ্য জোড়া পৈতে পেয়ে গিয়েছেন। দেবতাদের কোন ব্যাপারে কখনও কিছুর অভাব হয় না। মানুষ নিজে অপূর্ণ থেকেও দেবতাকে পূর্ণ করে যায়।

নারায়ণের ভোগে হ্যাংলার বড়ই লোভ । সে পুজোর সময়টা শত কাজ ফেলে বসে থাকে। থালা থেকে সব মিশিয়ে একটা মণ্ড পাকিয়ে আবু চক্রবর্তী দেন। মণ্ডটি এক হাতেই ধরে যায়। হ্যাংলা বলেছিল, 'একটা থালা আনব, একড়ুং করে দিবে সবই।' আবু চক্রবর্তী বলেছে, 'পেসাদ হাতে নিতে হয়। পেসাদ কী পেট ভরে খায় হারামজাদা?'

হ্যাংলার উপর একটা চেখ পড়ে। মুখ বিকৃত হয় আবু চক্রবর্তীর । শুখো ঠোঁট, কাঁচাপাকা খোঁচা দাড়ির চোপসান গালে রেখা ওঠে, 'নেহাল করেছ। তাই তো ভাবি ছোঁড়া জ্বালাতে আসে না কেনে, মরতে গিয়েছিল কোথা?'

'দিদির ঘর। জামাইদাদাটি হারামজাদা। আজ চারটি বেশী পেসাদ চাই, দুটো ডাব দিও।'

'ছিঃ ছিঃ এখনও নারায়ণে নিবেদন করলাম না, তুই যে মহাপাতক হবি। ঠাকুর খাক।'

'ঠাকুর আবার খায় নাকি— দিষ্টি দেয়।'

'মহাপণ্ডিত হয়েছ তুমি। কিন্তু বাগালি আছে ত? নাকি ভিনু মান্দের রেখেছে!'

'আছে।'

'বাঁচালি— তোর যা খাই।'

'আর খাই খাই থাকবে না। আমি চাকরি করব জয়পুর হ্যাচারিতে।' হ্যাংলা বলে, 'মুরগীর গু ফেলতে হবে। দিনে দশ টাকা।'

আবু চক্রবর্তী ছিঃ ছিঃ করে, 'মুরগীর গু ফেলবি বলে আহ্লাদ করছিস্।'

সাইকেল থেকে নামল সহদেব, 'হ্যাংলা কী বলছে?'

'ওর কথা বাদ দাও।' আবু চক্রবর্তী বলে, 'পেট পেট করে ছোঁড়া ম'ল।'

'দুনিয়ারই ওর হাল ঠাকুরমশাই। বুঝলেন।'

হ্যাংলা কথা শেষ করতে দেয় না, 'মুরগীর গু ফেলব হ্যাচারিতে— চাকরি হবে আমার।'
সহদেব বলল, 'গাঁয়ের তো সবার চাকরি হচ্ছে। তোর কেন বাকী থাকে। কী যে করবে কোম্পানি। শেষ তক্ না বন্ধ করে দেয়। যাদের জমি যেছে টাকা পাবে ঠিকই তবু তো ল্যাণ্ডলুজার, কোলিয়ারি এমন জমির মালিককে চাকরি দেয়। এদেরও দিতে হবে— আইন'
'আইন যে কত চলছে। দুলাল যা বলবে, তাই হবে।' আবু চক্রবর্তী হাঁটা দেয়।
তারিণীস্যারের কোঁচা ঝোলানো চওড়া কালোপাড় ধুতির উপর খদ্দেরের পাঞ্জাবি, টকটকে ফরসা রঙ, চোখে সোনালী ফ্রেমের চশমা, চতুষ্কোণ মুখ, বয়স ষাট উর্ধ, কিন্তু দেহে বাঁধুনি মাঝারি স্বাস্থ্যের জৌলুষে যথেষ্ট শক্ত। থেমে থেমে ক্লাস নেওয়ার ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে কথা বলেন। শিক্ষক হিসাবে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বটি তাঁর ভঙ্গীমাই বুঝিয়ে দেয়। উপাদেশাত্মক কথাবার্তা, অচাপল্য, হাসির সংযত ব্যবহার তাঁকে যথার্থই পণ্ডিতশ্রেণীর পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছে। দুই পুত্র। দুটিই বিবাহিত। তারিণীস্যারের কোন দায় নেই এখন, তবে গ্রাম উন্নয়ন , সার্বিক কল্যাণকর্ম, রবীন্দ্রজয়ন্তী থেকে যাত্রা থিয়েটারে তিনি সভাপতিত্ব করে থাকেন। দুলাল নন্দী তাঁকে রাজনৈতিক বুদ্ধিপ্রাখুর্যে ব্যবহার করে।
বিনু রাস্তা দিয়ে যেতে গিয়ে বারান্দার চেয়ারে বসে পুকুরের কাগজ পাঠরত তারিণীস্যারকে দেখতে পায়। বলে, 'স্যার, আজ হ্যাচারির জমি মাপা হচ্ছে। এরপর সব পার্টিকে জানান হবে, যাতে বিক্রি করে দেয়। তারপরেই কন্সট্রাকসান। মনে হয় মাস ছয়েকের মধ্যে ফুল ফেজে হ্যাচারি চালু হয়ে যাবে। তখন পোলট্রির ডিম মাংস নিতে পারলেই হল।'
'শুনলাম। কিন্তু বিনু, হ্যাচারির মানে জান ?'
বিনু হায়ার সেকেণ্ডারী পাশ করে বেসিক ট্রেণ্ড। প্রাইমারীতে প্রচুর ভেকেন্সি। জেলায় বারোবছর কোন শিক্ষক নিয়োগ হয়নি। অথচ দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, অবসর গ্রহণে হাজার হাজার শূন্যপদ হয়ে আছে। এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জের থ্রুতে নিয়োগ হবে। নিয়োগ কর্তা অবশ্য স্কুল বোর্ড। বিনু নিশ্চিত হয়ে বসে আছে চাকরি তার হবেই। জেলায় রাজনৈতিক দাদাকে দুলাল নন্দী মারফৎ ধরেছে। এখন মিছিলে যায়, মিটিং এর পোস্টার মারে, অবনী এখন কলকাতায় চাকরিতে জয়েন করার অপেক্ষায়। গ্রামীণ রাজনীতি যেন দূর হয়ে গিয়েছে।
বিনু বলল, 'হ্যাচারি মানে মুরগী চাষ কেন্দ্র।'
'মোটেই না। হ্যাচারি হোল ডিম ফোটানোর স্থান। জয়পুর হ্যাচারি কী ডিম ফোটাবে ? মনে হচ্ছে তাই, নইলে ও নাম কেন ? ঘরে ডিম ফোটানোর জন্য মুরগীকে দিয়ে তা দিতে হয় না। এখন যন্ত্রের আবিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তাপমাত্রা থাকবে ৯৫.৫ ডিগ্রি ফারেনহাইট, আর্দ্রতা ৯০ ভাগ। মাঝে মাঝে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ডিম উল্টেপাল্টে যাবে।'
বিনু অবাক অবাক চোখে স্যারকে দেখে। বলে,'তা হলে ডিম বিক্রি হবে না ?'
'কেন হবে না ? ডিমের জন্যে মাংসের জন্যে আলাদা শেড থাকবে। মাংসের জন্য ব্রয়লার। ব্রয়লার মানে জান ?'
'না স্যার।'
'সেদ্ধ করে যে রান্না করে , পাচক। আবার যা সেদ্ধ হয় তাকেও বলে। যে মুরগী শুধুমাত্র মাংসের জন্য ব্যবহার হয় তাকে বলা হয় ব্রয়লার। কী জান অভিধানে যাই থাক, নাম দেয়

মানুষ, অত অর্থ নিয়ে কেউ চলে না। যাই হোক হ্যাবার্ড ব্রয়লার চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিনে দেড় কেজি মাংসস্তূপ। মাংসস্তূপ বলছি কেন জান? ওদের নিজেদের ভার নিজেরাই বইতে পারে না। স্রেফ মাংস কী না। অথচ এ বাড়ের জন্য ওদের খাওয়া কত জান, একশ গ্রামও নয়, পঁয়ত্রিশ গ্রাম মাত্র।'

বিনু শিক্ষার্থীর ভঙ্গীমা রেখেও বিদ্যে ফলায়, 'পোলট্রি তো মুরগীর চাষ।'

'এখন সেই অর্থই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। অথচ শব্দার্থ হল ডোমেস্টিক ফাউলস। কুক্কুট হংসাদি গৃহপালিত পক্ষী। কুক্কুট মানে জান তো?'

'হ্যাঁ স্যার মুরগী।'

'এই যে দ্রুত বর্ধনশীল মুরগীর উৎপত্তি, এ তো বিজ্ঞানের গবেষণা থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মার্কিন সৈন্যদের খাদ্যের অভাব পূরণ করার জন্য যে চেষ্টা তারই বলতে পার ফলশ্রুতি। এ সব আসানসোল চ্যাটার্জিদের ফার্মে গিয়ে দেখে এসেছি। এখন তো পোলট্রি ব্যবসা করে বহু যুবক। এখানে অবশ্য লার্জ স্কেলে হচ্ছে। হোক। যাক্ গে যাচ্ছ কোথায় তুমি? এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ এ মাসেই নাকি কল দেবে?

'শুনছি তো তাই। আপাততঃ নাকি সাত'শর মত অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে।'

'দেখ, যদি হয়।' তারিণীস্যার কাগজে চোখ রাখেন।

ধনা তিলডাঙায় চাষ হবে বলে উদ্দীপ্ত এবং লোক সংগ্রহ ছোটাছুটি ইত্যাদিতে মগ্ন, পরবর্তী দুলাল নন্দী গ্রহণে, সম্ভাবনায় নিজেকে লাঙলের বোঁটা ধরে তিলডাঙার তার নিজস্ব জমিটুকুকে বিদীর্ণ করে চাষ যোগ্যতায় নিয়ে যাওয়ার ছবিটাও প্রত্যক্ষ করেছিল। ছবি নয় যা হবেই। এবার হল না, সামনে বার হবেই, এতদূর পর্যন্ত সে যখন স্থিরতায়, তখন মুরগীর ক্ষেত্র হয়ে যাচ্ছে এতে সে সায় দেয় কী করে। শোনাতক তার সব ইন্দ্রিয়ের বিরুদ্ধতা এবং মুখে একই কথা, 'প্রতিবাদ করা উচিত বটে, তোমরা কেনে বলছ না, ইখানে আগে চাষ হত, ক'বছর মাত্র হয় নাই, হলে চাষ হোক।' তার বলাটাই হয়, কেউ উত্তর করে না। চাটুজেদের ভাগনে অবনী। যে কী না দুলাল বিপক্ষ সে বলে, 'হতে দাও, কিছু মানুষ কাজ পাবে।

বিনু তার শালার জন্যে তৎপর। প্রহ্লাদ বলে, চাষ হত না, এ তবু ভাল হল। জগাও এতে সহমত। তবে নিজের জমিটুকু সে হ্যাচারি কর্তৃপক্ষ দেবে না।

কথাটা উদ্যোক্তা দুলাল নন্দী, জয়পুর হ্যাচারি প্রতিনিধি গোপাল সরকার বরাবর পৌঁছে গিয়েছে। দুলাল বলেওছে, 'আরে দাম ত পাবি। বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি দিতেই হয়। প্রজেক্টটা হলে গাঁয়ের কী অবস্থা হবে জানিস্, কত লোকের কর্মসংস্থান হবে।'

ধনা দুলালকে কোন কথা বলেনি। মানুষটাকে সে ভয় করে। নেতৃত্বের মাথায় সম্রাটের মুকুট থাকে। আজ মাপজোকে সে যায় নি। দাওয়ায় গুম হয়ে বসে আছে। স্ত্রী লক্ষ্মী তার পুরুষকে নানাভাবে বোঝান চাপিয়ে ক্লান্ত, সে চা দিয়েছে, তারপর মুড়ি গুড়; কেন বসে আছে জিজ্ঞাসায় না গিয়ে শুধু, 'হ্যাঁ গ নিড়ানিতে যাব বললে কাঠফাটা জোলে, গেলে না' র উত্তর 'না' শুনেই নীরবতায় মাঝে মাঝে শুধু দেখে যাচ্ছে। মানুষটি মাটি চেনে, চাষ বোঝে। জমি বাড়ে না, অথচ জমির জন্য ক্ষুধা বাড়ে— সে কী করে।

'এই যে ধনাদা ঘরে, রইছ।' সাইকেল ঘরের বাইরের দরজায় হেলিয়ে দেবা দাস ঢোকে।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে ঢাউস ঝাঁড়। বিভিন্ন আনাজপত্র সে গাঁয়ে ফেরি করে। বলে, 'বৌদি বাঁধাকপি এনেছি, লিবে নাকি? বেগুন, রামঝিঙে, পটলও আছে। আদা রসুন। বাঁধাকপি সস্তা করে দিয়ে দুব। সামনের সপ্তা ফুলকপি পাবে।'

'ভাদ্রমাসে কপি খাওয়া পয়সা খাওয়া। তোমার সস্তা আমি জানি।'

'মাত্তর সাতটাকা কেজি। ঠিক আছে তুমাকে সাড়ে ছয়ে দুব। ধনাদা তিলডাঙা যাও নাই?

'কী করতে যাব?'

রাগী গলা শুনে সর্পগাত্রে পা পড়েছে যেন। ফোঁস বুঝে বলে, 'না সবাই রইছে।'

'থাকুক।' দেবা দাস খদ্দের ধরতে এসেছে রাগ সামাল দিতে নয়, ব্যস্ততার সঙ্গে বলে, 'তাহালে দুব বৌদি, আর ইরপর পাবে না, হ্যাচারির কাছে দুকান লাগাব, তখুন ঘরে বসে লয়, কিনতে যাবে।

'ওমা তুমি দোকান দিছ!'

'আমি একা? চা পান বিড়ির, মিষ্টির কত কিসের দুকান। কান্ড কী কম হুছে। হাট বসে যাবে। হ্যাচারিতে কম লুকের যাওয়া আসা হবে।'

হ্যাচারিকে ঘিরে দোকান পাট, অজস্র মানুষের যাওয়া আসার বর্ণন যেন ধনাকে নিয়ে মজা, সে অনুভব করেই বৌকে ঝাপটা দেয়, 'কী লিবে লাও নিয়ে ছেড়ে দাও।'

'না, আজ কিছু লুব না ভাই।'

ভূষণ মালির বিরাশি বছরের মাথার মধ্যে তিলডাঙা আলোড়নে শব্দ বাজে। টুকটাক সে ঘরের শব্দ ধরে ঝিমুনির মধ্যে। ঝিমুনি তেমনটি শব্দ হলে ভেঙে যায়। সে নড়ে চড়ে। দাওয়ায় মোটা বস্তায় পিঠ হেলান দিয়ে বসে থাকে শিরদাঁড়াটা সোজা করে। কোটর থেকে অক্ষিগোলক প্রাণপণে বাইরে আনতে চায়। বড়ই অস্বচ্ছ পৃথিবী। সূর্য তেমন দীপ্ত নয়। কত জন্ম কত মৃত্যু কত ঘটনা দুর্ঘটনার সমাহারে তার স্মৃতিস্তূপ গড়ে উঠেছে। কোনটিই এখন একক চিহ্নিত নয়। সময়কাল এলোমেলো। একের সঙ্গে অন্য মিশে যায়। কিছু কিছু জীবন্ত হয়ে ফিরে আসে। কথা বলে। বর্তমান, তাকে আবার ধাক্কা মেরে ভেঙে দেয়।

'অ বউ তিলডাঙাতে কী হুছে।'

'হ্যাচারি। বলেছি ত।'

'সে আবার কী বটে?'

'মুরগীর চাষ। আপনি বুঝতে পারবেন নাই।'

ভূষণ নিষ্পলকে উঠোন দেখে। সামনে গাই দাঁড়িয়ে, ওদিকে একটা কাক, চড়াই পাখি। বলে, 'মুরগীর আবার চাষ হয় নাকি? মুরগী কী ধান বটে না আলু বটে?'

নন্টু এসে পড়ে, 'আবার বকতে সুরু করেছ দাদু।'

'হ্যাঁরে তিলডাঙাতে মাপজোপ হুছে। নিজেদের জমি চিনে লিবি। খগা কোথা?'

নন্টু উত্তর দেয় না।

'অ বাপ মুরগী কী শুনি।'

নন্টু বলে, 'কিছু না। চাষ হবে।'

'আহা হোক। হোক। তিলডাঙা কত ফসল দিত। আমি কম তুলেছি একদিন। ধান সষ্য,

গম, আলু, বেগুন, মুলো, বাঁধাকপি ফুলকপি। আবার তাহলে হবেক?'

নল্টু বলে, 'হ্যঁ হবে।'

'তবে সব বলে, মুরগী বুনবে নাকি! হ্যাঁরে অত মুরগী তাহলে হবেক?'

'শোন কেনে লোকের কথা। চাষ হবে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। বকবক করো না।'

রান্নাঘর থেকে পটল ভাজার গন্ধ পায় ভূষণ। উঠোনে বাঁধা গাইটা ডাক পাড়ে। বাছুর হামলায় ওদিকে গোয়ালে। একটা কাক কা কা করে। বেলা কত সে ঠাওর করতে পারে না। কোন শব্দ আসে না তার কান বরাবর। বাতাস আছে কী নেই। সে তিলডাঙার মাঠে পৌঁছে যায়। শস্যপূর্ণ তিলডাঙা, সবুজে সবুজ, নধর ফসলের বিপুল ভান্ডার। সেই ভান্ডারটির উপর আলতা রাঙা পা রেখে মা লক্ষ্মী হাসছেন। কত আলো। ভূষণ সে আলোয় ডুবছে। তার হাতের আঁচলা ভরে যাচ্ছে মাটি লাগা সদ্য তোলা আলুতে, মসৃণ বেগুনে, মুলোয়, ফুলকপি, বাঁধাকপিতে, পেঁয়াজে রসুনে।

সে বিড়বিড় করে, 'ঝুড়ি আন। হাতে যে কুলোয় না গো। ও খগার মা, ঝুড়ি আন।'

দুলাল নন্দী এই কর্মব্যস্ততায় টের পায় তার কামনার নারী দূরবর্তী হয়ে যাচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বী গোপাল সরকার। কিছুই তার করার নেই। সংবাদ সে সবই পায়। প্রেম পর্বের কথা নিয়ে জটলাও তো গ্রামীণ মানসে। কিন্তু কোন প্রতিবাদ নেই। গোপাল সরকার কাজ দিতে পারে, টাকা দিতে পারে। গ্রামের মানচিত্রই বদলে দিচ্ছে। সে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে। প্রতিমাকে দেখে। ভেবে পায় না নারীর কামনার এই অদ্ভুত বৈচিত্র্যকে। অনায়াসে পাগলা বটুককে ছেড়ে কেমন পূর্ব প্রেমিককে গ্রহণ করেছে! তবে এই বিস্ময় কিংবা ঈর্ষা সে প্রকাশ করে না। গোপাল সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখে। অনেক কিছু আদায় করে নিতে হবে। একটা মেয়েমানুষ ছেড়ে অন্য মেয়েমানুষে গমন করা যেতেই পারে। তার পথও তো হয়েই যাচ্ছে। বাউরিপাড়ায় ঘন্টার শালী এসেছে। যুবতীর শরীরে প্রতিমা আঁকা হয়ে যাচ্ছে। সে কর্মযজ্ঞের এক ব্যস্ত পুরুষ। পিতিমার অবসর নেই। সে ও কথা বলে না।

দশ

শেষ অগ্রহায়ণে বটুক ফিরে আসে ইন্দোর থেকে। তার পরণে আকাশনীল স্যুট, ফুলহাতা লম্বা দাগ টানা নীল সাদা শার্ট, পায়ে জুতো, মাথার চুল আঁচড়ান, গোঁফ দাড়ি কামান। হাতে ঝোলান একটা কালো রঙের চেনটানা মাঝারি এয়ারব্যাগ। তার চোখের সেই সারল্য একতিল কমেনি। পোষাকে গ্রাম্যভাব কাটলেও স্পষ্ট ধ্বস্ত কোথাও সে। যেন তাকে একবছরে প্রবাস জীবনে ভেঙে গড়তে পারেনি। মধ্যপ্রদেশের আবহাওয়া তার নিজের মানুষগুলির মত করতে পারেনি।

বটুকের পাশে হাঁটছে তার মামাতো ভাই শরৎ। রোগা বেঁটেখাট আধময়লা চেহারায় ওরও প্যান্ট, শার্ট, হাতে ঘড়ি। বয়সে বটুকের চেয়ে কিছু ছোট হবে। শরৎকে ছাব্বিশ সাতাশের হলেও দেহগঠনের জন্য ছোটটি দেখায়। চোখে মুখে শরৎ যে যথেষ্ট চালাক চতুর, বাইরে থাকার ফলে সপ্রতিভতা আঁকতে পেরেছে চরিত্রে জীবনযাপনে তা হাঁটার ভঙ্গী, চাউনিতে বোঝা যায়।

বড়ই ভয় করছিল শরৎ-তার আধপাগলা মামাতো ভাইটি না ইন্দোরে গিয়ে ঝামেলায় ফেলে। 'এক্ষুনি গাঁয়ে যাব, থাকব নাই' জেদ ধরলে হয়েছিল আর কী। কিন্তু বটুক একবারের জন্যেও কথাটা তোলেনি। ছেলেমানুষের মত অত দীর্ঘ ট্রেন যাত্রায় যেমন দু'পাশের দৃশ্য কী অবাক চোখে যাত্রী দেখছিল তেমনি ইন্দোরে নেমে কারখানায় আসার পরও তার দেখা মেটেনি। তারপর মিশেও তো গিয়েছে অন্যান্যদের সঙ্গে। হিন্দিটা রপ্ত করার চেষ্টা করেনি। দরকারই বা কী। অনেক বাঙালি রয়েছে ফ্যাক্টারিতে। আসানসোলের মহাদেবদা, রাণীগঞ্জের মাখন বউ ছেলে মেয়ে নিয়ে এসেছে, রামপুরহাটের জগাই, হাওড়ার শ্যামাপদ আর সুদেব। কম তো নেই।

গোড়ায় বড়ই চুপচাপ থাকত বটুক। শরৎ তাকে রাণী অহল্যাবাঈয়ের প্রাসাদ, মেঘদূত গার্ডেন, সিনেমা, বাজার, বাঙালিপাড়া, নানান জায়গা এখান সেখান দেখিয়ে এনেছে। জিজ্ঞাসা করেছে, 'মন খারাপ করছে ?'

'না মন খারাপ কেন হবে! কাজ করছি—চাকরি করছি।'

আর শুধু তো কারখানার কাজ নয়, বটুক মহাদেবকে রান্নার বাটনা বেটে দেওয়া, যতীনের কাপড় কেচে দেওয়া, জল এনে দেওয়া, জ্বর হতে প্রসাদকে সেবা এ সবও করেছে। আগ বাড়িয়ে এরকম লোকের কাজ করে দেওয়া বটুকের স্বভাব বরাবরেই। গাঁয়ে করত। তবে পাগলামির যে প্রকাশ দু'হাত ডানার মত নাড়তে নাড়তে বলা, এ মা কী বোকা, কিছু জানে না। ওখানে দেখা যায়নি।

শরৎ চিঠিতে তার পিসিমা বটুকের মাকে, জানাত, 'বটুকের জন্য চিন্তা করিও না। খুক-

ভাল আছে। পাগলামি অনেক সারিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে কেবল চুপচাপ বসিয়া থাকে। মন দিয়া কাজ করে। আমি বাড়ি যাইবার সময় উহাকেও লইয়া যাইব।'

বটুক তার মনের কথা বলেনি তবে তিলডাঙা, পিসিমা, দুলাল, মা, দাদা, বউদি, কুশ, গাঁয়ের মানুষের মুখ, দিঘি মাঠ কী বটতলা, তমাল তলার ডাক শুনতে পেত। বহুদূরের সেই সব কণ্ঠস্বর। যেন মেলা উত্থিত ধ্বনির মত তালগোল পাকান, স্বাতন্ত্র্যহীনও বটে। তারপর দেখেছে ইঁট সিমেন্ট লোহার শেড, ফ্যাক্টারির চিমনির এই শিল্পাঞ্চলেও জ্যোৎস্না ফোটে, রাত্রি আসে, কালো মেঘের সঞ্চার হয় আকাশে, পাখি ওড়ে, কুকুর জিভ ঝুলিয়ে খেতে চায়, গাছ আন্দোলিত হয়ে ঝড় আসে, সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত সেই গাঁয়ের মতই। শুধু মানুষের মুখই ভিন্ন। দিঘি নেই, চাষের জমি নেই। না থাক যা আছে তার অনেকটাই চেনা, তাতে ভালোবাসার উপাদানও আছে।

গতরাতে দুবরাজপুরে নেমে শরৎদের বাড়িতে ছিল। সকালে তিলডাঙা আসছে। শীতের তেমন জাঁক নেই। রোদের তীব্রতায় বেলা বাড়ায় যেন বাতাসে ঠাণ্ডা মোছা উষ্ণতার সহনীয় তরঙ্গ। মাটির সড়কে দু'ধারে বাবলার গাছ নানা আকৃতির। ধানকাটা মরসুম ফুরিয়েছে সবেমাত্র। কিছু জমিতে এখনও নুয়ে আছে খড়ের ডগায় শীষ নিয়ে ধানের গুচ্ছেরা। গাছ গাছালির ফাঁকে পেরুল গাঁয়ের আভাস। একটা বাঁক নিলেই তিলডাঙা দৃশ্য হবার কথা ছিল। কিন্তু বাধা নতুন ইঁটের পাঁচিল।

বটুকের বিস্ময় জাগে 'এ কী বটে!'

'পাঁচিল দেখছি! কী হছে।'

খানিকটা হাঁটতেই দেখা যায় দীর্ঘ পাঁচিল উত্তর দক্ষিণে লম্বালম্বি চলে গিয়েছে একেবারে 'বাঁধ' নামে দিঘি পাড় পর্যন্ত। পাঁচিলের মধ্য থেকে উঁচিয়ে বাঁকা খেজুর গাছটা যেন জানান দিচ্ছে, এটাই তিলডাঙা!'

শরৎ কথা বলে না। আশপাশ দেখে। মানুষ নেই। ফাঁকা রাস্তা। বাঁয়ে একটা ধান বোঝাই গোরুর গাড়ি আসছে। মাঠের আলকাটা পথ ভেঙে মাটির সড়কে পড়বে।

গাড়ির উপর ধনা। কোমরে গুটিয়ে কাপড় বাঁধা, স্যাণ্ডো গেঞ্জি, মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। দূর থেকে দেখেই চিনেছে। হাতে 'পাঁচন', খাটো লাঠি গরু ডাকানোর জন্যে। মন্থর গতির গাড়িটা রাস্তায় ওঠার আগেই ধনা বলে ওঠে, 'বটুক বটিস্ - কখন এলি?' গরু জোড়াকে সে জোয়ালের বাঁধুনির উপর পাঁচন ঠোক্কর দিয়ে গাড়োয়ানি গলা, 'হ হ,' করে থামায়। বলদ জোড়া ইঙ্গিত বুঝে দাঁড়িয়ে পড়ে। খড়সমেত ধানের শীষ ঝুলে আছে। দড়ির সঙ্গে লম্বা বাঁশের আড়াসুন দিয়ে টান টান বাঁধা ধানের আঁটি।

'ও ধনাদা, তিলডাঙা গেল কুথা? কিসের পাঁচিল বটে?'

'জয়পুর হ্যাচারি। তিলডাঙা আর নাই। ভাল আছিস তু!'

'হ্যাচারি কী বটে গো!'

'মুরগী মুরগী চাষ হবে।' ধনা বলে, 'লাখ লাখ ডিমও হবে। চালান যাবে এখান থেকে। এ বাবা ঘরে পোষা লয়, ই কারবার ফাঁদা কারখানার পারা' বটুকের বিস্ময় ভরা পলকহীন চোখে চোখ রেখে বলে, 'তুই তিলডাঙা কন্যে দেখেছিলি মনে আছে? কেঁদেছিল তোর কাছে! বলেছিল চাষ করতে। আর বলবেও না কাঁদবেও না। ওই দেখ টিনে চকচকে রোদ

পড়ে কেমন হাসছে।'

আধক্ষ্যাপা হাঁ হয়ে আছে। ধনা তো দাঁড়াতে পারে না। ওর জন্যে কম কাণ্ড তিলডাঙায় চাষ নিয়ে! পাচন বাগিয়ে বলদ ডাকায় 'চ, চ, হেট্ হেট্।'

তিলডাঙা কন্যে, কান্না, জ্যোৎস্না ধোয়া রাতে রুপালী নারী, ধান বোঝাই এই গোরুর গাড়ির ক্যাঁচ কোঁচ শব্দ, হেমন্তের শীত মাখা রৌদ্র, হ্যাচারির পাঁচিল, সূর্য প্রতিফলনে টিনের উজ্জ্বলতা এদিকে ঝিনুক ডোবা ইঁদারা, খেজুরগাছ, অঞ্চল অফিস—বটুকের মস্তিষ্কে সমবেত আঘাতে যন্ত্রণার ঝনঝনানি বাজে। যেন লৌহ কপাট ভেঙে মণিভাণ্ডারের ঐশ্বর্য ছটার আলোময়তায় সকলই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'আমাদের তিলডাঙা গেল কুথা?'

গাঁ-মুখে এসে আবার খেপামি জাগল। শরৎ ভারী বিব্রত হয়। গায়ে হাত রেখে বলে, 'ঘর চল, তোমার মায়ের তোমাকে দেখে কত আনন্দ হবে।'

বটুকের মনে আছে সবই। মনে পড়ে সবই। জ্যোৎস্না রাতে একা সে দেখেছিল, চাষ না হওয়া জমি রুপোলী দেবী হয়ে দাঁড়াল। শুনেছিল তার কথা। তাকে বলেছিল, বটুক আমি তিলডাঙা বটি। চাষ হয় না মাটিতে। আমার বড় কষ্ট। সবাইকে বলে চাষ করাও। তারপর সবাইকে বলা, নিজে চাষ করতে যাওয়া, পঞ্চায়েতের মিটিং, পতিত জমি উদ্ধারের জন্য বড় বড় কথা, তা মিটিংয়ে সে কথা বলতেই তাকে তাড়িয়ে দিল। তারপর তো ইন্দোর। ইস তারপর কী। মাঝে পিতিমা আছে না। আহারে মেয়ে। বেধবা যুবতী কন্যে! তাকে ভালবাসা তাকে বটুকবাবু বলা!

শরৎ প্রায় টেনেই আনে। বটুক ঘরে এসে ঢের ঝরঝরে। মা কেঁদে ফেলে। অতবড় ছেলেকে জড়িয়ে হু হু করে কান্না।

'ও মা কাঁদিস কেনে!' মা সারা গায়ে হাত বুলায়। বলে, 'কতদিন বাদে তুকে দেখছি। বেশ রোগা হয়ে গিয়েছিস। অ বউ ছেলেকে খেতে দাও।'

ভাইপো কুশ কাকার গলা জড়ায়। বলে, 'এতদিন আস নাই কেনে? জান একট কুকুর ছা এনেছিলাম মরে গেল। তুমি একট এনে দিও।'

বড় বউ বলে, 'ও ঠাকুরপোঁ মুখ হাত ধোও কিছু খাও।' ছোট বউ সরল মেজ ভাসুরকে দেখে। আহা বড় ভাল মানুষ। আধপাগল মানুষ বলেই কী! ভাল হয়ে গিয়েছে! ভাল হলে কী সাধারণ পুরুষ হয়ে যাবে!

বড় সুন্দর সময় এখন। কাল হেমন্তের বড় উদারতা। সে শুয়ে থাকে শীষভরা ধানের আঁটি মাথায় দিয়ে, তার শ্বাসপাতে বাতাস হিমানী মাখে, তার ঘামবিন্দুরা হিমকণা আর শিশিরবিন্দু হয়ে চর্তুদিক আকীর্ণ করে। সম্পদ সেই তো পুঁটুলি ভরে এনেছে। পৌষকে সেই তো ডাক দিয়েছে— এস পৌষ-যেওনা। লক্ষ্মীঠাকরুণ সদয়া হও। তা সদয়া বৈ কী। খামারজাত ধান, মাঠের ধান এখনও তো পাখপাখালির সঙ্গে অভাবী মানুষের ভাগেও জোটে। গাঁয়ে এখন অভাব নেই। অন্নহীনতা নেই।

বটুক খামার দেখে, ধান দেখে, গাঁয়ের জলপূর্ণ পুকুর দেখে, গরু ছাগল দেখে, জলে ভাসা হাঁস দেখে, পায়রা দেখে, কাক শালিখ দেখে, বট গাছ, আম জাম ঝোপ চেনা লতাটি দেখে, দুর্গামন্দির, মনসা ঘর দেখে। চেনা মুখগুলিকে দেখে। এসব দেখায় তিলডাঙার জন্য বুক হু হু করে। তিলডাঙায় ইঁটের স্তূপ, মিস্ত্রি মজুর, লোহার খাঁচা, চারিদিকে ছড়ানো সিমেন্ট,

বাদল নিয়ে বিশাল কর্মযজ্ঞ তাও দেখে। কোন কথা বলে না। লোকেব জিজ্ঞাসা যত অল্পে সারা যায়। শুকনো ঠোঁটে তাব যে হাসি থাকে--সে বেদনা।

দুলাল নন্দীব সঙ্গে দেখা হতে সে খবর নেয। পিঠে হাত বাখে। এখন তো বটুক তার মতই হতাশ প্রেমিক। ঈর্ষা নেই। বলে, ইন্দোর যাবি কেন? পিতিমাকে বল। এখানেই চাকরি হয়ে যাবে।

বটুক হাসে শুধু। অর্থহীন হাসি।

পিতিমার দেওর নিমে পুকুরে যাওয়ার রাস্তায় ধরে বটুককে, 'কখন এলে?'

'কাল তোমার বউদি ভালো আছে?'

নিমের ঠোঁট মুখ তিক্ততায বেঁকে যায, 'বউদি বলো না কুলে কালি দিয়ে বেরিয়ে গেইছে। বিয়ে করেছে গোপাল সবকারকে।'

'কে গোপাল সরকার?'

'হ্যাচারি ম্যানেজার। সিউড়িতে বাসা করেছে।' নিমে সংবাদ শোনানব সঙ্গে ক্ষোভে যেন ফেটে পড়ে, 'তুমিই বল বিয়ে যখন করেছে, তখন দাদার সম্পত্তি পায় কী করে। দেশে আইন নাই? পঞ্চায়েত মুখ বন্ধ করে আছে। হ্যাচারিতে কাজ পেয়েছে সব। বলছে, গাঁয়ের উন্নতি হবে। আমার দিকে দাঁড়াবে কেনে? তবে আমি ছাড়বার পাত্র লই। কোর্ট কাছারি কবব।'

'হ্যাচারিতে সব চাকরি পেয়েছে। তুমি পেলে না?'

'আমাকে দিবে কেনে?' আমি তো শত্তুব। বউদিই ত-'

পিতিমা বিয়ে করেছে। বটুক বুঝে উঠতে পারে না এ সংবাদ আনন্দের না দুঃখের আর নিমে, বিধবা বউদি খ্যাপা বটুকের জন্য তার হাতে হয়নি। তার কামনাকে ধুলোয় ফেলেছে। এখন তো পাখিই ফুড়ুৎ। ফলে বটুক তার শত্রু নয়।

নিমে বলে, 'কদিন থাকবে? আবার চলে যাবে ত!'

বটুক শুধু নিমেব মুখ পড়ে।

'উখানে কাজ আছে? এমন গাঁয়ে কুন শালা থাকে। আমিও যেতে পারি, তোমার মামাতো ভাইকে বলব—ভাবছি।'

বটুক এরও উত্তর দেয় না।

বড় বউদি বলল, 'ঠাকুরপো, তুমি কত বদলে গেইছ!'

'গাঁও বদলে গেইছে।'

দাদা রাম কথাটা ধরে নিয়ে বলল, 'সে তো যাবেই কত বড কাণ্ড হছে বল দেখি। তিলডাঙাতে হ্যাচারি। পিচরাস্তা গাঁয়ে ঢুকবে। কত লোক কাজ পেছে। দোকানদানি বসবে। গাঁয়ের উন্নতি হয়ে যাবে।'

'জমি তো গেল চাষ হবে না।'

'চাষ হত নাকি? জলের আয় হবে মিটিংয়ে কথা হয়েছিল। মিটিংয়ে নেতারা কত কী বলে। করে কিছু?'

'অনেকদিন আগে তিলডাঙাতে চাষ হত— [illegible]'

'তা হত। তারপর পতিত হল জমি গাঁয়ে দলাদলিতে। আমারই সব কথা মনে নাই।'

আবার চাষ হত। আবার হতে পারত। তিলডাঙার জমি রুপোলী কন্যে হয়ে বলেছিল!

বটুক উচ্চাবণ করতে পারে না । দুঃখ থাকে কিন্তু মোচন উদ্দেশ্য থাকে না। বটুক যেমন তিলডাঙার কর্মযজ্ঞের আশেপাশে ঘুরে ফিরেও চিনতে পারে না তার তিলডাঙাকে—জ্যোৎস্নায় যে ক্রন্দনরতা নারীকে দেখেছে তাকে খুঁজে পায় না, মনে হয় এ অন্য কোন জায়গা, তেমনি জয়পুর হ্যাচারির ম্যানেজারের ডাকে এসে যে নারীকে দেখে তাকেও চিনতে পারে না।

সিঁথিতে সিঁদুর, শাড়ি ব্লাউজ, হার কানে দুল, হাত ভর্তি চুড়ি, কপালে টিপ, চোখে কাজল রেখা। এ কে ! এ কোন ঠাকরুণ। 'আমি পিতিমা' শোনার পরও কোন শব্দ বের হয় না। সাদা কাপড়েব নিঃস্ব পিতিমা সে তো ভিন্ন, যার বড় মায়া ছিল তাকে৷ যার পাগলামি ছিল! যে তাকে—। বটুকের মনে হয় এ পিতিমা নয়। ভিন্ন কণ্ঠস্বর, ভিন্ন হাসি, ভিন্ন চাউনি, ভিন্ন সাজ। মাথা ঝিমঝিম করে বটুকের। যেন পুরোন অবস্থানে প্রত্যার্পণ ঘটে৷ সে দু'হাত ডানার মত নাড়া দেয়, 'এ মা কিছু বোঝে না- কী বোকা- কী বোকা! বলে, পিতিমা বটে- পিতিমা বটে!' থর থর করে তারপর কাঁপতে থাকে।

কেঁদে ফেলে পিতিমা , 'আমি সত্যি পিতিমা। বটুকবাবু! চিনতে পারছো না?'

কাঁপুনি থেমে যায় বটুকের মেয়ের কান্না দেখে। বলে, 'আহা কাঁদে না ঠাকরুন। বল তোমার কী কষ্ট! বল আমি কী করব।'

'তুমি বল, পিতিমা তুমি ঠিক করেছ। বল, আমাকে পিতিমা—।'

'এই কথা'। বটুক বলে , '-পিতিমা তুমি ঠিক করেছ। ঠিক করেছ ! 'যেন কোন শিশুকে ভোলাচ্ছে এমন ভঙ্গীতে নারীকে দেখে।

গোপাল সরকার দাঁড়িয়ে আছে ।এতবড় কারবারের ম্যানেজারি করতে হয়। সে জানে, নারী মাত্রেই রহস্যময়ী। সে জানে পিতিমাকে বিয়ে করলেও ভালবাসলেও সে পিতিমাকে চেনে না। পাগল বটুকের সঙ্গে পিতিমার সম্পর্ক কি ছিল এ রহস্য তার কাছে কোনদিন পরিষ্কার হবে না। এ দৃশ্য দেখে সে কোন ধারণায় যায় না । যেন নিছকই দেখা।

বটুক বলে 'তাহলে চলি।'

'ডাকলে আসবে বটুকবাবু ?'

'আসব, আসব।'

কোম্পানির জিপগাড়িতে বউকে এনেছে গোপাল সরকার । বলল,' চল তোমাকে সিউড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

ভূষণ মালি ঘরের বাইরে কুলিধারে দেওয়াল ঘেঁষা বসার ঢিবি 'ধারি 'তে বসেছে। মোটা চটপাতা ধারিতে৷ গায়ে ফতুয়া, আধখানা ধুতি হাঁটুর উপর। তিনমাথা হয়েছে দু হাঁটু তুলে। কুঞ্চিত চামড়ার ঢাকনায় হাড়ের কাঠামো । বসে থেকে সে পুরু লেন্সের চশমাতেই সকলই আবছায়া দেখে। সাইকেল পেরিয়ে যায়, মানুষ যায়, গরু ছাগল যায়,শালিখ উড়ে যায় চড়ুইয়েরা তার সামনেই ঝগড়া করে— শব্দে সে ডাকে, 'কে যায়? কে বটে ? 'কেউ সাড়া দেয়, কেউ দেয় না । রোদের রঙ সকালবেলা চূণ হলুদ করে রাখে। বাতাসে শীত ভাব। ধানের রোঁয়া ওড়াউড়ি করে ।ভূষণের কোটর গর্তের ঘোলাটে চক্ষুতারকা দেখতে চায়, চোপসান গালের নাসাগ্র ঘ্রাণ চায়, প্রতিটির বস্তুর অনুভব কম্পন চায় ইন্দ্রিয়কুল। সে গল্প করতে চায়, কথা বলতে চায়, আত্মীয়তা চায়, জীবনের স্বাদে সে অতীত মিশ্রণে, যা তার স্মৃতিতে ঝাপসা কী শূন্য হয়েছে তার বিভূতি সযত্নে গায়ে মাখতে চায়, কিন্তু কোনটাই হয়ে ওঠে না । হওয়া না

হওয়া সব অবশ্য একাকাব। দুঃখ কী অভিমান বোধের পীড়নও অনুভূতি অগ্রাহ্য। বটুকের দ্রুত হাঁটার শব্দ কানে যেতে ডাকে, 'কে যায় ?'

'আমিগো জ্যাঠা। আমি বটুক বটি গো ?'

'কে বটুক ?'

'আমি দশরথ পালের বেটা বটি।'

'ও মা আমাদের বটুক বেটা। আয় বাপ-আয়।'

বটুক সামনে এসে দাঁড়ায়, 'বল।'

'তিলডাঙায় মুরগী চাষ হচ্ছে নাকি।' ফোকলা দাঁতের মুখে বৃদ্ধ হাসে, 'মুরগীর চাষ হয়! বল, মুরগী মাটি ফুঁড়ে বেরুয়! তুই বল—।'

'কারখানা গো। চাষ লয়। লোহা লক্কড়ে মস্ত ঘর টিনের চাল।'

'চাষ লয়, কারখানা ?'

'হুঁ।'

'আর তিলডাঙা।'

'কারখানা হলে তিলডাঙা থাকে ? তিলডাঙা আর নাই।'

'আহা আগে কত চাষ হত। একবার তহলে শোন্ আলুবাড়িতে ডিংলে করেছি। ইয়া বড় বড় ডিংলে। গোলক বলে, আমার একটই ত্রিশ সের। আমি বলি আমার একট এক মন। উজন হল, কে জেতে কে হারে কে জিতল রে ?'

'হারজিৎ নিয়ে কী হবে! তিলডাঙা মরে গেইছে।'

'মরে গেল, বলিস কী।' বৃদ্ধ ঝুঁকে পড়ে।

বটুক বলে, 'একদম ফট্।'

ভূষণ মালি ডুকরে কাঁদে,' অ বাপ জমি গেল, ফসল গেল তাহলে—।'

'যাবে নাই।' ভূষণ কাঁদে। বটুক লোলচর্ম বৃদ্ধের এগিয়ে গিয়ে চোখের জল মুছিয়ে দেয়, 'আহা কাঁদে না। কাঁদে না' ভূষণ মালি তবু কাঁদে। তখন দু'হাত ডানার মত নাচায় বটুক, 'এ মা কী বোকা কিছু বোঝে না।'

মা দাদা বৌদি বড় চিন্তায় পড়ে। বটুকের পুরোন পাগলামি আবার এসেছে। শরৎ ফিরে যাবে। ও যদি না যেতে চায়।

কিন্তু শরৎ এসে বলতেই বটুক বলল, 'চল।'

শরৎ বলল, 'দেখলে ত। বটুক এখানে থাকবে কেন ? চাকরি করছে।'

বটুক বলে, আর তিলডাঙাই নাই।'

মা কাঁদে, 'তিলডাঙা নাই কী করে। তুই আর আসবি না ?'

শরৎ বলল, 'পিসি আসবে। ওখানে ভাল ছিল। আরও কিছুদিন থাকলে—। তুমি তো ছেলের ভাল চাও।'

বটুক বলে, 'কেনে আসব্ না। আমার মা আছে দাদা, বৌদি ভাইপো সব আছে। চল ইন্দোর যাই, কত কাজ পড়ে, বল শরৎ!'